মানুষ তার পৃথিবী বিস্তার করলো

ইলিন ও সেগাল

মানুষ তার পৃথিবী বিস্তার করল

মধ্যযুগ ও নবজাগরণ

এম. ইলিন ও ই. সেগাল

অনুবাদ : অমল দাশগুপ্ত

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

MANUSH TAR PRITHIBI BISTAR KARLO
Bengali Translation of
THE GIANT WIDENS HIS WORLD
By M. Ilin and E. Segal

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৯১

প্রকাশক
সলিল কুমার গাঙ্গুলি
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
দুলাল দাশগুপ্ত
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৫ মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ : শ্রীগণেশ বসু

মূল্য : পাঁচিশ টাকা

মানুষ তার পৃথিবী বিস্তার করল

মধ্যযুগ ও নবজাগরণ

সূচী

প্রথম অধ্যায়

১. শেষ রোমানরা

ইতালি ধ্বংস হয়েছে। বহু নগর এখন ভগ্নস্তূপ। আরো বহু নগরের কোনো চিহ্ন নেই। যেন এই নগরগুলির অস্তিত্ব ধরা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। দেখে মনে হতে পারে, মানুষের বিরুদ্ধে স্বয়ং প্রকৃতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এমন মনে হওয়ার কারণ, যেখানে অল্প কিছুকাল আগেও ছিল সমৃদ্ধিশালী দেশ সেখানে একমাত্র ভূমিকম্প বা বন্যা হলে পরেই এমন একটি ধ্বংসকান্ড ঘটা সম্ভব।

অ-চষা জমি পুরোপুরি ঢেকে গিয়েছে আগাছায়। যত্ন-না-নেওয়া আঙুরের ক্ষেত জঙ্গল হয়ে গিয়েছে। মাটি তো আর খাঁ-খাঁ মরুভূমি হয়ে থাকতে চায় না। সে তার নিজস্ব ধরনে নিজের ক্ষত ঢাকা দিতে শুরু করেছে।

রোমের শাসকসভার সভ্যদের বাগানবাড়িগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ফ্যাকাশে লাল ও সাদা মার্বেল থেকে, ভেঙে পড়া থাম থেকে বর্বর আগন্তুকরা তৈরি করেছে তাদের গ্রাম, খাড়া করেছে তাদের দুর্গ। সাইপ্রেস কুঞ্জের মধ্যে কুড়ুল চালিয়েছে, গাছ কেটে ফেলেছে, আর ধোঁয়ায় অন্ধকার তাদের কুঁড়েঘরের চুল্লির মধ্যে সেই কাঠ পুড়িয়েছে।

ভাঙা মূর্তিগুলির টুকরো নিয়ে গথ্‌দের* ছেলেমেয়েরা গ্রামের রাস্তায় খেলা করছে। রোমানদের টোগা ও টিউনিক দিয়ে মায়েরা তাদের নবজাত শিশুদের মুড়ে রাখছে।

পাশের রাজ্যে কায়েম হয়েছে এক নতুন প্রভু—গথিক রাজার একজন অনুচর। এই বিদেশের জমি বিলিব্যবস্থা করার ব্যাপারে রাজা খুবই উদার হয়েছিলেন বলতে হবে। কিন্তু গথ্‌রা যদিও ইতালিতে রাজত্ব করছে, তাতে দাসদের অবস্থা বিন্দুমাত্র উন্নত হয়নি। অথচ এই দাসরাই অভ্যর্থনা জানিয়েছিল গথ্‌দের, রোমের তোরণ খুলে দিয়েছিল। তবুও এই নতুন প্রভুরাই তাদের আবার জুতে দিয়েছে লাঙল ও নিড়ানির সঙ্গে।

এখানে ওখানে দু-একজন রোমান জমিদার এখনো টিকে আছে। তারা টিকে আছে—কিংবা, সঠিকভাবে বলতে হলে, চলে যাবার সময় হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে—যতোদূর সাধ্য ভালোভাবে। মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছে জীবনের এই নতুন ও ভয়ঙ্কর ও বিভ্রান্তিকর ধারার সঙ্গে। প্রতি বছর তারা যায় রাভেনায়—গথিক রাজার রাজকোষে। সেখানে কর দিয়ে আসে তাদের মোট আয়ের তিনভাগের একভাগ। তাদের কাছ থেকে সবকিছু যে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে না এতেই তারা কৃতজ্ঞ।

---

*প্রাচীন টিউটনিক জাতি। গোড়ায় তারা বাস করত বাল্‌টিক সাগরের দক্ষিণ উপকূলে। পরে দেশান্তরী হয় খৃষ্টীয় সাল শুরু হবার অল্প পরে ইতালি, দক্ষিণ ফ্রান্স ও স্পেনে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।—লেখক

নতুন রাজধানী রাভেনা পুরনো রাজধানী রোম থেকে একেবারেই ভিন্ন। উত্তর ইতালির অরণ্যের মধ্যে রাভেনা খাড়া হয়ে উঠেছে একটি দুর্গের মতো। প্রাচীন প্যাগান মন্দিরগুলির চুড়োয় অনেক আগেই স্থাপিত হয়েছে ক্রুশ। প্রাচীন বিচারালয়ে যেখানে একসময়ে বিচারপতিরা আসন নিতেন। সেখানে বসানো হয়েছে বেদী। গথ্‌দের রাজা থিওডোরিক এখন নাম নিয়েছেন 'অগাস্টাস'। যখন কোনো রাজদূত সাক্ষাৎ করতে আসে তিনি একটি রক্তবেগুনী রঙের আঙরাখা পরেন, মাথায় চাপান ঝকমকে মুকুট।

কিন্তু কোথায় সেই আগেকার অগাস্টাস আর কোথায় তিনি—দুজনের মধ্যে কোনোই মিল নেই। এই রাজা না পারেন লাতিনভাষা পড়তে, না লিখতে। এমনকি ফরমানে বা হুকুমনামায় নাম সই পর্যন্ত করতে পারেন না। প্রতিবেশী বারগান্ডি বা ফাঙ্ক্‌স-এর রাজার কাছে যদি কোনো সংবাদ পাঠাতে হয় তাহলে তিনি ডেকে পাঠান তাঁর সচিব ও উপদেষ্টা কাসিওডোরাসকে। কাসিওডোরাস ছিলেন বিশিষ্ট রোমান, শাসকসভার সভ্য। কিন্তু ডেকে পাঠালেই তিনি অনুগতভাবে হাজির হন, সঙ্গে নিয়ে আসেন একটি মোমের ফলক। একজন সচিবের মতোই প্রভুর লিপি লেখেন। কাসিয়াডোরাস আশা ছাড়েননি যে এই বর্বরদের তিনি কিছু শেখাতে পারেন। তিনি জানেন যে বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে এই বর্বরদের পক্ষে চলা সম্ভব নয়।

এই নতুন 'অগাস্টাসের' কাছে, বর্বরদের এই নেতার কাছে সরকার চালানোর ব্যাপারটা তখনো ছিল অভিনব। রোমান উপদেষ্টা ও কর্মচারীরা ছাড়া তিনি সম্ভবত না পারেতন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে, না সরকার চালনার জটিল ব্যাপারটা সামলাতে। গথ্‌রা পুরোপুরি নির্ভর করত বলের ওপরে। যোদ্ধার কাজ অস্ত্র চালাতে জানা, কলম নয়। কিন্তু পড়তে না জানলে ও কলম চালাতে না জানলে কি-ভাবে সরকারের ব্যাপার সামলানো যাবে? কলম হাতে নিয়ে কাসিওডোরাস শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর প্রভু রাজাকে উপদেশ দিতেন। রাজা শুনতেন গুরুর কাছে শিষ্যের শোনার মতো করে।

থিওডোরকের একটি কন্যা ছিল, নাম অমলসুন্থা। মেয়েটি তার বাবার চেয়ে ভালো-ভাবে বুঝত জ্ঞানের প্রয়োজন কতখানি। সে আগ্রহের সঙ্গে বই পড়ত এবং বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ভাষা শিখে নিয়েলিন। কয়েক বছরের মধ্যেই সে লাতিন থেকে গ্রীক ভার্জিল অনুবাদ করতে শুরু করেছিল। তার ছেলে আথালারিক ছিল তার বাবার সিংহাসনের অধিকারী। ছেলেকে সে প্রাথমিক পাঠ দিতে শুরু করল, যদিও গথিক ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো আইনত নিষিদ্ধ ছিল।

রাজার মেয়ে তার ছেলেকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে, কথাটা শুনে রাজার পারিষদদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বৃদ্ধ আর সাহসী তারা হাজির হলো রাজার কাছে। দাবি জানাল যে রাজা এ-ব্যাপারটা বন্ধ করুন। বলল, অন্য ছেলেমেয়েদের কাছে এটা একটা খারাপ দৃষ্টান্ত। আর এটাই বা কেমন কথা যে রাজা নিজেই নিজের আইন ভাঙছেন! সাহসী যোদ্ধা হতে হলে লেখাপড়া শেখার কোনো দরকার নেই। তাছাড়া, লেখাপড়া শিখতে গিয়ে একবার যদি সে শিক্ষকের চাবুককে ভয় করতে শুরু করে তাহলে আর কড়া কথা শুনেও দাঁড়িয়ে উঠতে পারবে না।

পারিষদদের কথাগুলি কাসিওডোরাস চুপচাপ শুনে গেলেন। কোনো রকম আবেগ প্রকাশ করলেন না, যদিও মনে মনে তিনি এই বর্বরগুলোকে ঘৃণা করেন।

অতীতে কী ছিল তারা? ছিল অসভ্য আর মূর্খ।

এই তো, অল্প কিছুকাল আগে ট্যাসিটাস বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন—জার্মান শিশুরা উলঙ্গ হয়ে থাকত, নোংরা মাখামাখি করত, আর শুয়োর ও গোরুছাগলের পালের সঙ্গে

বড়ো হয়ে উঠত। সীজার বিবরণ দিয়ে গিয়েছেন—দস্যুতা কোনো লজ্জার ব্যাপার ছিল না, বরং মনে করা হতো দস্যুতা করার মধ্যে দিয়েই তরুণেরা শিক্ষালাভ করবে। কাসিওডোরাসের মনে পড়ে গেল প্লিনির লেখা এক উপজাতির কথা। অল্প কিছুকাল আগেও এই উপজাতি বাস করত উত্তর সাগরের তীরে, মাটিতে পোঁতা খুঁটির ওপরে ঘর তুলত, চাষআবাদের বিন্দুবিসর্গও জানত না।

গথ্‌দের একটি ইতিহাস লেখার জন্য কাসিওডোরাসকে হুকুম দিলেন থিওডোরিক। কাজটি শক্ত ছিল। গথ্‌দের ইতিহাস অতীতে কিছু নেই, ভবিষ্যতে হতে চলেছে। তবুও কাসিওডোরাস সংস্কৃতির শক্তিতে আস্থা রাখেন, বিশ্বাস করেন যে বর্বরতাকে হটিয়ে সংস্কৃতির শক্তি শেষপর্যন্ত জয়লাভ করবে।

রাজ-দরবারে কাসিওডোরাস ছাড়াও আরো একজন উপদেষ্টা আছেন। তাঁর নাম বোথিয়াস। তিনিও উচ্চবংশের রোমান। বিজ্ঞান ভালোবাসেন। তাঁর গৃহে সবচেয়ে সম্মানজনক স্থান পুস্তকের। অবসর সময়ে সঙ্গীতের ঐকতানের সূত্র অনুশীলন করেন। সংখ্যার সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক স্থির করার জন্য কাঠের ওপরে তার বাঁধেন, সেই তারের দৈর্ঘ্য ছোট কিংবা বড়ো করেন, আর শোনেন শব্দের মাত্রা বড়ো কিংবা ছোট হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গীত সম্পর্কে একটি বই লিখেছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী বইটি টিকে থেকেছে।

বলবিদ্যাতেও বোথিয়াসের আগ্রহ ছিল, থিওডোরিককে তিনি একটি ঘড়ি তৈরি করে দিয়েছিলেন। এই ঘড়ি থেকে জানা যেত শুধু সময় নয়, জ্যোতিষ্কের চলাফেরাও। প্রতিবেশী বারগাণ্ডির রাজা এই জল-ও সূর্য-ঘড়ির কথা শুনলেন এবং অনুরোধ করে পাঠালেন তাঁর জন্যও যেন এমনি একটি ঘড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়। বোথিয়াস কাজে লেগে গেলেন। রাজা থিওডোরিকের দূত এই আশ্চর্য উপহারটি লিয়'তে পৌঁছে দিল।

বোথিয়াসের প্রতি থিওডোরিক খুবই প্রসন্ন হয়ে উঠলেন। তাঁর অনুরোধে কাসিওডোরাস একটি চিঠি লিখলেন বোথিয়াসের কাছে :

"টলেমির জ্যোতির্বিদ্যা ও ইউক্লিডের জ্যামিতি এখন আপনার লাতিন অনুবাদে পড়া হচ্ছে। এখন রোমের ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে দিব্যের ছাত্র প্লেটো ও যুক্তিবিদ আরিস্টটলের আলোচনা। বলবিদ্যাবিশারদ আর্কিমিডিসকে আপনি লাতিনে উপস্থিত করেছেন। উর্বর গ্রীকরা যা-কিছু বিজ্ঞান ও শিল্প সৃষ্টি করেছে তার সবটাই রোম গ্রহণ করতে পারছে তার নিজের ভাষায়—এটা আপনারই কৃতিত্ব।"

চিঠিটা পড়ার পরে বোথিয়াস ভাবলেন, "বুঝতে পারছি চিঠিটা লিখেছে কাসিওডোরাস। কিন্তু একশো বছরেরও বেশি সময় লেগে যাবে এই গথিক বর্বরদের আরিস্টটল ও টলেমি বুঝতে।"

বোথিয়াস প্রতিটি মিনিট বই নিয়ে কাটাতে চাইতেন। জগতে কী হচ্ছে, শাশ্বত নগরীর ও গৌরবজনক রোমান সাম্রাজ্যের কী হলো, তা দেখতে বা জানতে চাইতেন না। দলে দলে বর্বর বন্যার মতো সারা দেশ ছেয়ে ফেলেছে। যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই শুরু হয়েছে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক, এর ফলে যারা টিকে থাকতে পেরেছিল তারাও শেষ হতে চলেছে। রোমান শাসকসভার সভ্যরা ভুলে গিয়েছে যে তারা একসময়ে রোমান ছিল। বর্বরদের কাছে তারা নতজানু হয়—নিজেদের কিছু বিষয় বাঁচাতে পারবে এই আশায়, যেন বন্ধুত্বপূর্ণ কথা দিয়ে তারা বন্যা থামাতে পারবে। কিন্তু বন্যা সবকিছু গ্রাস করেছে, শুধু রোমানদের সম্পত্তি ও অধিকার নয়, উপরন্তু তাদের দর্শন, তাদের শিল্প, তাদের বিজ্ঞান।

কিন্তু হয়তো এখনো ওদের থামানো যেতে পারে, খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি।

অতএব বোথিয়াস শাসকসভার সভ্যদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দিলেন। চিঠি লিখলেন বাইজেনটিয়ামে, যেখানে সীজাররা এখনো দেশ শাসন করছে। হয়তো ওখান থেকেই মুক্তি আসবে, কেননা বন্যার ঢেউ রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশে পৌঁছতে পারেনি। চক্রান্তের সুতো ছড়িয়ে গেল রাভেনা থেকে বাইজেনটিয়ামে। কিন্তু খবরটা গোপন থাকল না, চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেল।

ক্রুদ্ধ হয়ে থিওডোরিক বোথিয়াসকে জেলে পোরার হুকুম দিলেন। জেলের পাথরের দেয়ালের পিছনে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আশংকা করতে করতে বোথিয়াস সান্ত্বনা খুঁজলেন, দর্শনের মধ্যে। একটি বই লিখলেন, বইটির নাম দিলেন 'দর্শনের সান্ত্বনা'। কারাগারের ভারী দরজা শক্তভাবে আঁটা থাকত। পাহারাদারদের ঘুষ দেওয়া যেত না। বোথিয়াসের কোনো বন্ধুকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হতো না। কারাগারের বাইরে বোথিয়াসের কোনো বন্ধু ছিল কি?

যাই হোক, তিনি একা ছিলেন না। তাঁর সঙ্গী ছিল তাঁর বই। বইয়ের মাধ্যমে তিনি সঙ্গ পেতেন সক্রেটিসের, যিনি কারাগারে থাকার সময়ে তাঁরই মতো সান্ত্বনা পেয়েছিলেন দর্শনের মধ্যে। সঙ্গ পেতেন প্রাচীনদের মধ্যে অন্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের। কিন্তু যে মানুষের বিনাশ ঘনিয়ে এসেছে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া শক্ত। বোথিয়াসের মন তিক্ততায় ভরে গিয়েছিল। সামনে তিনি কোনো আলো দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর মনে হতে লাগল, কোনো কিছুই অবিনশ্বর নয়। সবকিছুই শেষ হয়ে যায়। বিশ্বের সবকিছুই ভস্মে পরিণত হয়। এমনকি শাশ্বত নগরীও কালের ধ্বংসকারী শক্তির সামনে দাঁড়াতে পারেনি।

তাঁর কলম কাগজের ওপর দিয়ে উড়ে চলল। তাঁর মাথা অবিরাম কাজ করে চলল।

কিন্তু ঘাতক ইতিমধ্যেই কুড়ুলে শান দিচ্ছিল, যে-কুড়ুল দিয়ে এই চিন্তাশীল মাথাটিকে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হবে। "রোমানদের মধ্যে শেষ রোমান" বোথিয়াস হাঁড়িকাঠে প্রাণ দিলেন।

আর কাসিডোরাসের কী হলো? তিনিও কি প্রাণ দিলেন? নাকি তিনি রোমান নন? অবশ্যই তিনি রোমান, এবং বোথিয়াসের চেয়ে কম রোমান নন। তিনি লেগে ছিলেন প্রাচীন সংস্কৃতি নিয়ে। ষড়যন্ত্রে যোগ দেননি। বহু দীর্ঘকাল ধরেই ইতিহাস অধ্যয়ন করেছিলেন আর ভালো করেই জানতেন যে ইতিহাসের গতি রোধ করা যায় না। তবু সংস্কৃতির জন্য লড়াই করেছিলেন— সে-লড়াই তাঁর নিজস্ব ধরনের লড়াই।

অবসর নিয়ে তিনি দক্ষিণ ইতালিতে নিজের জমিদারিতে চলে গেলেন এবং সেখানে একটি মঠ নির্মাণ করলেন। এটি ছিল বিশ্বের অন্যতম প্রথম মঠ। মঠটির নাম দিলেন 'ভিভারিয়াম', প্রাণের আশ্রয়। আশা করেছিলেন বর্বরদের বন্যা বয়ে যাবার পরেও যতোটুকু থেকে গিয়েছে ততোটুকু রক্ষা করতে পারবেন। মঠের সন্ন্যাসীদের বলতেন 'ইতিহাসের নথি লেখার চেয়ে বড়ো কাজ আর কিছু নেই।' সন্ন্যাসীরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গ্রীস ও রোমের অর্জিত জ্ঞানের বিষয়গুলি লিখে রাখত।

বছরের পর বছর কেটে গেল।

খৃস্টাব্দ ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই অস্ট্রো গথ্‌দের* সাম্রাজ্য লোপ পেল।

---

* পূর্ব গথ্‌দের একটি উপজাতি। তারা ৪৯৩ সালে ইতালিতে ক্ষমতা দখল করেছিল, ৫৫৫ সালে উৎখাত হয়েছিল।—অ

রাভেনায় রাজত্ব কায়েম হলো লম্বার্ডদের।* দক্ষিণ ভিভারিয়ামের মঠে জীবন তখনো আগের মতোই। শান্ত, ছেদহীন কাজ একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি। মৌচাকের মৌমাছি-দের মতো মঠের সন্ন্যাসীরাও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষদের জন্য প্রাচীন জ্ঞানের মধু সংগ্রহ করছিল। এই কাজের আত্মিক জনক ছিলেন কাসিওডোরাস, ততোদিনে তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন, বয়স নব্বই পার হয়েছে। তবুও তাঁর মরবার সময় ছিল না। মনে হতে পারত, মৃত্যু এই মঠের ভিতরে প্রবেশ করতে এবং কাজ বন্ধ করতে বা সন্ন্যাসীদের কলম থামিয়ে দিতে ইতস্তত করছিল। মাঝে মাঝে কাসিওডোরাস তাঁর পান্ডুলিপি থেকে চোখ তুলতেন, দূরের পর্বতের নীল আবছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কিন্তু তিনি সেইসব পর্বত দেখতেন না, দেখতেন রোমের রাস্তা, তাঁর নিজের যৌবন, ও তাঁর বন্ধুদের। দেখতেন বোথিয়াসকে আর 'দর্শনের সান্ত্বনা' বইটির কথা ভাবতেন।

বোথিয়াসকে যারা মৃত্যুর দিকে পাঠিয়েছিল তারা অনেক আগেই মৃত। থিওডোরিক তাঁর কবরে নিদ্রিত। তাঁর কন্যা অমলসুন্থাও মৃত। এই কন্যা বর্বর হতে চায়নি, তাই বর্বররা তার মৃত্যু ঘটিয়েছে।

প্রাচীন রোম বিলুপ্ত। কিন্তু থেকে গিয়েছে বইগুলি। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যায়, কিন্তু বেঁচে থাকে জ্ঞান। কাসিওডোরাস ব্যগ্র ছিলেন আগামী প্রজন্মের মানুষদের জন্য উত্তরাধিকার হিসেবে এই জ্ঞানকে রক্ষা করতে। সংকলন করেছিলেন সাহিত্য ও শিল্পের এক বিশ্বকোষ। কাসিওডোরাসের জানা ছিল সাতটি শিল্প ও সাতটি বিজ্ঞান : ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র, ডায়ালেকটিক, পাটিগণিত, সঙ্গীত, জ্যামিতি ও জ্যোতি-র্বিদ্যা। একটিমাত্র বইয়ে এই সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা কি করে সম্ভব? বার্ধক্যে জীর্ণ তাঁর হাত কাঁপছিল। তাঁর অন্তঃকরণ ক্লান্ত। নব্বইটি কঠোর বছর বেঁচে থাকতে গিয়ে এই অন্তঃকরণকে কত কিছুই না সহ্য করতে হয়েছে!

বৃদ্ধ মানুষটির মনে হতে লাগল, তাঁর মৃত্যুর সময় এখনো হয়নি, বইটি তাঁকে শেষ করে যেতে হবে। তাঁকে অন্ততপক্ষে প্রাচীন জ্ঞানী ব্যক্তিদের নামগুলি সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে মানুষ জানতে পারে কোথায় তাদের সম্পদের সন্ধান করতে হবে, কোথায় সেই সম্পদ জমা আছে।

অবশেষে বইটি শেষ হয়েছিল। কাসিওডোরাস শেষপর্যন্ত একশোবছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যরা সেই কাজ চালিয়ে গিয়েছিল। লিপিকরদের পিঠ তখনো নুয়ে ছিল পুঁথির ওপরে। জ্ঞানানুরাগীরা শুধু নথি করে যেতে পারে, তাছাড়া আর কী-ই বা তাদের করার আছে। নতুন কিছু সৃষ্টি করার সময় আর নেই। এখন প্রয়োজন অন্ততপক্ষে সংরক্ষণ করা এবং পুরনোকেই হাতে তুলে দেওয়া।

প্রতি বছর অজ্ঞতা এই জগতকে করে তুলছে অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকার। ক্রমেই কমছে লিখতে ও পড়তে জানা লোক।

'আমরাই শেষ, তারপরে আর কেউ বিজ্ঞান পড়বে না।' একথা লিখেছিলেন তুর-এর বিশপ গ্রেগরি তাঁর বন্ধু কবি ফরচুনেটাসের কাছে।

বহু মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কাসিওডোরাসের কাছে যেটা ছিল পবিত্র বিষয় সেটা অনেক সময়ে সন্ন্যাসীদের কাছে ছিল পাপস্বরূপ। চার্চের প্রধান রোমান পোপ তাঁর এক

---

*ইতালির লম্বার্ডির অধিবাসীদের বলা হয় লম্বার্ড। এরা টিউটনিক উপজাতি এবং ৫৬৮ সালে লম্বার্ডিতে রাজত্ব কায়েম করেছিল।

বিশপের কাছে লিখেছিলেন : 'মনে হচ্ছে আপনি ব্যাকরণ শিক্ষা দিচ্ছেন। কথাটা দ্বিতীয় বার উচ্চারণ করতে আমি লজ্জাবোধ করছি। কথাটা যতোবার ভাবছি আমি বিষণ্ণ বোধ করছি। আপনি অবশ্যই আমাকে চিঠি লিখে জানাবেন যে আপনি এই উদ্ভট অধর্মীয় বিজ্ঞানের পাঠ পরিত্যাগ করেছেন এবং এজন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব।'

বিজ্ঞানকে তুচ্ছ করা হতো। বিজ্ঞান নির্বাসিত হয়েছিল। এথেন্সে এখন আর কোনো আকাডেমি ছিল না। শেষ দার্শনিকদের আশ্রয়স্থল এই আকাডেমি নয় শতাব্দী ধরে টিকে ছিল। কিন্তু বাইজানটাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আদেশে দার্শনিকরা বিতাড়িত হয়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়ায় একদল জনতা সেরাপিয়নের গ্রন্থাগার ও সেরাপিসের মন্দির পুড়িয়ে দিয়েছিল। গণিতবিদ থিওন-এর কন্যাকে তারা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছিল, কারণ সে তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করত।

এমনকি এথেন্স ও আলেকজান্দ্রিয়াতেও বিজ্ঞানের কোনো স্থান ছিল না। তাহলে আর বিদেশে তার স্থান কী হতে পারে—জার্মানি ও গল্-এর জংলা অঞ্চলে? বিজ্ঞানের সামনে ছিল দীনতা ও কঠোরতায় ভরা এক দুরূহ জীবন। তবে মঠগুলোতে বিজ্ঞানকে সহ্য করা হতো নিতান্তই করুণার বশে— ধর্মতত্ত্বের বিদ্যাধরী মানসকন্যা হিসেবে। সেখানে বিজ্ঞান হয়ে উঠেছিল ঘুমন্ত রাজকন্যা।

তবে শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হবে, এবং ঘুমন্ত রাজকন্যার প্রতীক্ষার জয় হবে। রূপবান এক রাজপুত্র উপস্থিত হবে অবশেষে এবং ওই লোহার কপাট উন্মুক্ত করবে। রাজকন্যার হাত ধরে তাকে বার করে নিয়ে আসবে পাতাল থেকে এবং তাকে রানী করবে। কী নাম হবে এই রাজপুত্রের? রোজার বেকন, না কোপারনিকাস, না লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, না জিওরদানো ব্রুনো?

এই কাহিনী শেষপর্যন্ত যে পড়বে সে জানতে পারবে।

২. আশ্রয়ের সন্ধানে বিজ্ঞানের মঠ থেকে মঠে যাত্রা

সবকিছু অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকার হয়ে গেল। এমনকি পাদরিদের মধ্যেও এমন কাউকে পাওয়া শক্ত হলো যিনি লিখতে ও পড়তে জানেন শুধু এখানে ওখানে কখনো হয়তো দেখা যেত একটা মঠ—পর্বতের ওপরে একক শিলার মতো। মঠের পুরু দেয়ালের পিছনে থাকতেন সন্ন্যাসীরা, ছোট ছোট জানলা দিয়ে যতোটুকু আলো আসত তারই আবছা আলোয় তাঁরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অক্লান্তভাবে পুঁথি লেখার কাজ করে চলতেন।

বর্বরদের দল যখন গোটা সাম্রাজ্য দখল করে নিয়েছিল আশ্রয়প্রার্থীরা সার বেঁধে পালিয়েছিল প্রান্তবর্তী এলাকায়—ব্রিটেনে ও আয়র্ল্যান্ডে। তারা ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছিল ফুটো নৌকায়, অশান্ত সমুদ্রে টালমাটাল হতে হতে। নৌকাগুলোতে ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝাই হয়েছিল আঁতকে-ওঠা স্ত্রীলোকরা, কেঁদে-ওঠা শিশুরা, মরিয়া-হয়ে-ওঠা থমথমে-মুখ পুরুষরা।

তারা পিছনে ফেলে এসেছিল যা কিছুতে তারা অভ্যস্ত তার সবকিছু—তাদের বাড়ি, তাদের জমি, তাদের দাস। সঙ্গে নিতে পেরেছিল শুধু সেইটুকুই যা তাদের কাছে সবচেয়ে দামী। তবুও নৌকাগুলো এত অতিরিক্ত বোঝাই হয়েছিল যে ডুবে যেতে বসেছিল।

কেউ কেউ এনেছিল রুপো ও সোনা, কেউ কেউ ফার ও কাপড়। কিন্তু এমন কেউ কেউ ছিল যাদের কাছে বই সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি। আতঙ্কে পালিয়ে আসার সময়েও

তারা তাদের প্রিয় কবি ও দার্শনিকদের ভোলেনি। প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিদের এইসব রচনাবলী নিয়ে কারও বিশেষ ভাবনা ছিল না গাঁটরি ও মানুষদের মধ্যে বইগুলো মোলায়েমভাবে চাপা পড়ে ছিল। উপযুক্ত সময়ের জন্য ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছিল। আর সময় শেষপর্যন্ত এল!

একটি আইরিশ মঠে একজন জ্ঞানী সন্ন্যাসী প্যাগান চারণকবি। রচিত গাথা লিপিবদ্ধ করছিলেন। কিন্তু এই জ্ঞানী সন্ন্যাসী শুধুমাত্র লিপিকর ছিলেন না। তিনি যখন আইরিশ নাবিক মাইল্‌দুনের সমুদ্রযাত্রার বিবরণ লিখছিলেন তখন অপর একজন আইরিশ নাবিক ওডিসিউসের কথা না ভেবে পারেননি। ওডিসিউস ভূমধ্যসাগর থেকে মহাসাগরে নিয়ে এসেছিলেন সাইকোপ্‌স ও ক্যালিপসো উভয়কেই। প্রাচীন এই আইরিশ গাথায় তিনি স্থাপন করেছিলেন ডেভিডের স্তোত্র থেকে কিছু কিছু কথা ও ভার্জিলের কবিতা : ফোরসিটান এট হায়েক ওলিম্‌ মেমিনিসি ইউভাবিট (সম্ভবত একদিন আমরা এটি স্মরণ করেও আনন্দ পাব)। এমনিভাবে বিশ্বের একেবারে প্রান্তদেশে, পৌরাণিক দেশ উল্‌টিমা টুলের অনতিদূরে শোনা গেল রোমান কবির কণ্ঠস্বর, যিনি তাঁর নিজের দেশেও বিস্মৃত হয়েছিলেন।

বিজ্ঞান ও তৎসহ কবিতা আয়ার্ল্যান্ড ও ব্রিটেনের মঠগুলিতে আশ্রয় পেয়েছিল।

একজন পন্ডিত, 'পূজনীয়' বেডে, মঠের বিদ্যালয়গুলির জন্য পাঠ্য পুস্তক লিখেছিলেন। নিজের ভাষায় লিখেছিলেন সংগীত সম্পর্কিত বোথিয়াসের বইটি। অপর একজন পন্ডিত, ব্রিটন আলকুইন বেডের বই থেকে পাটীগণিত ও সঙ্গীত অধ্যয়ন করেছিলেন। আর এমনিভাবে জ্ঞানের আলো জন থেকে জনে গিয়েছিল—আরিস্টটল থেকে বোথিয়াসের কাছে, বোথিয়াস থেকে পূজনীয় বেডের কাছে, বেডে থেকে আলকুইনের কাছে।

আলকুইনও এই আলো নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখেননি, অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিলেন। আরিস্টটল যেমন ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার শিক্ষক, তেমনি আলকুইন ছিলেন চার্লেমাগ্‌নের শিক্ষক।

ফ্রাঙ্কদের রাজা চার্লস ছিলেন পরাক্রান্ত ও সাহসী যোদ্ধা। তিনি এমনই শক্তিধর ছিলেন যে তলোয়ারের এক কোপে শত্রুর শিরস্ত্রাণ ও খুলি কেটে দুখানা করে ফেলতে পারতেন। তাঁর ওই দুর্ধর্ষ হাতের পক্ষে একটা কলম নিতান্তই হালকা ও ছোট। হাতে কলম নিয়ে সেটাকে কিভাবে সামলাতে হয় তা তিনি জানতেন না। বালিশের নিচে রেখে দিতেন একটা মোমের ফলক ও ধারালো কাঁটা। রাত্রিবেলা যখন ঘুমোতে পারতেন না তখন সেগুলি বার করে খুবই কষ্ট সহকারে ল্যাটিন অক্ষর লেখার চেষ্টা করতেন। খোলা জানলা দিয়ে বাতাস ঢুকে তেলের বাতির শিখা নিয়ে খেলা করত। তাঁর লম্বা দাড়ি মোমের ফলকটার ওপরে গিয়ে পড়ত আর তাতে তাঁর লেখার ব্যাঘাত হতো। অক্ষরগুলি হতো আকারহীন ও আঁকাবাঁকা। দাড়িওলা ছাত্রটি অসন্তুষ্ট হতেন। কাঁটার ভোঁতা দিকটা দিয়ে অক্ষরগুলি মুছে ফেলতেন এবং আবার নতুন করে লিখতেন।

চার্লেমাগ্‌নে প্রাণপণে চেষ্টা করে যেতেন, কারণ তিনি ভালো করেই জানতেন বিরাট এক রাজ্যের শাসনকর্তার পক্ষে লিখতে ও পড়তে জানাটা কতখানি জরুরী। বৃহৎ একটি রাষ্ট্রে যদি করণিক, মন্ত্রিদপ্তর, সনদ, আইন, দূতাবাস না থাকে তাহলে কাজ চলে না। চার্লেমাগ্‌নের রাজ্য ছিল বৃহৎ এবং সবসময়েই আরো বৃহৎ হয়ে চলছিল। আগুন ও তলোয়ার দিয়ে তিনি কত দেশ কত জাতিকেই না বশীভূত করেছেন।

খৃষ্টাব্দ ৮০০ সালের বড়োদিনটি চার্লেমাগ্‌নের জীবনে স্মরণীয় ছিল। ওই দিনে

রোমান পোপ লিও রোমান সম্রাটের সোনার মুকুটটি তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। আর সম্রাট যদি অশিক্ষিত হয় তাহলে কি সেটা খুব ভালো ব্যাপার হয়!

আচেন-এ নিজের প্রাসাদে চার্লেমাগ্‌নের সঙ্গে বিদ্বান ব্যক্তিদের দেখাসাক্ষাৎ হতো। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আল্‌কুইন, ঐতিহাসিক আইনহার্ড, কবি আঙ্গিলবার্ট। পণ্ডিতদের আলোচনা শোনবার জন্য চার্লেমাগ্‌নে তাঁর ছেলেমেয়েদের ও বোনদের ডেকে পাঠাতেন। এই সমস্ত বৈঠকে তাঁদের নানা ডাকনাম প্রচলিত ছিল। আঙ্গিলবার্টের ডাকনাম ছিল হোমার, আল্‌কুইনের ছিল একটি রোমান ডাকনাম—আল্‌বিনাস। তাঁকে ফাক্কুস নামেও ডাকা হতো। এটি রোমান কবি হোরেসের অপর একটি নাম। গ্রীক ও রোমানদের এই সমাবেশে এমনকি রাজা ডেভিডও অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত থাকতেন। চার্লেমাগ্‌নেকে তাঁরা এই নাম দিয়েছিলেন।

বৈঠকে বক্তৃতা দেওয়া হতো, বিতর্ক চালানো হতো, বক্তৃতার কলাকৌশল আয়ত্ত করা হতো। বাগ্মিতার এই প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকে চেষ্টা করত অপরকে ছাড়িয়ে যেতে। চার্লেমাগ্‌নে যখনই শুনতেন কেউ একজন খুব বুদ্ধিমানের মতো কোনো একটা জবাব দিয়েছে, বাহবা দিয়ে বলে উঠতেন, 'সাবাশ, জবর ঘা পড়েছে।' কিংবা, 'এই তো লড়াইয়ের মতো লড়াই।'

ব্যাপারটা ছিল খেলার মতো। কিন্তু এই খেলায় যোগদানকারীদের কাছে ব্যাপারটা ছিল অতি গুরুতর ও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা তাঁদের এই ছোট চক্রটিকে বলতেন 'আকাদেমি' এবং চার্লেমাগ্‌নেকে এই বলে প্রশংসা করতেন যে তিনি আধুনিক এথেন্সের প্রতিষ্ঠাতা।

কিন্তু কোথায় এথেন্স আর কোথায় এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে নীরস নগর, যে ঘন জঙ্গল প্রাসাদের জানলা দিয়ে তাকালেও চোখে পড়ে। আর সত্যিই কি এটাকে প্রাসাদ বলা যায় নাকি? পুরু পাথরের দেয়াল, সামান্য কয়েকটা ছোট ছোট জানলা, লোহার তোরণ—এসব তো ব্যারাক বা দুর্গের পক্ষেই আরো বেশি মানানসই। আগুনের চারপাশে জমায়েত এই সান্ধ্য আলোচনা-সভাকে আকাদেমি বললে বড়ো বেশি বাড়িয়ে বলা হয়। একে আকাদেমি বলা চলে না, বরং বলা চলে শিশু ও বয়স্কদের জন্য একটা বিদ্যালয়। কই, এখানে কখনো শোনা যায় না যে নতুন কোনো কোনো আবিষ্কার হচ্ছে বা নতুন কোনো পর্যবেক্ষণ চলছে। এখানে যারা সমবেত হয়েছে তারা শুধু নিজেদের চিন্তাকে প্রকাশ করতে শিখছে, আর কিছু নয়। আর এইসব চিন্তাও কি তাদের মৌলিক চিন্তা?

আকাদেমির জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু একটি বিদ্যালয় করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। কেননা চারদিকে বহুদূরে পর্যন্ত লিখতে পড়তে জানা লোক একজনও ছিল না...

তারপরেও শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে গেল। জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে গেল হাত থেকে হাতে, অন্ধকারের মধ্যে তার কিরণ হয়ে উঠতে লাগল আবছা থেকে আরো আবছা।

চার্লেমাগ্‌নের মৃত্যুর পরে তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তিনি যতোদিন বেঁচে ছিলেন একহাতে জমি সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু অন্য হাতে সেই জমি বিলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ডিউক ও কাউণ্টদের মধ্যে। আর এই ডিউক ও কাউণ্টরা মনে করত তারাই নিজ নিজ এলাকার প্রভু। প্রত্যেকটি জমিদারি হয়ে উঠেছিল ছোট সংস্করণের রাষ্ট্র, ছোট আকারে নিজস্ব একটি জগৎ।

৩. জগৎ আরো একবার সংকীর্ণ হয়ে যায়।

জমিদারিটা পৃথক এক জগৎ, চারিদিকের সবকিছু যদি লোপ পায় তবুও সেই জমিদারি টিকে থাকতে পারে। কাউণ্টের দুর্গ ও তাকে ঘিরে থাকা গ্রাম—সেটা ছিল মহাসাগরের মাঝখানে একক একটি দ্বীপের মতো।

ভূমিদাসরা নিজেদের জন্য ও তাদের প্রভুর জন্য কাপড় বুনত, পশুর চামড়া ছাড়াত ও শোধন করত, জুতো সেলাই করত, নিজেদের সুরা চোলাই করত, নিজেদের দানাশস্য পেশাই করত, মাছ ধরত।

তারা ছিল ভূমিদাস, দাস নয়।

দাস ধরে রাখার ব্যবস্থা হাজার হাজার বছর টিকে ছিল, কিন্তু রোমের সঙ্গে এই ব্যবস্থাও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

নতুন এক ব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, জগতে কায়েম হয়ে বসছে।

জমিদারের জমিদারিতে কিছু কিছু দাস এখনো থেকে গিয়েছে, কিন্তু জমিদারি নির্ভর করে দাসদের শ্রমের ওপরে নয়, ভূমিদাসদের ওপরে।

ভূমিদাস প্রভুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, দাসের মতো তাকে বিক্রি করা চলে না। সে বাঁধা রয়েছে যে জমি সে চাষ করে সেই জমির সঙ্গে। জমি যদি বিক্রি হয়ে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেও বিক্রি হয়ে যায়। এমনিতে স্বাধীন মানুষ, তা সত্ত্বেও জমিদারির বিষয়সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত।

দাস তার কাজকে সবসময়েই ঘৃণা করত, কিন্তু ভূমিদাস জানে যে বেঁচে থাকতে হলে তাকে কাজ করতেই হবে। তার ফসলের মাত্র অর্ধাংশ বা এক তৃতীয়াংশের সে মালিক। তবুও মালিকানা তো বটে। অক্লান্ত কাজ করে চলে সে, তার নিজের জন্য এবং তার প্রভুর জন্য। দাসের নিজস্ব বলতে কিছু ছিল না, কিন্তু ভূমিদাসের রয়েছে নিজস্ব হাতিয়ার। নিজের লাঙল ও মই যাতে ভালো অবস্থায় থাকে সেজন্য সে যত্ন নেয়।

ফ্রান্স ও জার্মানির জঙ্গলের মধ্যে দ্বীপের মতো এই যে সব জমিদারি সেখানে সবকিছুই নির্ভর করত ভূমিদাসদের শ্রমের ওপরে। চারদিকের ঘন ঝোপঝাড়ে প্রচুর নেকড়ে ও ভালুক ছিল। ক্বচিৎ কখনো জমিদারমশাই একপাল কুকুর ও একদল খেদাড়ে নিয়ে জঙ্গলে যেতেন শিকার করার জন্য। অনেক দূর পর্যন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতো শিকারীর শিঙা ও কুকুরের ডাক। তারপরে আবার নিস্তব্ধতা।

ঘর থেকে খুব বেশিদূর পর্যন্ত যাবার সাহস লোকের ছিল না। রাস্তাগুলো এতই খারাপ ছিল যে এমনকি ঘোড়ার পিঠে চেপেও সেই সব রাস্তা পার হওয়া যেত না। কখনো যদি এমন হতো যে একটি শব ও কনে—একটি বিয়ের মিছিল ও একটি শোকযাত্রা রাস্তায় মুখোমুখি হয়ে গিয়েছে তাহলে পরস্পরকে পার হয়ে যেতে খুবই মুশকিলে পড়তে হত।

দীর্ঘ পর্যটনে বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছা বা সাহস খুব কম লোকেরই ছিল। কেননা পথের ধারে প্রতিটি দুর্গ ছিল ডাকাতদের ডেরা। পর্যটকদের সবসময়ে সশস্ত্র ডাকাতদল সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হতো। জমিদার নিজেই এই ডাকাতদলের নেতৃত্ব করত। আর যদি কখনো ডাকাতদলের দেখা পাওয়া যেত তাহলে কী যে হতো!

একটা আইন ছিল যে গাড়ি থেকে কিছু পড়ে গেলে তা খোয়া যাবে। গাড়ি থেকে যাতে ভালোরকমই পড়ে তা দেখার জন্য হামলাকারীর অভাব ছিল না।

লোকে বড়োরাস্তা যথাসাধ্য এড়িয়ে চলত। অধিকাংশ বণিক যাতায়াত করত পায়ে হেঁটে, মালপত্র পিঠে নিয়ে। মালপত্র বলতে থাকত দূরপ্রাচ্যের দেশগুলি থেকে আসা লবঙ্গ ও গোলমরিচ, ফ্রীজল্যাণ্ডের কাপড়, আর মেয়েদের জন্য ঝকঝকে সিল্কের রিবন।

জগৎ ক্রমেই সংকীর্ণ থেকে আরো সংকীর্ণ হয়ে উঠল। অস্ট্রীয় সন্ন্যাসীরা তাঁদের কাহিনীতে লিখেছিলেন যে নরমান, ইংরেজ ও ফরাসীরা ছিল সম্পূর্ণ অজানা মানুষ। অস্ট্রিয়ার নাম শুনেছে এমন লোক ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে প্রায় ছিলই না বলতে গেলে।

লোকে বিদেশীদের সন্দেহের চোখে দেখত। বিদেশী বণিকদের দেখা যেত একমাত্র বাজারের এলাকায়। অল্প কয়েকটা মাত্র নগরে মেলা অনুষ্ঠিত হতো, তাও কদাচিৎ। বিদেশী বণিকদের ঝগড়া প্রায়ই হয়ে দাঁড়াত ছুরি নিয়ে মারামারি। সহ বাণিজ্য হয়ে দাঁড়াত বড়োরাস্তার ডাকাতি। বণিকরা পরস্পরের দোকানপাট যেমন ভাঙত, তেমনি ভাঙত পরস্পরের হাড়।

আরো একবার লোকে হয়ে উঠল যে-গ্রহে তাদের বাস সেই গ্রহ সম্পর্কে অজ্ঞ, যেমন তারা অজ্ঞ সবচেয়ে দূরের তারা সম্পর্কে। বাকি জগৎ সম্পর্কে তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। বাকি জগতকে বাদ দিয়েই তাদের বেশ চলে যাচ্ছিল।

বইয়ের অস্তিত্ব মাত্র ছিল না। বই পাওয়া যেত একমাত্র মঠের মধ্যে। সন্ন্যাসী না হলে ধর্মের বই পড়াও নিষেধ ছিল।

জগৎ আরো একবার সংকুচিত হয়ে গেল।

এমনকি পণ্ডিতরাও জগতের যে ছবি আঁকতেন তা ছিল চারদিকে মহাসাগর ঘেরা সংকীর্ণ এক কামরার। মহাসাগরের ওপার থেকে এই জগতের দেয়ালগুলি উঠেছে। দেয়ালগুলি উঁচুদিকে ঘুরে গিয়েছে আর তার ফলে গড়ে উঠেছে নিরেট এক নভোমণ্ডল। এই নভোমণ্ডলের ওপরে বাস করেন ঈশ্বর ও সাধুরা।

এই সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ জগতে সাগর ছিল মাত্র একটি, উপসাগর তিনটি, বৃহৎ নদী তিনটি—নাইল, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস। জগতের একেবারে কিনারে, মহাসাগরের ওপারে, ছিল আরেকটি দেশ, সেখানে ছিল স্বর্গ। জগৎ ও স্বর্গের এই চিত্র পাওয়া যায় প্রাচীন একটি বইয়ে, নাম 'খ্রীষ্টীয় স্থান-বিবরণ'। বইটি লিখেছেন কজ্‌মা নামে মিশরীয় এক সাধু, খ্রীষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতাব্দীতে।

কজ্‌মা চারদিকে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এবং জগতকে দেখেছিলেন। তাঁকে যে 'ভারত ঘুরে আসা নাবিক' বলা হতো সেটা অকারণে নয়। কিন্তু তিনি বিদ্যাশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। বলতেন, বিদ্যাশিক্ষা মানুষকে অহঙ্কারী করে তোলে আর অহঙ্কার হচ্ছে পাপ। হতে পারে বিজ্ঞানীরা বোঝেন গ্রহণ কেন হয়, কিন্তু তাতে মানুষের উপকার কী? এই কথা ঘোষণা করার পরে কজ্‌মা বিনয়ের সঙ্গে আরো বলতেন, 'আমি নিজের হয়ে কথা বলছি না। এটা আমার নিজের মত নয়। এই জ্ঞান আমি লাভ করেছি ধর্মশাস্ত্র থেকে।'

পণ্ডিতরা আর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতেন না। তাঁদের আগ্রহ ছিল ধর্মীয় লেখার দিকে। তাঁদের চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত ধর্মশাস্ত্রের হলদে পার্চমেণ্টের ওপরে। চোখের দৃষ্টি যখন ক্লান্ত হতো আর চোখ ফুলে উঠত তখন তাকাতেন বাইরের জগতের দিকে। তখনো কিন্তু সেই জগতকে দেখতেন না। তাঁদের চারদিকে গাছ বা ফুল বা পাখি থাকত না, থাকত শুধু সংকেত আর রেখা। সবকিছুর অস্তিত্ব শুধু ধর্মশাস্ত্রকে জোরদার করার জন্য বা ব্যখ্যা করার জন্য।

একটি আধা-অন্ধকার কামরার মধ্যে একজন শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের মঠ থেকে প্রকাশিত ইস্কুলপাঠ্য বই 'জীবজানোয়ারের গল্প' থেকে পড়াতেন। বইটি বিরল জানোয়ারদের সম্পর্কে। বইয়ে হাতি সম্পর্কে তারা পড়ত : হাতি হাঁটু বাঁকাতে পারে না, তাই একবার পড়ে গেলে আর উঠে দাঁড়াতে পারে না। একটা হাতি নাকি সবসময়ে ঘুমোত একটা ওকগাছে ঠেশ দিয়ে। কি করে শিকারীরা সেটা টের পেয়ে গিয়েছিল। তারা করত কি, গাছগুলোকে করাত দিয়ে আধাআধি কেটে রাখত। হাতি এসে গাছে ঠেশ দিত আর

সংগে সংগে সেই গাছ ভেঙে পড়ত, আর হাতি আর্ত চিৎকার করতে থাকত। সেই আর্ত চিৎকার শুনে আরেকটা হাতি আসত তাকে উদ্ধার করার জন্য, এসে নিজেও পড়ে যেত। তখন দুজনে মিলে চিৎকার জুড়ে দিত। তাদের চিৎকার শুনে আরো বারোটা হাতি এসে হাজির হতো। কিন্তু তারা সকলে মিলেও সবচেয়ে নিচের হাতিটাকে ওঠাতে পারত না। তখন এসে হাজির হতো খুদে একটা হাতি। সে তার শুঁড় চালিয়ে দিত মাটিতে-পড়ে-থাকা হাতির নিচে দিয়ে, তাকে টেনে তুলে পায়ের ওপরে দাঁড় করিতে দিত।

ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা বড়ো বড়ো চোখ করে এই গল্প শুনত। কিন্তু হাতিরা যেখানে বাস করে সেই দেশ সম্পর্কে ছেলেমেয়েরা স্বপ্ন দেখুক সেটা শিক্ষকমশাই কখনো হতে দিতেন না। তিনি এই বলে ব্যাখ্যা করতেন যে গল্পটা একটা রূপক। মাটিতে-পড়ে-যাওয়া হাতিটা হাতি নয়, অনুশাসন, প্রাচীন ইহুদী বিশ্বাস। আর মাটিতে-পড়ে-যাওয়া হাতিকে টেনে তুলেছিল যে খুদে হাতি সে হচ্ছে ত্রাতা। তিনি পার্থিব রূপ ধারণ করে-ছিলেন এবং পতিত মানবের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন।

এমনিভাবে চমৎকার একটি গল্প পরিবর্তিত হয়েছিল চতুর নীতিমূলক উপদেশে।

দূরের দেশের গল্প ক্রমেই আরো বেশি বেশি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হতে থাকল সাধুসন্ত সম্পর্কিত উপদেশের সঙ্গে। সন্ন্যাসীরা সাধু ব্রেনডেন ও তাঁর ভ্রমণসংগীদের সম্পর্কে গল্প বলত। একদিন তারা মস্ত একটি দ্বীপ দেখতে পেল। সেই দ্বীপে ঘাঁটি তৈরি করে তারা একটা তাঁবু খাটাল। আচমকা সেই দ্বীপ লেজের ঝাপটা দিয়ে উঠল আর সাঁতার কেটে পালিয়ে গেল। আসলে সেটা ছিল একটা মাছ।...প্রাচ্যের একটি দেশের আরেকটি গল্প বলা হতো যাতে প্রেস্টার জন নামে প্রধান পুরোহিত হীরা-জহরৎ মণি-মুক্তো দিয়ে তৈরি সিংহাসনে বসে শাসন করতেন। তাঁর প্রাসাদের ভোজে তিরিশ হাজার অতিথি আসীন হতো। তাঁর সেবায় নিযুক্ত ছিল সাতজন রাজা, ৬২ জন ডিউক, ২৬৫ জন মারকুইস, তাঁর ডাইনে বাঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকত বারোজন বিশপ।

এই সমস্ত কাহিনী সবাই বিশ্বাস করত। করবে নাই বা কেন, যেখানে রাজা ও ডিউক ও মারকুইস ও বিশপদের সংখ্যা এমন নির্ভুলভাবে গণনা করা হচ্ছে? মানুষ আবার বাস করছিল এক ক্ষুদ্র সংকীর্ণ জগতে, আর তার দেয়ালের বাইরে যা ঘটছিল তাই নিয়ে রূপকথা বলছিল।

লাটিমে সুতো জড়াতে জড়াতে মেয়েরা প্রাচীন এক রাজার বিষয়ে গান গাইত। সেই রাজা বাস করতেন জগতের কিনারে তুলে নামে এক দেশে। সমুদ্রের ঢেউ এক গম্বুজের নিচে আছড়ে পড়ত, আর সেই গম্বুজের মধ্যে রাজা তাঁর যোদ্ধাদের নিয়ে পানভোজনে মেতে থাকতেন। এ হচ্ছে সেই তুলে যার গল্প শোনা যেত সমুদ্রযাত্রার গোড়ার দিকে গ্রীক নাবিকদের মুখে।

তীর্থস্থানে তীর্থযাত্রীদের নিয়ে লেখা বইগুলি থেকে ছেলেমেয়েরা ছবি দেখত। একটি ছবিতে পৃথিবী ও স্বর্গ দেখানো হয়েছিল। পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছিল পর্বত ও উপত্যকা, অরণ্য ও মাঠ। খুদে খুদে ঝাড়ের ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল ছোট ছোট মঠ ও দুর্গের ছুঁচলো চুড়ো। ওপরের দিকে পৃথিবীকে ঢেকে রেখেছিল আকাশ, ঠিক একটা গোল চাঁদোয়ার মতো। এই আকাশে খচিত ছিল অজস্র তারা এবং সূর্য ও চন্দ্র। এ থেকে বোঝা যাচ্ছিল দিন ও রাত্রি একই সংগে চলছে।

সামনা সামনি, এই স্বর্গীয় চাঁদোয়ার একেবারে শেষ কিনারে দেখা যাচ্ছিল এক ধার্মিক তীর্থযাত্রীকে, নতজানু অবস্থায়, হাতে লাঠি। চাঁদোয়ার পর্দা তিনি একপাশে

টেনে ধরেছেন আর অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছেন ওপারে কী আছে। দেখছেন জগতের সীমানার ওপারে রয়েছে স্বর্গীয় স্ফটিক গোলক, মস্ত মস্ত চাকা সেগুলোকে ঘোরাচ্ছে। এই ছবিতে জগতকে দেখানো হয়েছে খুবই ছোট করে, জগতের কিনার রয়েছে একেবারেই নিকটে।

আর ছেলেমেয়েরা জগতের কিনারে যাবার স্বপ্ন দেখত।

প্রাচীনকালে জগতের সীমানাকে দূরে ঠেলে দেবার জন্য মানুষকে কত পরিশ্রমই না করতে হয়েছিল। এখন সেই জগৎ হয়ে গিয়েছে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ। প্রত্যেকটি খামার নিজের মধ্যে আবদ্ধ একটি ক্ষুদ্র জগৎ, নিজের উৎপাদনেই তার চলে।

কিন্তু এই ক্ষুদ্র জগতে কাজ হচ্ছিল। মানুষ নতুন করে গড়ে তুলছিল তার জীবন।

এমন সময় আসছে যখন এই গোপন কাজ প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর তখন জগতের সীমানা সরে যাবে আগের চেয়েও আরো দূরে।

৪. প্রাচ্যে তখনো আলো রয়েছে

পশ্চিম যখন পুরোপুরি রাতের অন্ধকারে ঢাকা পড়েছিল, পূবে তখনো ছোট একটি আলো জ্বলছিল—ঠিক যেমন অস্তগামী সূর্যের আলো পর্বতের চূড়ো আলোকিত করে, ওদিকে যখন নিচের উপত্যকায় আগেই অন্ধকার নেমেছে।

পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্স্টান্টিনোপল বন্দরে জাহাজের আসা-যাওয়া বজায় আছে। সেখানে হাজির হচ্ছে দূর দূর দেশ থেকে যাত্রীদলের দীর্ঘ সারি। তারা আনছে আরব থেকে সুগন্ধী, ভারতবর্ষ থেকে গোলমরিচ লবঙ্গ ও মূল্যবান পাথর, আবিসিনিয়া থেকে হাতির দাঁত।

একজন বাইজানটিন সন্ন্যাসী ফোকর-করা লাঠির মধ্যে লুকিয়ে রেশম কীট নিয়ে এসেছিলেন চীন থেকে কন্স্টান্টিনোপলে। আর কন্স্টান্টিনোপলের দক্ষ কারিগররা বাইজাইন্টিন রেশম থেকে মূল্যবান বস্ত্র বুনতে লাগল।

পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য টিকে থাকল আর পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেল—তার কারণ কী? বাইজানটিয়াম টিকে থাকতে পেরেছে তার কারণ বাইজানটিয়াম দাস-মালিকানা বর্জন করেছে।

রোমের বাজার এলাকায় ঘাস গজিয়েছিল। আর কন্স্টান্টিনোপলে তারা তৈরি করছিল নতুন নতুন সুন্দর প্রাসাদ ও গির্জা। মানুষের হাতে তৈরি আকাশের মতো সেণ্ট সোফিয়ার গির্জার গম্বুজ উঠে গিয়েছে। তার নিচের দিকে ফুটে রয়েছে উজ্জ্বল জানলার বলয়। এই গম্বুজটি তৈরি করতে গিয়ে নির্মাণকারীদের আয়ত্ত করতে হয়েছিল প্রাচীন বিদ্যা ও জ্ঞান, অভিনিবেশের সঙ্গে অধ্যয়ন করতে হয়েছিল আর্কিমিডিসের ভারসাম্য ও অবলম্বন সম্পর্কে বই। ভাস্কর তার ছেনি দিয়ে কুঁদে কুঁদে মার্বেল স্তম্ভের মধ্যে ফুটিয়ে তুলল সূক্ষ্মতম ঝালর। দেয়ালের ওপরে খ্রীষ্ট ও তাঁর সাধুদের মূর্তি ফুটিয়ে তোলা হলো নীল ও সোনালি পটভূমিতে নানা রঙের আলপনার মধ্যে।

আদি খ্রীষ্ট ছিল দাস ও ভিখিরিদের বন্ধু, আর এখানে চমৎকার সিংহাসনের ওপরে বসে আছেন যে স্বর্গীয় রাজা তাঁর সঙ্গে সেই খ্রীষ্টের কতই না অমিল। শিল্পী

বাইজানটিয়ামের সম্রাটকে এঁকেছেন অতি সুচারু সোনালি বুটিদার রেশমী পোশাক পরিহিত অবস্থায়, তাঁর মাথায় স্থাপন করেছেন অমূল্য মুকুট, স্বর্গীয় রাজার সামনে তিনি দুই হাত সম্মুখে প্রসারিত করে নতজানু হয়ে রয়েছেন। ঠিক এমনি ভাবেই বাইজান-টিয়ামের সবচেয়ে বিশিষ্ট অভিজাতরা সম্রাটের সামনে মাথা নত করতেন ও তাঁর পদ-চুম্বন করতেন যখন সেই সম্রাট তাঁর নিজের প্রাসাদে সেই অভিজাতদের কাছে দর্শন দিতেন। একসময়ে সেই গোড়ার দিকের খ্রীষ্টানরা মৃত্যুকে পর্যন্ত ভয় পেত না, রোমের সম্রাটকে দেবতা হিসেবে মানতে অস্বীকার করেছিল। এখন তারা নিজেরাই তাদের পার্থিব নেতাকে দেবতা বানিয়ে ছেড়েছে, তাদের ছবিতে সম্রাটকে তারা চিত্রিত করেছে মসকের চারদিকে জ্যোতির্মণ্ডল সহ।

বাইজানটিয়ামে এমন অনেক কিছু ছিল যা দেখে প্রাচীন রোমের কথা মনে পড়তে পারত। আশেপাশের লোকেরা যে বাইজানটিন গ্রীকদের নাম দিয়েছিল 'রোমান', তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তারা ছাড়া আর কেউ ছিল না যারা প্রাচীন আইন, বিজ্ঞান ও প্রাচীন শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

এখানে ওখানে গির্জার মধ্যে দেখা যেত একজন দেবদূতের মূর্তি, প্যাগান দেবতার মতো সুন্দর। স্তোত্রের বইতে দেখা যেত রাজা ডেভিডের মূর্তি, বীণাবাদনরত, তাঁর সঙ্গে প্যাগান গায়ক অরফিউসের খুব বেশি মিল। ডেভিডের কাঁধের পেছনে ছিলেন একজন শিল্পের দেবী, আর তাঁর পায়ের কাছে ছিলেন ছাগল ও ভেড়ার পালের মধ্যে অর্ধ-উলঙ্গ দেবতা প্যান।

এগুলি আগেকার শিল্পের অবশেষ মাত্র। ছবিতে সাধুদের মুখগুলি হয়ে উঠল আরো ফ্যাকাশে, আরো বিবর্ণ। প্রত্যেকটি নতুন ছবি ছিল আগেকার ছবির প্রতিলিপি মাত্র। গির্জার অনুশাসন ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যাবার পাপ করতে শিল্পীরা ভয় পেত।

শিল্প ও বিজ্ঞান গির্জার পায়ের কাছে নত হয়ে থাকত। 'হেরেসি' বা 'প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে বিশ্বাস'—কথাটা শুনলেই ত্রাস সৃষ্টি হতো আর এই কথাটাই আরো ঘন ঘন শোনা যেতে লাগল। হেরেসি একটি গ্রীক শব্দ, যার অর্থ 'পছন্দ'। কিন্তু দুই মতের মধ্যে পছন্দ থাকাটা গির্জা সহ্য করত না। অন্যতম বিশ্বাসীদের গির্জা নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করত। ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানীরা প্রাচীন দর্শন পড়তেন শুধু তার ভুল ধরার জন্য। তাঁরা তখন আর প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটাসের লেখা পড়তেন না। পড়তেন আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ ডিয়োনিসিয়াসের লেখা। ডিয়োনিসিয়াস ডিমোক্রিটাসকে বাতিল করেছিলেন। ডিয়োনিসিয়াস শিখিয়েছিলেন, এই জগৎ বিমূর্ত অবস্থা থেকে স্বতঃসৃষ্ট নয়, এই জগৎকে সৃষ্টি করেছে এক পরম আত্মা—যেমন নির্মাণকারীর হাত সৃষ্টি করে গৃহ। তিনি বলেছিলেন, নক্ষত্রগুলি তাদের নিজস্ব স্থির পথে চলে বেড়াচ্ছে—কথাটা ঠিক নয়। নক্ষত্রগুলি চালিত হচ্ছে ঈশ্বরের কথায়। বলেছিলেন, সকল সৎ মানুষ একথা বিশ্বাস করে। বলেছিলেন, হতভাগ্য মানুষেরা—অবিশ্বাসীরা—মানুক বা না মানুক, কথাটা সত্য।

গির্জার বইয়ের পৃষ্ঠায় প্রাচীন দার্শনিকদের হীন করা হলো। বিকৃত করা হলো তাঁদের ধ্যানধারণা। কট্টর সন্ন্যাসীরা প্রায়ই তাঁদের অপমান করে লিখতেন ও তাঁদের গালি-গালাজ করতেন। কারণ তাঁরা খ্রীষ্টান ছিলেন না, ছিলেন প্যাগান। একজন ধর্মগুরু তো আরিস্টটলের লেখাকে তুলনা করেছিলেন সমুদ্রের ফেনার সঙ্গে, অপ্রয়োজনীয়তার দিক থেকে। আরেকজন নির্লজ্জের মতো ডিমোক্রিটাস সম্পর্কে লিখেছিলেন 'ডিমোক্রিটাস নামে ও বজ্জাত লোকটা'।

প্রাচীন গ্রীসের প্যাগান মন্দিরের সাদা মার্বেলের স্তম্ভগুলি নীল আকাশের পট-ভূমিতে কী উজ্জ্বলভাবেই না ঝিকমিক করত। সৃজনশীল গ্রীক পন্ডিতদের চিন্তাধারা কী চমৎকারভাবেই না উদ্ভাসিত হয়েছিল। কিন্তু এখন সন্ধ্যার ছায়া নামছে। প্রাচীন শিল্পের শেষ রশ্মি এখনো ঝিকমিক করছে বাইজানটিন মূর্তির সোনা ও রূপোয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত প্যাগান মন্দিরের স্তম্ভগুলি তুলে ধরে আছে গির্জার গম্বুজ। বিরুদ্ধ ধর্মীয় রচনার পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত থাকত পুড়িয়ে দেওয়া প্যাগান বইগুলি থেকে। আর তারই মধ্যে রক্ষিত ছিল প্রাচীন জ্ঞানের অবশেষ।

সন্ধ্যার আলোয় বাইজানটিয়াম ঝলমল করত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. মঞ্চে নতুন চরিত্রের আবির্ভাব

ইতিহাসের বিশাল মঞ্চে নতুন একদল চরিত্রের আবির্ভাব ঘটল। তারা কেউ কেউ নিজেদের বলত স্লাভ। অন্যরা নিজেদের বলত অ্যাণ্টি। অ্যাণ্টি মানে দৈত্য। অ্যাণ্টিদের সম্পর্কে বলা হতো তারা দীর্ঘদেহী, প্রচণ্ড শক্তিধর, আর এমনই অতিকায় যে ঘোড়া পর্যন্ত তাদের বহন করতে পারত না।

এই অ্যাণ্টিরা কারা? তারা গ্রেটরাশিয়ান, ইউক্রেনীয়ান ও বাইলোরাশিয়ানদের পূর্ব-পুরুষ এবং সিথিয়ান চাষীদের বংশধর, যে সিথিয়ান চাষীদের সঙ্গে একসময়ে হেরোডেটাস কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। সিথিয়ানদের মধ্যে কাহিনী প্রচলিত ছিল যে স্বর্গ থেকে তাদের জমির ওপরে পড়েছিল একটি সোনালী হাল, জোয়াল, টাঙ্গি ও গামলা।

বহু শতবছর পরে একালের প্রত্নতাত্ত্বিকরা নীস্তার ও নীপারের মধ্যবর্তী উপত্যকায় মাটি খুঁড়ে বার করেছেন বল্গা হরিণের শিঙের খন্তা, হাড়ের কাস্তে, শস্যদানা মাড়াই করার পাথর, শস্য জমা রাখার মস্ত মস্ত মাটির পাত্র। এগুলি আসলে সেই প্রাচীন চাষীদের হাতিয়ার, অ্যাণ্টিরা যাদের বংশধর।

হেরোডোটাসের পরে দীর্ঘকাল পার হয়েছে। নীস্টার ও ডনের মধ্যবর্তী বিশাল সমতলের মানুষরা সময়টা নষ্ট করেনি। তারা শিখেছে জমি আরো ভালোভাবে চাষ করতে, বাড়ি আরো ভালোভবে বানাতে। এত বেশি নগর তাদের ছিল যে বিদেশীরা তাদের দেশকে বলত 'নগরের দেশ'। গড়ের ঢিপি পরিবৃত এই সমস্ত নগরে তাদের কর্মশালায় কাজ করত সুদক্ষ কারিগররা—কামার, ঢালাইকর, কুমোর, জহুরী। এই সমস্ত কারিগরের ব্যবহার করা জিনিস—রুপো, ও সোনার টুকরো, সাঁড়াশি, ঢালাইয়ের ছাঁচ, মুচি, টাঙ্গি, ধাতুর চাক্‌তি—বহুকাল মাটির নিচে টিকে থেকেছে।

গ্রীকরা অনেক আগে থেকেই রুশ দেশ সম্পর্কে জানত আর রুশরা জানত গ্রীকদের সম্পর্কে।

ক্রিমিয়ায় সিথিয়ানদের ছিল নিজস্ব নগর, যা গ্রীক উপনিবেশ থেকে খুব বেশি দূরে নয়। শত্রুর হামলা থেকে নগরকে রক্ষা করার জন্য যে রকম শক্ত-পোক্ত পাথরের দেয়াল তৈরি করা হয়েছিল তা দেখে বিদেশীরা অবাক হতো। এমন শক্ত-পোক্ত দেয়াল গ্রীক উপনিবেশে ছিল না। সিথিয়ান রাজাদের প্রাসাদে ও সমাধিগৃহের দেয়ালগুলিতে অলংকার ফুটিয়ে তুলত দক্ষ কারিগররা। তাতে থাকত ঘোড়ায় চড়া যোদ্ধার, বর্শা নিক্ষেপকারী বরাহ শিকারী, বীণা কোলে দাড়িওলা চারণ কবি। খাড়া পর্বতের গায়ে কেটে বানানো গুহার মধ্যে রাখা হতো বিপুল শস্যভান্ডার। সিথিয়ানরা এই শস্য ব্যবহার করে গ্রীকদের সঙ্গে বাণিজ্য করত। সেরসন বা এমনি সব গ্রীক উপনিবেশ থেকে সেই শস্য চলে যেত আরো দূরে—খোদ গ্রীসে। সমুদ্র-পথে সিথিয়ার সঙ্গে গ্রীস সংযুক্ত ছিল।

এই পথ ধরে গ্রীকরা যেত উত্তরে, সিথিয়ানদের কাছে। পরে রুশীরা আরো ঘন ঘন গ্রীকদের রাজধানী পরিদর্শন করতে শুরু করেছিল.........

অ্যান্টরা এসেছিল সিথিয়ানদের বহু শত বছর পরে। তারা ছিল সাহসী, অতি দক্ষতার সঙ্গে চালনা করত তাদের অস্ত্র-রণকুঠার, ও তীরধনুক। যুদ্ধ করতে যেত বিশৃঙ্খল জটলা পাকিয়ে নয়, শ'য়ে-শ'য়ে বা হাজারে-হাজারে বিভক্ত হয়ে। তাদের ছিল দক্ষ নেতা, আর তরুণরা বড়োদের কাছে শুনত মহান জোব্রোগাস্টার কাহিনী—যিনি শুধু স্থলে নয়, জলেও যুদ্ধ করতে পারতেন। বাইজান্টাইন সম্রাট তাঁকে সম্মানসূচক 'ফৌজদার' উপাধি দিয়েছিলেন এবং তাঁকে করেছিলেন পন্টুস বা কৃষ্ণসাগরের সমস্ত গ্রীক রাজাদের কর্তা। অ্যান্টি বা স্লাভ বণিকরা বাণিজ্য করত দক্ষিণে বাইজানটাইন বা পূবে খাজার উভয়ের সঙ্গে। দূর আরব থেকে প্রথম যাত্রীদল তাদের কাছে পৌঁছেছিল খাজারদের দেশের মধ্যে দিয়ে। আরব পর্যটকরা তাদের দিনগুলিতে উল্লেখ করেছিল যে নীপার নদীর তীরে ছিল একটি দেশ ও তার বৃহৎ নগর—কিয়েভ। সেটি ছাড়িয়ে নোভ-গোরদ দেশ স্লাভিয়া এবং পশ্চিমে আরও দূরের দিকে ভোল্হাইনিয়াদের দেশ।

কালক্রমে রুশ রাজন্যবর্গ ঐক্যবদ্ধ হলো কিয়েভের অখণ্ড বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে। কিয়েভ হয়ে উঠল প্রধান রুশ নগর—"রুশ নগরসমূহের জননী"।

স্লাভরা প্রথম যখন দক্ষিণমুখী পথ ধরল, তখন তারা সন্ধান পেল বিশ্বের প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির। গথ্রা রোমকে ধ্বংসের মুখে এনে ফেলেছিল। কিন্তু স্লাভদের বেলায় ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? তারা কি বাইজান্টিয়ামের শত্রু হয়েছিল? নাকি, রক্ষক? তারা কি প্রাচীন সংস্কৃতির ধ্বংসসাধক হয়েছিল? নাকি, উত্তরাধিকারী?

ওজনের কাঁটা দীর্ঘকাল ধরে এদিক-ওদিক দুলেছিল—শত্রুতা থেকে বন্ধুত্বে, বন্ধুত্ব থেকে আবার শত্রুতায়। স্লাভরা তাদের কাছে ছিল বিপদস্বরূপ, বাইজান্টাইন গ্রীকরা সেটা জানত। বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে রুশ প্রিন্সরা বহুবার পূর্বাঞ্চলীয় রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তের কাছে চলে এসেছিল। দশম শতাব্দীতে ইগর-এর নৌবহরে ছিল দশহাজার পোত, কিয়েভের প্রিন্স সভিয়াতোস্লাভের ছিল ষাটহাজার যোদ্ধা।

বাইজান্টাইন ঐতিহাসিক, খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক লিও তাদের সম্পর্কে লিখেছেন, "শোনা যায়, তারা কখনো প্রাণ থাকতে শত্রুর কাছে ধরা দেয় না ; এই জাতি পাগলামির পর্যায়ে পড়ে এমন অসমসাহসিক, বীর ও শক্তিশালী।" তিনি আরও লিখেছেন, নিহতদের মধ্যে প্রায়ই থাকত নারী, যারা বীরাঙ্গনার মতো যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল।

লিও লিখেছেন, বাইজান্টাইন সম্রাট জন জিমিসেস একবার প্রিন্স স্ভিয়াতোস্লাভকে এই বলে শাসিয়েছিলেন যে প্রিন্সকে আক্রমণ করার জন্য তিনি পুরো একটি রোমান সৈন্যবাহিনী পাঠাতে চলেছেন। স্ভিয়াতোস্লাভ জবাব দিলেন, "আমাদের দেশে আসার জন্য এই দীর্ঘ পথে যাত্রার কষ্ট স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই। শীঘ্রই আমরা বাইজান্টিন তোরণের সামনে তাঁবু খাটাতে যাচ্ছি, জোরালো প্রাচীর দিয়ে নগরকে আমরা ঘিরে রাখব। তখন রোমান সম্রাট যদি ইচ্ছা করেন তাহলে লড়াইয়ে নামতে পারেন। আমরা সাহসের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি হব।"

একটি যুদ্ধে রুশ বাহিনী শত্রু পরিবেষ্টিত হয়েছেন। প্রিন্স স্ভিয়াতোস্লাভকে তখন অনেকে পিছু হটার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, "রুশ শক্তি প্রতি-বেশী জাতিগুলিকে জয় করেছে বিনা আয়াসে, সমগ্র দেশকে বশ করেছে বিনা রক্তপাতে—তাই রুশ শক্তি গৌরবমণ্ডিত হয়ে থেকেছে। এখন আমরা যদি রোমানদের কাছে লজ্জাকর আত্মসমর্পণ করি তাহলে এই গৌরব মুছে যাবে। অতএব, আমাদের পূর্বপুরুষদের বীরত্ব

নিয়ে, এবং এই কথা মনে রেখে যে রুশ শক্তি এখনো পর্যন্ত একবারও পরাজিত হয়নি, নিজেদের জীবনের জন্য বীরের মতো লড়াই করো। স্বদেশে পশ্চাদপসরণ করে প্রাণ বাঁচাবো—এমন রীতি আমাদের নয়। হয় আমরা বিজয়ীর মতো বেঁচে থাকি, নয়তো শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গৌরবের সঙ্গে প্রাণ দিই।”

একথা লিখেছেন বাইজানটিন ঐতিহাসিক। স্‌ভিয়াতোস্লাভকে তিনি এঁকেছেন মিষ্টভাষী বক্তা হিসেবে, প্লুটার্কের নায়কের আদলে।

একজন রুশ কাহিনীকার একই কাহিনী শোনাচ্ছেন আরো অনেক সরলভাবে। স্‌ভিয়াতোস্লাভ তাঁর যোদ্ধাদের বলতেন বালবাচ্চা—তাদের উদ্দেশ্য করে বলতেন, “আমাদের রুশভূমিকে কালিমালিপ্ত কোরো না। যদি মরতেই হয় তাহলে লড়াই করতে করতে মরো। তাতে লজ্জা নেই। আমরা পালিয়ে যাব না, শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকব। আমি হব তোমাদের নেতা।”

একই ঘটনার দুই বিভিন্ন বিবরণ, কিন্তু দুই বিবরণ থেকে একই চিত্র পাওয়া যাচ্ছে।

স্‌ভিয়াতোস্লাভের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করার জন্য বাইজান্‌টিয়ামের সম্রাট খুবই ব্যগ্র ছিলেন। তিনি জানতেন, সাম্রাজ্যের পক্ষে রুশরা আশঙ্কাস্বরূপ। রুশ শক্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বাইজান্‌টিনদের আগেই হয়ে গিয়েছে। সকল বিদেশী বণিক সম্রাটের তহবিলে উঁচু হারে শুল্ক-কর দিত, কিন্তু রুশীদের সামগ্রী নিয়ে আসতে দেওয়া হতো বিনা শুল্কে।

জিমিসেস যখন শুনলেন স্‌ভিয়াতোস্লাভ বিরাট এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাইজান্‌-টিয়ামে আসছেন, তিনি দানিয়ুবের তীরে গিয়ে স্‌ভিয়াতোস্লাভের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। সোনার পোশাক পরিহিত সম্রাটের পিছনে ছিল বর্ম পরিহিত তার অনুগামী। সম্রাট এসেছেন বহুমূল্য সাজসজ্জায় সজ্জিত ঘোড়ায় চেপে। আর সাক্ষাৎকারের স্থানে স্‌ভিয়াতোস্লাভ এসে হাজির হলেন ছোট একটি ডিঙ্গিতে চেপে। পৌঁছবার পরেও স্‌ভিয়াতোস্লাভ নদীর পারে নেমে ওপরে উঠে আসার কথা ভাবলেন না, ডিঙ্গির পাটা-তনের ওপরে বসে রইলেন। অন্যরা যাক, সম্রাটের পদচুম্বন করুক!

বাইজানটিন অমাত্যরা প্রচুর কৌতূহল নিয়ে রুশ প্রিন্সের দিকে তাকালেন। তিনি পরে আছেন সোনালী বর্ম নয়, সাদা কাপড়—তাঁর দাঁড়ী ও যোদ্ধাদের পরনের কাপড়ের মতোই সাধারণ। একটি কানে ঝকমক করছে সোনালী কুণ্ডল, তার মধ্যে বসানো রয়েছে মুক্তো দিয়ে ঘেরা একটি চুনি। তাঁর কাঁধ চওড়া, চোখ নীল, গোঁফ ঝুলে পড়া ও প্রকাণ্ড, আর কামানো মাথায় একগোছা লম্বা চুল। তাঁর চেহারা কঠোর ও বিষণ্ণ। তাঁরা যখন তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন তখন তাঁদের মনে পড়ে গেল—স্‌ভিয়াতোস্লাভের নির্ভীকতা, সাহসিকতা ও শক্তি সম্পর্কে তাঁরা কত-কী শুনেছেন। মানুষটি তিনি উদ্দীপনা, সাহস ও আবেগে ভরা—তাই নিয়েই কিয়েভ রাজ্যের সীমানা অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছেন। তাঁকে দেখা গেছে ভল্‌গা খাজার দুর্গের প্রাকারে, ককেসাসের পাদদেশে, ভিয়াৎস্ক-এর অরণ্যে, জমাট-বাঁধা কামার তীরে, বল্‌কানের পর্বতের ঢালুতে। যখন এগিয়ে চলেন তখন তাঁর ক্লান্তি নেই, ঘোড়ার জিনকে বালিশ করে খোলা আকাশের নিচে ঘুমোন, যেখানে তাঁর দেখা পাওয়ার আশা সবচেয়ে কম সেখানেই আচমকা আবির্ভূত হন। কিন্তু আচমকা আক্রমণ কখনো করেন না। প্রকৃত যোদ্ধার মতো আগে থেকেই শত্রুকে সাবধান করে দেন : ‘আপনার সঙ্গে আমি লড়াই করতে চাই।’ আর সবসময়ে তিনিই হন বিজয়ী।

বাইজান্‌টিন ঐতিহাসিক বলছেন, “ডিঙ্গির পাটাতনের ওপরে বসে থেকেই তিনি কিছুক্ষণ সম্রাটের সঙ্গে শান্তি নিয়ে আলোচনা করলেন, তারপরে স্বদেশের দিকে রওনা দিলেন।’ তাঁর দাঁড়ীরা তালে তালে দাঁড় ফেলে নদীর জল তোলপাড় করে তুলল। সম্রাট তাঁর পায়ের সোনালী কাঁটা দিয়ে তাঁর ঘোড়ার গায়ে টোকা দিলেন।......

এই দুই পৃথক জগৎ প্রায়ই মিলিত হতো—কখনো শান্তির মধ্যে, কখনো যুদ্ধের মধ্যে। একাধিকবার রুশ ও বাইজান্টিনরা অঙ্গীকার করেছিল, তারা শান্তি বজায় রাখবে "যতোদিন সূর্য কিরণ দেয় ও জগৎ টিকে থাকে ততোদিন। আর আমাদের বন্ধুত্বকে যে ভঙ্গ করবে তাকে কেউ সাহায্য করবে না—না ঈশ্বর, না পেরুন। হ্যাঁ, তখন তারা তাদের বর্ম দিয়ে নিজেদের আবৃত করতে অসমর্থ হবে। হ্যাঁ, তখন নিজেদের তলোয়ারেই তারা নিজেরা খণ্ডবিখণ্ড হবে। হ্যাঁ, তখন তারা হয়ে উঠবে দাস—এই শতাব্দীতে এবং ভবিষ্যতের শতাব্দীতেও।" রুশরা তাদের বর্ম খুলে ফেলল এবং তাদের ঈশ্বর পেরুনের পায়ের কাছে মাটিতে সেই বর্ম রেখে দিল। বাইজানটিনরা চুম্বন করল তাদের ক্রুশ।

কিন্তু বাইজান্টিনদের কাছে অঙ্গীকারের কোনো দাম নেই। অঙ্গীকার ভাঙতেও তারা ভয় পায় না। এবারেও তাই হলো। স্ভিয়াতোস্লাভ যখন কিয়েভ-এ ফিরে গেলেন তখন দেখলেন, স্তেপের যাযাবর পেচেনেগরা নীপার নদীর তীরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। স্ভিয়াতোস্লাভের সঙ্গে যোদ্ধা ছিল ছোট একদল মাত্র। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে দেশে পাঠিয়েছিলেন অন্য এক পথ দিয়ে।

স্তেপের ঘোড়সওয়াররা বীভৎস চিৎকার করে আর হুংকার তুলে রুশদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রুশরা বীরের মতো লড়াই করল। কিন্তু সংখ্যায় তারা ছিল পর্যুদস্ত হবার মতো কম।

পেচেনেগদের কে খবর দিয়েছিল যে স্ভিয়াতোস্লাভ এই পথেই দেশে ফিরছেন? নিশ্চয়ই বাইজান্টিনরা। পেচেনেগ রুশদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেবার কোনো সুযোগ পেলে বাইজান্টিনরা দারুণ খুশি হতো। সম্রাট জিমিসেস কখনো রুশদের বলতেন না যে "আমি তোমাদের সঙ্গে লড়াই করতে চলেছি।" ধূর্তভাবে তিনি রুশ প্রিন্সকে খুন করাতেন অন্য লোকের সাহায্যে। স্ভিয়াতোস্লাভের মাথার জন্য সোনার মাপে কী দাম ধার্য হয়েছিল তা আমরা জানি ন। কিন্তু এটাই ছিল বাইজানটিন্দের রীতিঃ প্রকাশ্য লড়াইয়ে খুন করা নয়, তার বদলে ভাড়াটে গুণ্ডা পাঠানো।

তারপরেও জগৎ টিকে ছিল। তারপরেও সূর্য কিরণ দিচ্ছিল।

তবুও একথা ঠিক, বাইজান্টিয়াম ও রাশিয়া পরস্পরকে বাদ দিয়ে চলতে পারত না। বাইজান্টিয়ামকে যখন তার শত্রুরা শক্তভাবে চেপে ধরত তখন বাইজানটিয়ামের সম্রাটরা রুশ প্রিন্সদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠাত। আর প্রিন্সরা তাদের যোদ্ধাদের পাঠিয়ে দিত। পেচেনেগদের হাত থেকে বাইজান্টিয়ামকে রক্ষা করত রুশরা, যে পেচেনেগদের সম্পর্কে বাইজানটিনদের ছিল মারাত্মক আতঙ্ক। বাইজান্টিয়ামের প্রয়োজন ছিল রুশী জন্তুর পশম, রুশী শস্য ও মধু, গির্জার মোমবাতির জন্য রুশী মোম। রুশ প্রিন্সদের এবং বোয়ার বা অভিজাতদের প্রয়োজন হতো বাইজানটিন বস্ত্র, সোনা, সুরা ও ফল।

২. ক্ষুদ্র একটি নৌকোয় ভূ-প্রদক্ষিণ

প্রতি বছর শীতকালে রুশীরা পাহাড়ের ধারে গিয়ে ওক্‌গাছ কাটত আর সেইসব গাছ খোঁদল করে নৌকা বানাত—এক-একটি গাছ থেকে এক-একটি নৌকো। যখন বসন্ত-কাল আসত তারা সেই নৌকোগুলি ভাসিয়ে দিত কাছাকাছি খাড়িতে। বসন্তকালে বন্যার ঢল নামত আর তারই সুযোগ নিয়ে তারা নীপার দিয়ে নৌকো ভাসিয়ে নেমে আসত কিয়েভে। সেখানে নৌকাগুলি টেনে তোলা হতো আর তাতে দাঁড় লাগাবার আংটা বসানো হতো। কিয়েভে তাদের কাছে আসত শস্য মোম ও পশুলোম বোঝাই গাড়ি। নৌকোগুলি

বোঝাই করা হতো আর বোঝাই হয়ে গেলে দাঁড় টেনে নিয়ে যাওয়া হতো নীপারের মাঝখানে, তারপর স্রোতের দিকে ভেসে চলত। তারা যাত্রা করত একটি বহর সাজিয়ে। একা-একা যাত্রা করাটা বিপজ্জনক ছিল।

এমন জায়গায় যখন এসে পৌঁছত যেখানে নদীর স্রোত তীর, ধারালো পাথরকে ঘিরে জল ফেনায়িত হয়ে উঠছে, সেখানে বণিকরা নৌকোগুলি টেনে তুলে আনত পাড়ের ওপরে, মাটির ওপর দিয়ে টেনে টেনে কিংবা কাঁধে তুলে বয়ে নিয়ে যেত এমন এক জায়গা পর্যন্ত যেখানে নৌকোগুলি আবার নিরাপদে জলে ভাসানো চলে। বড়ো ভয়ংকর এসব জায়গা। খরস্রোতের প্রথম জায়গাটির ভীতিজনক নাম ছিল "নে স্পি!" (ঘুমিও না!) নীপারের দেবতা স্লোভুতিচ-এর তারা প্রার্থনা জানাত, তিনি যেন তাদের শিলাময় পার্বত্য এলাকাটি পার করে দেন, তাদের ক্ষুদ্র নৌকাগুলির ওপরে নজর রাখেন—যেমন নজর রাখেন ঢেউয়ের ওপরে গাঙচিলের দিকে, জলের ওপরে হাঁসের দিকে।

আর এইসব জায়গাতেই কখনো কখনো বুনো পেচেনেগরা তীক্ষ্ন চিৎকার করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ত, বণিকদের সর্বস্ব লুট করে নিত ও খুন করে যেত। এই লুঠেরাদের হাতে যারা সর্বস্ব খুইয়েছে ও প্রাণ হারিয়েছে তাদের হাড় বিপুল পরিমাণে এখানকার রোদে-জলে ফ্যাকাশে হয়ে উঠছে।

খরস্রোতের জায়গা পার হয়ে এসে বণিকরা আবার যখন নীপারের জলে নৌকো ভাসাতে পারত তখন তারা কী খুশিই না হতো! নীপারের মোহনায় ছোট একটি দ্বীপের ওপরে ছিল বিরাট এক ওক্‌গাছ। বণিকরা মোরগ ও মুরগির ছানা বেঁধানো তীর দিয়ে সেই ওক্‌গাছ বেষ্টন করত। মোরগ ও মুরগির ছানা ছিল ওক্‌গাছের কাছে বলি হিসেবে তাদের নিবেদন। ওক্‌গাছের কাছে তারা প্রার্থনা জানাত, কেননা ওক্‌গাছকে খোঁদল করেই তাদের ক্ষুদ্র নৌকো তৈরি এবং এই ক্ষুদ্র নৌকোয় চেপেই তারা ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ভেসে এসেছে। যাত্রা করার আগে বণিকরা তাদের নৌকোয় মাস্তুল বসিয়ে নিত আর মাস্তুলে পাল ছড়িয়ে দিত।

তাদের সামনে গর্জন করত সমুদ্র। সাদা টুপি পরা বিশাল বিশাল ভেঙে-পড়া ঢেউ বায়ু-তাড়িত হয়ে ছুটে আসত তীরের দিকে। স্ত্রিবগের পৌত্র বায়ুর কাছে প্রার্থনা জানাত বণিকরা—তিনি যেন সমুদ্রের নীল জলের ওপর দিয়ে তাদের নিরাপদে পার করে দেন। তারা যতোটা সম্ভব তীরের কাছ ঘেঁষে থাকত। আর পেছন থেকে জমির ওপর দিয়ে তাদের অনুসরণ করে আসত পেচেনেগরা। তারাও নিজেদের দেবতাদের কাছে প্রার্থনা জানাত, তাঁরা যেন এমন এক ঝড় পাঠিয়ে দেন যা রুশ নৌকোগুলিকে তীরের দিকে তাড়িয়ে আনবে।

একটা সময় ছিল যখন রুশীদের পূর্বপুরুষরা কখনো নীপার নদী দিয়ে নিচে নামেনি এবং এমনকি জানত না যে পৃথিবীতে নীপার ছাড়াও অন্য নদী আছে। সেইসব দিনের স্মৃতি রুশভাষার মধ্যে থেকে গিয়েছে। যেমন, এই যে শব্দগুলি—'দানিউব', 'দন', 'দ্‌নীপার', 'দোনেৎস', 'দভিনা'—এগুলির মধ্যে পারস্পরিক মিল নিছক ঘটনাচক্র নয়। শব্দগুলি এসেছে সেই সময় থেকে যখন লোকের কাছে সমস্ত নদীর একটিই নাম ছিল—"নদী"। এমনকি আজকের দিনেও ককেসাসের ওসেশিয়ানদের ভাষায় 'দন' শব্দটির অর্থ নদী। এটা এমন এক সময়ের স্মৃতি যখন তাদের পূর্বপুরুষরা দন থেকে ককেসাসে এসেছিল।

এমনিভাবে মানুষজনের জীবন কাটত নদী-বরাবর সংকীর্ণ ক্ষুদ্র এক জগতে। কিন্তু সেই নদীই তাদের শিক্ষা দিত ঘুরে বেড়াতে। নদী তাদের বয়ে নিয়ে যেত দূর থেকে

আরো দূরে। তাদের পরিচয় হয়ে যেত অন্য সব জাতির সঙ্গে, অন্য সব উপজাতির সঙ্গে। তারপরে যখন নদীর মোহনার কাছে এসে যেত, তারা আবিষ্কার করত সমুদ্র। নদীর উজানে যখন যেত তারা দেখতে পেত আরো সব নদী অরণ্য থেকে বেরিয়ে আসছে।

ভ্রাম্যমাণ ডিঙ্গিগুলি হয়ে উঠেছিল বড়ো-হয়ে-ওঠা মানুষদের লালনাগার। ওক্‌গাছের মতো নীপারেও শাখা ছড়িয়েছিল—পশ্চিমে, উত্তরে ও পুবে।

গোড়ার দিকের কাহিনীকাররা বলেছেন, নীপারের ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে কেমনভাবে চলে যাওয়া যায় সকল দেশে ও সকল জাতির কাছে। নদীর উৎসের দিকে গেলে পেঁছিনো যায় ঘন একটি অরণ্যে। সেখানে দেখা যায় নীপারের মাথার জলরাশি—দ্‌ভিনা ও ভল্‌গা। সেখান থেকে অনেক হ্রদ ও নদীর বিস্তার পার হয়ে ভেসে যাওয়া যায় বাল্‌টিক সাগরে। সেখান থেকে রাইন নদীর উজান বেয়ে আল্‌প্‌স পেরিয়ে রোমে। সেখান থেকে ভূমধ্যসাগর হয়ে বাইজান্‌টিয়ামে। বাইজান্‌টিয়াম থেকে কৃষ্ণসাগর ও নীপার হয়ে ফিরে আসা যায় কিয়েভে।

এমনিভাবে প্রাচীন কাহিনীকাররা একটি পথ দেগে দিয়েছিলেন। এই পথ ধরে তারা তাদের বিশ্বের চারদিকে ভেসে বেড়াত। আর এতই বিস্তৃত ছিল সেই বিশ্ব যে সেটি আর একটি মাত্র নদীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সেটি হয়ে উঠেছিল বিশাল এক জলপথ—জালের মতো ছড়ানো নদী হ্রদ ও সমুদ্র দিয়ে। এই পথ ধরে বাল্‌টিক থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত যাতায়াত করত সেইসব ক্ষুদ্র ডিঙ্গি, যেগুলো একটিমাত্র কাঠের গুঁড়ি থেকে খোঁদল করে তৈরি, যেগুলোর গলুই ড্রাগনের মাথার মতো বাঁকানো। এইসব ডিঙ্গিতে বয়ে আনা হত প্রিন্সদের, যারা রাজকর আদায় করত। বয়ে আনা হতো বণিকদের, যাদের কাছে প্রিন্সরা বিক্রি করত পশুলোম ও মধু আর বিনিময়ে নিত সমুদ্রের ওপার থেকে আনা সামগ্রী।

ক্ষুদ্র ডিঙ্গিগুলো বহুদিন ধরে কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম তীরে ভেসে বেড়াল। অবশেষে এসে পেঁছিল বাইজান্‌টিয়ামে, যে বাইজান্‌টিয়ামে রয়েছে সেণ্ট সোফিয়ার বিশাল অর্ধ-বৃত্তাকার গম্বুজ।

আগন্তুকরা তীরে নামল, কিন্তু তাদের নগরে প্রবেশ করতে দেওয়া হলো না। রাজার কর্মচারীরা আগন্তুকদের নাম লিখে নিল এবং তল্লাশী করে দেখে নিল আগন্তুকদের কাছে কোনো অস্ত্র আছে কিনা। দেখা শেষ হলে প্রকান্ড তোরণটি খুলে গেল আর আগন্তুকদের ঢুকতে দেওয়া হলো নগরের মধ্যে—তবে সবাইকে একসঙ্গে নয়, পঞ্চাশজনের দলে ভাগ করে করে। এতে রুশদের অপমান করা হয়নি, কেননা এটাই রীতি। জার্মানরা যখন নোভগোরদে এসেছিল তখন জার্মানদের সঙ্গে তারাও একই রকম আচরণ করেছিল।

নগরকর্তাদের বিরুদ্ধে রুশদের কোনো অভিযোগ ছিল না। কেননা, কথাই ছিল যে রুশরা পেট পুরে রুটি সুরা ও মাংস খেতে পারবে, গ্রীক স্নানাগারে ঢুকে যতোক্ষণ খুশি গা ধুতে ও বাষ্প-স্নান করতে পারবে।

ফিরে আসার সময়ে রুশদের দেওয়া হলো নানা সামগ্রী—নোঙর, পাল, নৌকোর কাছি। সবই এসেছে রাজার মালখানা থেকে। তখন রুশ বণিকরা বিদায় জানিয়ে স্বদেশের দিকে রওনা হলো। তাদের সঙ্গে ছিল মূল্যবান পণ্য—সোনা ও কিংখাপ, দুর্লভ ফল ও সুরা।

স্বদেশে ফেরার পরেও বহুকাল ধরে তারা মনে করে রাখবে বিলাসময় নগর বাইজান্‌টিয়ামের কথা। তাদের গল্প করার বিষয় হবে বাইজান্‌টিয়ামের পুরোহিতদের বহুমূল্য সোনার কিংখাপ, আর রাজপ্রাসাদের বিস্ময়। যে রাজপ্রাসাদে সম্রাটের সিংহাসনের

দু-দিকে রয়েছে দুটি সোনার সিংহ, যারা যন্ত্রের মতো তাদের চোয়াল খুলতে ও বন্ধ করতে পারে, আর বন্‌বন্‌ করে তাদের লেজ ঘোরাতে পারে।

৩. রুশদের জ্ঞানালোক লাভের সূচনা

বাইজান্‌টিয়ামের প্রাসাদ ও গির্জার খ্যাতি বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু কিয়েভেও গর্ব করার মতো কিছু ছিল। কিয়েভের প্রিন্সদের প্রাসাদগুলি দক্ষ কারিগরদের বুরুশে অলংকৃত হয়েছিল। দরজার কাঠামো তৈরি হয়েছিল মার্বেল পাথরে। চুল্লির সম্মুখে ছিল অতি চমৎকার এনামেলের টালি। এই টালিগুলো তৈরি করতে অনেক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার দরকার। প্রথমে এনামেল করা গ্লাস একসঙ্গে লাগানো। তারপরে সীসের সাহায্যে তার ওপরে রুপোলী রঙ ফুটিয়ে তোলা। তারপরে তামার সাহায্যে তার ওপরে সবুজ আভা ফুটিয়ে তোলা। তারপরে টালিগুলোকে উত্তপ্ত করা, এমন এক তাপমাত্রায় যাতে লোহা পর্যন্ত গলে যায়। উত্তপ্ত করার সময়ে খুবই সতর্ক হতে হয় যাতে উত্তাপ মাত্রা না ছাড়ায়, কেননা সেক্ষেত্রে এনামেলের রঙ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তারপরে উত্তাপ কমাতে হয়, খুবই ধীরে ধীরে ও সতর্কভাবে। টালিগুলো তাড়াতাড়ি শীতল করতে গেলে এনামেলের গোটা উপরিভাগে ফাটল দেখা দেয়। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য দরকার হয় বিশেষ ধরনের চুল্লি ও কাদামাটির এমন মুণ্ডি যা উচ্চতম মাত্রার উত্তাপ সহ্য করতে পারে। ভস্ত্রার সাহায্যে আগুনকে উস্‌কে তুলে প্রচণ্ড তাপসম্পন্ন করতে হয়। ভস্ত্রাটি হওয়া চাই এমন যাতে আগুনে নষ্ট না হয়।

হাজার বছর পরে মানুষ মাটি খনন করে বার করবে কিয়েভের এমনি এক টালি তৈরির কারখানা। মাটির পাত্র ও মুচি তারা পরীক্ষা করে দেখবে আর অবাক হয়ে বলাবলি করবে কত প্রাচীন এই শিল্প-কারিগরি, আর এই কারিগররা কত ভালোভাবেই না ধাতু ও কাঁচের প্রকৃতি বুঝতে পেরেছিল।

প্রকৃতির পুস্তক রুশদের চোখের সামনে ইতিমধ্যেই খোলা পড়ে ছিল, যদিও তখনো পর্যন্ত তারা কলমে লেখা পুস্তক পড়তে পারত না। কিন্তু আমাদের সময়ের একহাজার বছর আগে এমনি পুস্তক তাদের ছিল। আর স্লাভরা তো এমনকি তারও আগে লিখতে পারত। দশম শতাব্দীতে এমন রুশ ছিল যারা লিখিত উইল রেখে যেত ছেলেমেয়েদের জন্য, আর প্রিন্স লিখিত বার্তা সহ বিদেশে দূত পাঠাত। পড়া ও লেখা রুশদের কাছে এসেছে পশ্চিম ও দক্ষিণ স্লাভদের কাছ থেকে—মোরাভিয়া, চেকিয়া ও বুলগেরিয়া থেকে।

কী ধরনের অক্ষর ব্যবহার করত রুশরা? এখন আমাদের ধারণা, প্রাচীন কালে স্লাভরা লিখত খোঁচা দিয়ে দিয়ে, ও দাঁড়ি টেনে টেনে—কাঠের পাটাতনে বা পাথরের টালিতে ছোট ছোট অক্ষর বা আদল ফুটিয়ে তুলে। পরবর্তী কালে তারা রুশভাষা লিখতে শুরু করেছিল গ্রীক অক্ষরের সাহায্যে—সম্ভবত চামড়ার কাগজের ওপরে। কিন্তু একটি ব্যাপার নিয়ে তাদের ভাবনা ছিলই সেটা এই যে রুশভাষার কোনো শব্দ প্রকাশ করতে হলে যে-সব অক্ষর দরকার তা গ্রীক বর্ণমালায় ছিল না। প্রিন্সরা যখন অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করার সময়ে চুক্তির পাঠ রচনা করত, বণিকরা যখন ঋণপত্র স্বাক্ষর করত তখন তারা বুঝতেই পারত না যে কতকগুলো শব্দ—যেমন 'ৎস', 'শ', 'চ'—প্রকাশ করার জন্য কী-ভাবে লেখা হবে। রুশ ভাষার জন্য প্রয়োজন ছিল রুশ বর্ণমালা।

নবম শতাব্দীতে গ্রীক শহর থেসালোনিকায় বাস করতেন এক জ্ঞানী সাধু, নাম কিরিল। তিনি রুশভাষা জানতেন। ঘটনাক্রমে একবার তিনি কিছু সময় কাটিয়েছিলেন

কৃষ্ণসাগরের তীরে। সেখানে একজন রুশের গৃহে তিনি দেখতে পেলেন রুশ বর্ণে লেখা খ্রীস্টের বাণী ও স্তোত্র। কিরিলের জীবনী থেকে এই ঘটনার কথা আমরা জানি, কিন্তু জানি না সেই বর্ণগুলো কি ধরনের ছিল। সেই বর্ণগুলো বাদ দিয়ে সে-জায়গায় কিরিল এক নতুন বর্ণমালা আবিষ্কার করলেন।

কিরিলের বর্ণমালা কিয়েভে উপস্থিত হলো দশম শতাব্দীতে, সেই সঙ্গে উপস্থিত হলো নতুন এক ধর্মবিশ্বাস—খ্রীস্টধর্ম। গোড়ার দিকে নতুন এই ধর্মবিশ্বাস পুরনো ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে পাশাপাশি টিকে ছিল। খ্রীস্টানরা ভজনা করতে যেত গির্জায়, আর যারা তখনো পুরনো ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল তারা তাদের দেবতাদের সামনে পুরনো ধরনে মাথা নোয়াত। গবাদি পশুর দেবতা ভোলোস-এর কাছে বণিকরা প্রার্থনা জানাত—তিনি যেন তাদের আরও স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দেন। ভোলোস ছিলেন গবাদি পশু ও সোনা দুয়েরই দেবতা, কেননা একসময়ে গবাদি পশু মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হতো—ধাতুর মুদ্রা প্রচলিত হবার আগে। বজ্রের দেবতা ছিলেন পেরুন, যোদ্ধারা তাঁর কাছে জয়লাভের জন্য প্রার্থনা জানাত। ভোলোস দাঁড়িয়ে ছিলেন বাজারের এলাকায়, আর কাঠের তৈরি পেরুন তাঁর রুপোর তৈরি মাথা ও সোনার তৈরি গোঁফ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন প্রিন্সের পুরনো বাড়ির প্রাঙ্গণে একটি পাহাড়ের চুড়োয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত দুটি দেবতাকেই নদীর কাছে নিয়ে এসে বিসর্জন দেওয়া হলো। এমনিভাবে নতুন ধর্মবিশ্বাস পুরনো ধর্মবিশ্বাসকে জয় করল।

কিয়েভের প্রিন্স ভ্লাদিমির স্ভিয়াতোস্লাভিচ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করলেন এবং বাইজান্টিন রাজ-পরিবারের রাজকুমারী আনাকে বিয়ে করলেন। নতুন ধর্মের প্রয়োজন ছিল রুশ রাষ্ট্রের, কেননা এর ফলে কিয়েভ প্রিন্সদের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল এবং কিয়েভের চারদিকে সকল রুশ উপজাতি আরো দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। প্স্কোভ, নভ্গোরোদ ও অন্যান্য রুশ শহরের লোকেরা বলতে লাগল, "কিয়েভ যাওয়া তো এখন মুখের কথায়।" চারদিকের উপজাতিরা অনুভব করতে লাগল, তারা একজাতি, তারা অধার্মিক নয়, পেচেনেগদের মতো তারা অপবিত্র নয়। বস্তুতপক্ষে, জমি যারা চাষ করত সেই রুশ চাষীদের বহুকাল ধরে বলা হতো 'ক্রেস্তিয়ানি-খ্রিস্তিয়ানিন' বা 'কৃষক-খ্রীস্টান'। এই ছিল সংকীর্ণ ক্ষুদ্র উপজাতীয় জগৎ থেকে জাতির বৃহৎ জগতের দিকে পথ। সেখান থেকে এই পথ চলে গিয়েছিল অন্যান্য জাতির দিকে, সকল মনুষ্যজাতির বৃহৎ জগতের দিকে।

রুশ ও বাইজান্টিনরা এখন একই ঈশ্বরের নামে শপথ নিত, একই ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। তারা আরো সহজে একত্রিত হতে পারছিল ও পরস্পরকে বুঝতে পারছিল। যতো দিন যাচ্ছিল এই নতুন ধর্মবিশ্বাস রুশদের কাছে উন্মুক্ত করে দিচ্ছিল সমগ্র খ্রীস্টীয় ইউরোপ। কিয়েভের প্রিন্সরা বিদেশী রাজা ও প্রিন্সদের সঙ্গে তাদের মেয়েদের বিয়ে দিচ্ছিল। ভ্লাদিমিরের এক নাতনী হলো ফরাসী রানী। অপর এক নাতনী বিয়ে করল নরওয়ের 'সাহসী পুরুষ' রাজা হ্যারল্ড্কে।

কিয়েভে দক্ষ কারিগররা নির্মাণ করল পাথরের গির্জা। তার উপকরণ নিয়ে আসা হলো বহু স্থান থেকে—ক্রিমিয়া থেকে স্ফটিক পাথর, বাইজান্টিয়াম থেকে মার্বেল পাথর, কারপাথিয়ান্স থেকে স্লেট পাথর। দিনে দিনে গির্জার চওড়া স্কন্ধের ওপরে উঠে দাঁড়াল মগেরম গোল গ্রীবা, গ্রীবাকে ঘিরে জানালার কণ্ঠহার। গ্রীবার ওপরে ভর দিয়ে দাঁড়াল মস্তক—একটি গম্বুজ। তার যোগ রইল পাথরের শরীরটির সঙ্গে। অনেক উঁচুতে, ভারার নরম দণ্ডের উপরে দাঁড়িয়ে কাজ করল পাথর কাটার ও প্লাস্টার লাগাবার

কারিগররা। নিচের দিকে যখন তারা তাকাত আর ভাবত তারা যদি ভেঙে পড়ে তাহলে তাদের কী হবে—তখন তারা শিউরে উঠত।

অবশেষে শরীরের ওপরে মস্তকটি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হলো। তখন সত্যিই মনে হতে লাগল ওটা যেন একজন ব্যক্তির মাথার ওপরে গোল মুকুট। নির্মাণকারীরা ওটাকে যে বলত "কপাল" তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

গির্জার মেঝের ওপরে বসানো হলো নানা রঙের মার্বেল-টালি। দেয়ালের ও খিলানের টালিতে ভিতরের দিকে বসানো ছিল সাধুদের মূর্তি। কাঠের নয়, ইটের তৈরি এই গির্জার দিকে তাকিয়ে কিয়েভের লোকেরা নির্মাণকারীদের কারিগরী দক্ষতায় অবাক হতো। এবারে কিয়েভও পেয়ে গেল তার পাথরের গির্জা।

যে-সব গ্রীক দেখতে আসত তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত কিয়েভের নতুন গির্জার দিকে। বাইজান্টিয়ামে তাদের আছে সেন্ট সোফিয়া, তার মতো এটি একেবারেই নয়। সেখানে গির্জার স্কন্ধের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র একটি বৃহৎ গম্বুজ। কিন্তু এখানে, কিয়েভে, প্রধান গম্বুজকে ঘিরে রয়েছে আরো চব্বিশটি অপেক্ষাকৃত ছোট গম্বুজ। গির্জা আকাশের দিকে উঠে গিয়েছে গম্বুজের পিরামিডের মতো।

আগন্তুক গ্রীকদের যদি নভ্‌গোরদ দেখা থাকত তাহলে তারা বুঝতে পারত এই বহু-মস্তক-বিশিষ্ট গির্জার উৎপত্তি। নভ্‌গোরদ বিখ্যাত তার নির্মাণকারীদের জন্য। বস্তুতপক্ষে নভ্‌গোরদের মানুষদের বলা হতো "ছুতোর"। সেখানেও তারা গির্জা নির্মাণ করেছিল, কিন্তু সে-গির্জা ইটের নয়। গির্জা তারা নির্মাণ করেছিল প্রাচীন রুশ ধরনে, ওক্‌গাছের কাঠ দিয়ে। জঙ্গলের মধ্যে শতাব্দী-প্রাচীন ওক্‌ ও পাইন কাটার ব্যাপারে রুশ ছুতোররা হয়ে উঠেছিল অতিমাত্রায় দক্ষ। বিনা করাত, বিনা হাতুড়ি, বিনা পেরেক, শুধুমাত্র একটা কুড়ুল নিয়ে তারা নির্মাণ করত ঘরবাড়ি ও প্রাসাদ। কাঠের গুঁড়ি থেকে কেটে-কেটে মসৃণ চৌরস পাটাতন বার করে নেওয়াটা কি সহজ কাজ? কিন্তু এই রুশ ছুতোররা কাঠের গুঁড়ি থেকে অতি-সুন্দর বোর্ড তৈরি করত। কুড়ুল দিয়ে ঠুকে ঠুকে গোঁজ বানিয়ে নিত অর সেই গোঁজ ঢুকিয়ে দিত কাঠের গুঁড়ির মধ্যে। কারিগর যা চাইত তাই বানিয়ে দিত কাঠের গুঁড়ি থেকে। কুড়ুল দিয়ে কাঠের গুঁড়ি জোড়া লাগিয়ে তৈরি করত কাঠামো ও ছাদের বরগা। বাড়িগুলো হতো শক্তপোক্ত; শীতকালের বরফে ও তুষারে, গ্রীষ্মকালের অঝোর বৃষ্টিতে, শরৎকালের ঝড়ে ও বসন্তকালের বন্যায় বাড়িগুলোর কোনো ক্ষতি হতো না।

এইসব বাড়ির ছাদ হতো দুই অংশে বিভক্ত ও প্রচণ্ডরকমের ঢালু। এর ফলে ছাদে বরফ জমতে পারত না, বরফ ছাদ থেকে সরাসরি গড়িয়ে পড়ে যেত—ছাদের ওপরে বরফ জমতে দিলে এই বিপদ থাকে যে ছাদ বেঁকে যেতে পারে। ছাদ যাতে ঝড়ে উড়ে না যায় সেজন্য ছাদকে বসানো হয়েছে শক্ত কাঠামোর ওপরে, কাঠামো জোড়া লাগানো হয়েছে ঘোড়ার আকারে বাঁকানো অলংকারের সাহায্যে। বাড়ি যাতে প্লাবিত না হয় সেজন্য বাড়িকে বসানো হয়েছে সরাসরি জমির ওপরে নয়, মাচার ওপরে। ওপরের তলার বাস-কক্ষগুলোকে বলা হয় 'গোরনিৎসি'—যে রুশ শব্দ থেকে কথাটি এসেছে তার নাম পাহাড়। ছাদ-ঢাকা সিঁড়ি উঠে গিয়েছে জমি থেকে ওপরের তলার প্রবেশ-দরজায়। তুষার যাতে বাড়ির মধ্যে অনিমন্ত্রিত অতিথির মতো ঢুকে পড়তে না পারে সেজন্য তাকে বাধ্য করা হয় প্রবেশ-পথে প্রথমে নিজেকে উচ্চ করে তুলতে। বাড়ির দেয়াল পুরু, জানালা ছোট ছোট। এমনিভাবে, একটি বাড়ির নির্মাণ করতে গিয়ে ছুতোররা সংগ্রাম চালিয়েছিল

প্রকৃতির সকল প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে। কুড়ুলটি শুধুমাত্র হাতিয়ার নয়, সংগ্রামের অস্ত্রও।

তারপরে ছুতোরদের সমাধান করতে হলো নতুন এক সমস্যা—গির্জা নির্মাণ করা, সেই সঙ্গে বাড়ি। গ্রীক কারিগরদের কাছ থেকে তারা জেনেছিল যে গির্জার মধ্যে একটি বেদী থাকা উচিত, আর গির্জার ওপরে একটি গম্বুজ। কিন্তু নভ্‌গোরদের ছুতোররা কাজটা করল তাদের নিজস্ব ধরনে। একটি গির্জা নির্মাণ করল যার ছিল তেরোটি ছাদ। কেননা এটাই তাদের রীতি, প্রিন্সদের আবাসের ওপরে তারা অনেকগুলো ছাদ নির্মাণ করত। গির্জাটিকে মাটিতে পোঁতা খুঁটির ওপরে স্থাপন করে মাটি থেকে উঁচুতে তুলে রাখল। গ্রীক গির্জার অলিন্দটিকে করে তোলা হলো রুশী ধরনের প্রবেশ-পথে। গম্বুজকে করে তোলা হলো ছুঁচলো মাথাওলা কাঠের কুঁড়ের মতো। রুশ নগরগুলিতে একটির পর একটি কাঠের ও পাথরের গির্জা উঠতে লাগল। প্রত্যেক গির্জার মধ্যেই মেশানো থাকল কিছু-কিছু দেশজ ও রুশীর সঙ্গে কিছু-কিছু বিদেশী ও বাইজান্‌টিক। তবে বাইজান্‌টিন গির্জার মধ্যেও দেশজ উৎপত্তি ছিল। তাদের উদ্ভব অনুসরণ করলে পাওয়া যায় আয়তাকার গ্রীক ব্যাসিলিকা ও গম্বুজবিশিষ্ট রোমান প্যান্‌থিয়ন। আয়তাকারের শেষ-দিকে যেখানে একসময়ে গ্রীক বিচারকরা বসতেন সেখানে এখন রয়েছে খ্রীস্টীয় গির্জার বেদী। গ্রীক-ধরনের অট্টালিকার ওপরে স্থাপন করা হয়েছে রোমান-ধরনের গম্বুজ। এখানে এই কিয়েভে, নোভ্‌গোরদে, গ্রীক ব্যাসিলিকা ও রোমান প্যান্‌থিয়ন ও রুশ প্রিন্স-দের আবাস একসঙ্গে মিশে গিয়েছে রুশ বহু-গম্বুজ-বিশিষ্ট গির্জায়।...

কিয়েভের পাথরে তৈরি নতুন গির্জা তৈরি হয়ে গেল।

চারদিকের সমস্ত নগর থেকে অমাত্য, নগরপতি, নগরপাল ও মানুষজনকে ডেকে পাঠালেন প্রিন্স। গির্জার কাজ শেষ হতে বিরাট উৎসব শুরু হয়ে গেল। শুধু সুরা-ই প্রস্তুত হলো তিনশো বিশাল গামলাভর্তি। আসর বসল গির্জার মধ্যে। বন্ধ দরজার পিছন থেকে লোকে শুনতে পেল একটানা বিষণ্ণ গলায় গান। মনে হতে লাগল খোদ গির্জাই যেন গান গাইছে। বাইরে তখন দিন। উত্তপ্ত বাতাস স্তেপ থেকে বয়ে নিয়ে এল বিশেষ ঘাসের গন্ধ। কিন্তু গির্জার মধ্যে রাত্রি। তারার মতো ঝুলে রয়েছে বাতিগুলো। মোমবাতির শিখা ঝাপসা আলোয় দপ্‌দপ্‌ করছে। কাঁপা-কাঁপা আলোয় সাধুসন্তদের বহুবর্ণ চিত্রবিচিত্র আলখাল্লা একবার উদ্ভাসিত হচ্ছে, আবার ম্লান বর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্য মেরীমাতার অনড় চোখে জীবন্ত একটা আলোর আভা ঝল্‌সে ওঠে, পরক্ষণেই তার ফ্যাকাশে মুখখানি আবছায়ায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

জীবন্ত বাস্তব জগতটিকে মনে হয় কতই না দূরে। অথচ সেই জগৎ রয়েছে পুরু ইটের দেয়ালের ও সরু জানলার মোটা কাঠামোর ঠিক বাইরেই। এখানে পাতা বা ঘাস বা রাস্তার ধুলোর গন্ধ নেই। এখনে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে গলে-পড়া মোমের, ধোঁয়া-ওঠা বাতির, আর নেশা-ধরানো গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে ধূনোর। সমবেত সঙ্গীত অন্য এক জগতের। যখনই কেউ এসে গির্জার অলিন্দে ঢুকছে, সে যেন এসে পড়ছে অন্য এক জগতের দুয়ারে।

খ্রীস্টধর্মে এই নতুন দীক্ষিতদের সামনে খুলে গেল এক আশ্চর্য নতুন জগৎ। গির্জার দেয়াল বইয়ের মলাটের মতো। এই মলাটের ভেতর দিয়ে অন্য এক জগতে এসে পড়া যায়।

বই এল অনেক দূর থেকে। বইগুলো পার হয়ে এসেছে দীর্ঘ সময়, শতাব্দীর পর শতাব্দী, দেশের পর দেশ। পর্যটকের মতো তারাও লোককে বলেছে কী তারা দেখেছে

আর শুনেছে—ধর্মের জন্য শহীদ হওয়ার কথা, দূর দূর দেশের কথা। এই বইগুলো থেকে বিভিন্ন নগর, বিভিন্ন আচার, বিভিন্ন বিশ্বাস সম্পর্কে রুশরা জানতে পারল।

কিয়েভে বই ছিল দুর্লভ। বই দেখা যেত শুধু গির্জায় ও প্রিন্সের প্রাসাদে। কিন্তু বই যারা পড়তে পারত তারা ছিল বইয়ের চেয়েও দুর্লভ। কিন্তু প্রিন্সরা স্বীকার করত, বই থেকে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তা কত দরকারী।

তারপরে কিয়েভে স্থাপিত হল রাশিয়ার প্রথম বিদ্যালয়। সেখানে শিশুরা শিখল শুধু পড়তে নয়, বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতেও—"বইয়ের জ্ঞান" রাশিয়ার শিক্ষিত মানুষের প্রয়োজন ছিল।

৪. সোনালী তোরণে গ্রন্থাগার

সবচেয়ে প্রাচীন যে কাহিনী তার পৃষ্ঠাগুলো একবার উল্টিয়ে দেখা যাক। কাহিনীতে পাওয়া যায় সরল কাব্যিক ভাষায় রুশদেশের ইতিহাস। কতকগুলো ঘটনা কাহিনীকার নিজেই স্মরণ করেছেন, অন্যগুলো থেকে গিয়েছে বৃদ্ধদের গল্পে। তাছাড়া রূপকথা ও গান তো আছেই।

কাহিনীতে প্রিন্সদের জয়গান করা হয়েছে, সেইসব প্রিন্স যারা কিয়েভকে শক্তিশালী করেছে। প্রতি কয়েক লাইনেই বলা হয়েছে একটি বছরের কথা। প্রতি পৃষ্ঠায় একটি প্রজন্মের কথা।

ভ্লাদিমিরের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পুত্র ইয়ারোস্লাভ কিয়েভ শাসন করছেন।

কাহিনীতে বলা হয়েছে, ১০৩৮ সালে "ইয়ারোস্লাভ বৃহৎ একটি নগর নির্মাণ করেন, তার তোরণগুলো সোনার। তিনি একটি গির্জাও নির্মাণ করেন—সেন্ট সোফিয়া। বই তাঁর অতি প্রিয় ছিল, কখনো কখনো দিনে-রাতে পড়তেন। বহু লেখকের বই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলি গ্রীক থেকে স্লাভিকে অনুবাদ করতেন। তিনি অনেক বইয়ের অনুলিপি তৈরি করেছিলেন। তা থেকে মানুষ অনেক পুণ্য জ্ঞানের কথা জানতে পারে। অনুলিপি করা এই সমস্ত বই তিনি নিয়ে গেলেন নিজের তৈরি করা গির্জার মধ্যে একটি গ্রন্থাগারে। সেই গ্রন্থাগারটিকে তিনি সাজালেন সোনা দিয়ে, রুপো দিয়ে, পুণ্য ঘট দিয়ে..."

এমনিভাবে কিয়েভের বহু-গম্বুজবিশিষ্ট সেন্ট সোফিয়া গির্জায় দেখা দিল প্রথম রুশ গ্রন্থাগার।

রুশরা এই সমস্ত বই পড়ে দূর-দূর দেশে ও সাগর সম্পর্কে আবছা একটা ছবি পেত—যে-সব দেশ ও সাগর সম্পর্কে আগে তারা কখনো শোনেনি।

পুণ্যবান মানুষ সেই আলেক্সিয়াস জাহাজে চেপে রোম থেকে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। সেখানে দেখা পেয়ে গেলেন একপাল ছুটন্ত গাধার। তাদের সঙ্গে হাঁতে হাঁটতে চলে এলেন মাসিডোনিয়ার এডেসা নগরে। কিন্তু তাঁর যাত্রা শেষ হলো না। এডেসা থেকে চললেন সমুদ্রপথে এবং "ঈশ্বরের কৃপায় এবং অনুকূল বাতাস পেয়ে উপস্থিত হলেন রোমে..."

রুশ পাঠক আরো একটি বই খুলল। সেখানে ছিল পুণ্যভূমি, জর্ডন নদী ও তার ঘন নলখাগড়ার বন। তার মধ্যে চিতাবাঘ, আর পাশাপাশি আরব থেকে আসা উট, গমে বোঝাই। এদের পরে একজন পুণ্যবান সাধু যিনি নদী থেকে জল টেনে নিয়ে যাচ্ছেন মঠে।

বই পড়ে পাঠক উপস্থিত হয় শুধু অন্য দেশে নয়, অন্য সময়েও। মাসিডোনিয়ার

আলেক্‌সান্দারের কাহিনী থেকে রুশরা জানতে পারল গ্রীসের শিশুরা কী বিজ্ঞান শেখে। যথা, সংগীত; "নক্ষত্রের সূত্র", জ্যোতির্বিজ্ঞান; "মাটির মাপজোক", অর্থাৎ জ্যামিতি; "শব্দের জ্ঞান", অর্থাৎ অলংকারবিদ্যা; এবং "জ্ঞানের অনুরাগ", অর্থাৎ দর্শন।

বইগুলি থেকে রুশ পাঠক আরিস্টটলের দর্শন, ট্রোজানের কথার গায়ক হোমার, ডেল্‌ফির দৈববাণী, অলিম্পিয়ার দেবতা জিউসের মন্দির, মেম্‌ফিস ও আলেক্‌সান্দ্রিয়ার মিশরীয় নগর, বাবিলন ও ব্রাহ্মণদের বাসভূমি ভারতবর্ষ সম্পর্কে জানতে পারল।

"এবং আলেক্‌সান্দার দেখতে পেলেন বহু সুন্দর সুন্দর গাছ, নানা ধরনের ফলে ভরা। সারা দেশ ঘিরে রয়েছে একটি নদী, যার জল দুধের মতো সাদা। সেখানে ছিল অনেক খেজুর, আর আঙুরের বাগান ভরে আছে চমৎকার গুচ্ছ গুচ্ছ আঙুর।..."

রুশী পাঠক অবাক হয়ে পড়ল সেইসব আশ্চর্য দেশের কথা যেখানে আলেক্‌সান্দার গিয়েছিলেন, সেইসব মানুষের কথা "যারা কুকুরের মতো ঘেউ-ঘেউ করে", "যাদের চোখ ও মুখ তাদের বুকের মধ্যে, মাথায় নয়", সেই দেশের কথা যেখানে সূর্য কখনো কিরণ দেয় না, যেখানে সবসময়েই সূর্যালোকহীন ঊষা।

আর প্রকৃতি সম্পর্কে লেখা পুরনো বইগুলিতে পাখি ও পশু সম্পর্কে কত সব আশ্চর্য ব্যাপারই না সে পড়ত। এখানেও দেখতে পেত বাস্তব ও কল্পনায় মিশে গিয়েছে। ছবি ছিল হাতির ও সিংহের, তাছাড়াও এমন সব জন্তুর যাদের অস্তিত্ব ছিল না—অর্ধ-বৃষ, অর্ধ-হাতি, বন্য শূকর-হাতি ও উট-চিতা। সুন্দর একটি গল্প ছিল অতিকায় এক জীব সম্পর্কে যে বাস করত জলে আর আস্ত একটি হাতি এক গেরাসে গিলে ফেলতে পারত।

কিন্তু রুশ পাঠক যেমন পড়ত গ্রীক রূপকথা, তেমনি গ্রীক দর্শন। একটা বইয়ে সে পড়ল পিথাগোরাস, সক্রেটিস, ডায়োজিনিস, আরিস্টটল ও এপিকিউরাসের কথা। পড়ল এম্‌পিডোক্লিসের চারটি উপাদানের কথা—আগুন, বাতাস, জল ও মাটি। এই চারটি উপাদান দিয়েই তৈরি হয়েছে পৃথিবী। এই চারটি উপাদান থেকেই গড়ে উঠেছে অন্য সমস্ত কিছু। আরো পড়ল, আরিস্টটল পঞ্চম একটি উপাদানের কথা বলেছেন—আকাশ, ইথার। এই আকাশ পৃথিবীকে ঘিরে আছে, অনেকটা ধোঁয়ার মতো, আর সমস্ত দিকেই পৃথিবী থেকে সমান দূরে সরে গিয়েছে।

রুশ পাঠক অবাক হয়ে জানল যে পৃথিবী একটা গোলকের মতো, আর কিয়েভে যখন দিন তখন পৃথিবীর অন্যদিকে রাত্রি। সে জানল সূর্যগ্রহণ হওয়ার কারণ—যখন পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে চন্দ্র চলে আসে। সে জানল চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার কারণ—যখন পৃথিবী এসে পড়ে চন্দ্র ও সূর্যের মাঝখানে। একজন সাধুর লেখা একটি বইয়ে সে দেখতে পেল, অত্যন্ত সতর্কভাবে ডিমোক্রিটাসের পরমাণুর উল্লেখ করা হয়েছে। যে কণিকা এমন এক "কণিকা যা ধ্বংস করা যায় না, বিভক্ত করা যায় না"।

এই সমস্ত বই পড়তে পাঠকের আরো পরিষ্কার ধারণা হয়ে গেল, কী বিশাল এই জগৎ। সে ভাবল সেই মানুষের কথা যে "বিরাটদের মধ্যে ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রদের মধ্যে বিরাট"। সে জানল যে এমন সব জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন যাঁরা সবকিছুর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা বলেন নি, বলেছেন "প্রয়োজনের" কথা। এই প্রয়োজন থেকেই এসেছে ধন ও দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য ও পীড়া, দাসত্ব ও স্বাধীনতা, শান্তি ও যুদ্ধ। সবকিছু চলে প্রয়োজন অনুযায়ী, "জ্যোতিষ্কদের গতিবিধিও" তাই।

রাশিয়ার মানুষ আরো ভালোভাবে বুঝতে শুরু করল জগতে তাদের স্থান। কস্‌মাস-এর লেখা একটি বই থেকে তারা জানতে পারল জগতের আছে তিনটি বিভাগ—

এশিয়া, লিবিয়া ও রেশমের দেশ চীন; এবং জানতে পারল, পৃথিবীতে বসবাসকারী জাতিদের কথা। বইটির রুশ অনুবাদক তালিকার শেষে রাশিয়ার নাম জুড়ে দিয়েছেন—"পশ্চিমে আছে বিরাট এক দেশ—তার নাম রুশ।"

মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ধারা রাশিয়ায় প্রবাহিত হলো প্রত্যেকটি উৎস থেকে—বাইবেল থেকে, বাবিলোনিয়ার কাহিনী থেকে, আলেকজান্দ্রিয়ার গল্প থেকে, গ্রীক দর্শনের রচনাবলী থেকে। রুশদের নবীন সংস্কৃতি তার নিজের সঙ্গে বিদেশ থেকে আসা এই সংস্কৃতির মিলন ঘটাল।

সোনালী দুয়ারের গ্রন্থাগারে আরো বেশি বেশি রুশ বই এসে গেল। সেইসব বইয়ে মিশে গেল যা-কিছু বিদেশ থেকে আসা তার সঙ্গে যা-কিছু রুশ-কাহিনী, প্রবচন, রূপ-কথা, লোকগাথা, অভিযান ও লড়াইয়ের কাহিনী। প্রাচীন ইতিকথায়, ইলারিয়নের ধর্মোপদেশে, বোরিস ও গ্লেবের কবিতায়, প্রিন্স ভ্লাদিমির মোনোমাচ-এর রচনায় জন্ম নিল রুশ সাহিত্য, সৃষ্টি হলো রুশ সাহিত্যের ভাষা।

ইলারিয়ন ছিলেন কিয়েভের প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ, "একজন পুণ্যবান জ্ঞানী মানুষ যিনি উপবাস পালন করেন"। তিনি একটি বই লিখেছিলেন ; নাম, *'আইন ও হিতসাধনের জগৎ'। বইয়ে তিনি গুণগান করেছিলেন "শিক্ষক ও আচার্য, আমাদের দেশের মহান প্রিন্স, মহিমাময় স্ভিয়াতোস্লাভের পুত্র ভ্লাদিমিরের।...তাঁরা শাসন করতেন কোনো গরিব ও অজ্ঞ দেশ নয়, দেশ, যে-দেশ বিশ্বের সর্বত্র পরিচিত ও সম্মানিত।"

ইলারিয়ন সর্বান্তঃকরণে রুশদেশকে ভালোবাসতেন এবং বিপুল আবেগের সঙ্গে রুশদেশের কথা লিখতেন। মৃত প্রিন্স ভ্লাদিমির সম্পর্কে লিখেছিলেন, "হে পূত মানুষ, তোমার সমাধি থেকে উঠে দাঁড়াও! ওঠো যে স্বপ্ন তোমাকে ধরে রেখেছে তা ছুঁড়ে ফেল। কারণ তুমি তো মৃত নও, সাধারণ পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত ঘুমিয়ে আছ মাত্র।...ঘুম ঝেড়ে ফেল, চোখ মেলে তাকাও, দেখ প্রভু তোমাকে কতখানি সম্মান দিয়েছেন এবং তোমার সন্তানদের মধ্যে তোমাকে কতখানি খ্যাতি দিয়েছেন।...অবলোকন কর এই নগর, সূর্যালোকে উদ্ভাসিত, সমৃদ্ধিশীল গির্জা, বর্ধনশীল খ্রীস্টধর্ম। পূত আইকন সমেত এই নগরের দিকে তাকাও। সবকিছু দেখার পরে আনন্দ করো, অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হও।"

বছরের পর বছর কেটেছিল। আর প্রতি বছরেই রুশরা আরো বেশি-বেশি "উপভোগ করেছিল বইয়ের মিষ্টতা"।

জেরুজালেমের বিশপ সিরিল লিখেছিলেন, "মধু মিষ্ট আর চিনি উত্তম, কিন্তু বইয়ের জ্ঞান এই দুয়ের চেয়ে আরো ভালো।"

গির্জায় "প্রকোষ্ঠগুলি বইয়ে ভর্তি।" সাধুর প্রকোষ্ঠে "কেবল একটি আইকন ও একটি পুস্তক ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।" প্রত্যেক প্রিন্স ও প্রত্যেক রাজপুরুষের বাসগৃহে থাকত "ক্রুশের কক্ষ", সেখানে বেদীর ওপরে থাকত বই, তার ওপরে মূর্তি। প্রত্যেক মঠে ছিল গ্রন্থাগার। কতিপয় সাধু গ্রন্থের অনুলিপি করতেন, অন্যরা সেই গ্রন্থ বাঁধাই করতেন।

কিয়েভের পেচেরস্কি মঠে থাকতেন সাধু নেস্তর। তিনি তাঁর "ইতিবৃত্ত" লিখে-ছিলেন। "রোস্তভ অঞ্চলের এই প্রতিপালক" তাঁর প্রকোষ্ঠের বাইরেও বহুদূর পর্যন্ত

---

* *The word of Law & benefaction*

দেখতে পেতেন। দেখতেন তাঁর সমগ্র দেশকে, এবং জানতেন কি-ভাবে যেতে হয় কিয়েভ থেকে বাল্‌টিক সাগরে, সেখান থেকে রোমে, রোম থেকে বাইজানটিয়ামে, বাইজানটিয়াম থেকে আবার কিয়েভে। স্লাভ জাতিদের সম্পূর্ণ পরিবারটি তিনি দেখেছিলেন, এবং স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন এটি একটিই পরিবার, তার একটিই কথ্য ভাষা, একটিই লিখিত ভাষা।

অতএব রুশদেশে আলোকপ্রাপ্তি হয়ে চলল। এখানে ছিল বিরাট এক নদীর উৎস। প্রতি বছরে এই নদী হয়ে উঠত আরো পরিপূর্ণ, আরো প্রশস্ত। বিশ্ব সংস্কৃতির মহাসাগরে যা-কিছু মহান ও সুন্দর তাতে এই নদীর অবদান অনেক।

এই কথাই কি বলতে চাননি প্রাচীন ইতিবৃত্তাকার যখন তিনি লিখেছিলেন, "বই থেকে আমরা জ্ঞান পাই, কেননা এটি এক নদী যা সর্বজনীন তৃষ্ণা প্রশমিত করে।"

তৃতীয় অধ্যায়

১. প্রাচ্যের সম্পদ

এই পৃথিবীতে একই সঙ্গে থাকে দিন ও রাত্রি, সকাল ও সন্ধ্যা। ভূ-গোলকের একদিকে যখন অরণ্য ও ক্ষেতের ওপরে অস্তগামী সূর্যের শেষ কিরণ এসে পড়ছে, অন্য-দিকে তখন সবে ভোর হতে শুরু করেছে।

সংস্কৃতির বেলাতেও একই কথা।

ইতালি ও বাইজানটিয়ামে যখন প্রাচীন সংস্কৃতির আলো নিভে গেল, ঠিক তখনই কিয়েভে এবং আরো পূবে আরবে দেখা দিল নতুন ভোর।

প্রাচীন কাল থেকেই আরবের মধ্য দিয়ে যাত্রিদলের যাতায়াত ছিল। বণিকরা উটের কুঁজওলা পিঠের ওপরে মূল্যবান পাথর ও মশলার বোঝা চাপিয়ে তাদের নিয়ে আসত ভারত থেকে। তারা রেশমী কাপড় আনত চীন থেকে, হাতির দাঁত আনত সংকীর্ণ লোহিত সাগরের ওপারে গ্রীষ্মমন্ডলীয় নুবিয়া থেকে।

এই যাত্রিদল সবসময়েই যেত মক্কার মধ্যে দিয়ে এবং এই পুণ্য-নগরে থামত। বণিকরা সেখানে একটি কালো পাথরের কাছে প্রার্থনা জানাত। এই পাথরটি সম্পর্কে বলা হতো, এটি কোনো এক সময়ে স্বর্গ থেকে পড়েছে এবং সকল আরব উপজাতি পাথরটিকে পবিত্র মনে করে। মরুভূমির মধ্যে দিয়ে লোকে পথ খুঁজে পেত আকাশের তারা দেখে এবং পথ-বরাবর ছড়ানো পাথর দেখে। এই তারাটি যখন আকাশ থেকে খসে পড়ল, লোকের ধারণা হলো এটি পবিত্র, দেবতার মতো। তীর্থযাত্রীরা মক্কায় আসত নানা দিক থেকে—দূর মরূদ্যান থেকে আসত কৃষকরা, নগরের মধ্যে দিয়ে ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে যেত যাযাবর বেদুইনরা এবং নগরের সাদা দেয়ালের সামনে তাদের সাদা তাঁবু খাটাত।

কৃষকরা মরুভূমির অধিবাসীদের শত্রু বলে ভাবত। মরুভূমির মধ্যে যাযাবরদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা বণিকদের কাছে আদৌ মনঃপূত ছিল না। কিন্তু বণিকরা মক্কায় এসে খুবই নিরাপদ বোধ করত। সেখানে সবসময়েই ছুটি লেগে থাকত, আর যেখানেই ছুটি থাকে সেখানেই থাকে বাজার ও মেলা।

মক্কায় কোনো কৃষক ছিল না, কোনো কারিগরও নয়। মক্কা ছিল ব্যবসায়ীদের নগর। এখানে কেনাবেচা চলত, বাইজানটিয়ামের স্বর্ণমুদ্রা বেজান্‌ৎ ধার করা যেত।

রোদ-ঝলমলে বাজারগুলোতে সবসময়েই ব্যস্ততা, গাধার ডাক আর ফেরিওলাদের চেঁচামেচিতে সবসময়েই হট্টগোল। উটের কুঁজগুলো ভিড়ের মাথার ওপর দিয়ে বুনন দেওয়ার মতো ওঠানামা করে চলত। নগরের সরু সরু রাস্তা বরাবর, বাড়িগুলোর সাদা কাদামাটির দেয়ালের মাঝখান দিয়ে, বয়ে যেত পাগড়ি ও আলখাল্লার শেষহীন প্রবাহ। এইসব বাড়িতে কোনো জানলা থাকত না, বাইরে থেকে দেখতে খুবই দরিদ্র ছিল। কিন্তু অতিথি যখন সরু দুয়ার খুলে অন্ধকার অলিন্দ পার হয়ে ভিতরকার উঠোনে এসে দাঁড়াত তখন চারদিককার আকস্মিক পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে যেত। তিনটি সরু-সরু সাদা

স্তম্ভের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে মনোহর একটি খিলান। উঠোনের মাঝখানে একটি ফোয়ারা থেকে শীতল বৃষ্টি ঝরে পড়ছে মার্বেলের টালির ওপরে। সুগন্ধী ধূপের আবছায়ায় ঘরের বাতাস নীল। গুমোট এক নগরীর মাঝখানে এই এক মরূদ্যান। এখানে তালগাছ নেই, আছে স্তম্ভ। কূপ নেই, আছে ফোয়ারা। মক্কার পুণ্য নগরে বণিকরা বিলাসবহুল জীবন যাপন করত। সবচেয়ে ধনী ছিল যারা বাণিজ্য করত সবচেয়ে দুর্লভ পণ্য স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে।

তাহলে এমন কেন হতো যে নিজেদের যারা মনে করত ভাগ্যবান তারা ক্রমেই বেশি-বেশি মাত্রায় বিবাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল? কেন তাহলে অভ্যাগত বণিকরা তাদের মহাজনদের এই কথা বোঝাতে আরো বেশি বেশি বেগ পাচ্ছিল যে দামশোধের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হোক কিংবা ঋণের ওপরে সুদের পরিমাণ কমানো হোক?

মক্কার সময় খারাপ যাচ্ছিল। রোমান সীজারদের ও বাইজানটিন সম্রাটদের ছিল হাতের কাছে সোনা। তাদের প্রতিবেশী পারসিকদের ছিল প্রাচ্যে যাবার নিজস্ব পথ। একপাশে পড়ে গিয়েছিল আরব। বাণিজ্যের অবস্থা খারাপ থেকে আরো খারাপ হচ্ছিল। ভূমধ্যসাগর ক্রমেই হয়ে উঠছিল মহাশূন্য। যেহেতু উত্তরের বর্বররা নিজেদের ইতালিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, ভারতীয় সামগ্রীর প্রবাহ বেছে নিয়েছিল নতুন পথ—পারস্য ও বাইজান্টিয়ামের মধ্যে দিয়ে।

জগতের শেষ ঘনিয়ে আসছিল যেন। এমনকি সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরগুলিও জনশূন্য হয়ে গেল—যখন যাত্রিদলের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল তাদের কানন ও পথের মধ্যে দিয়ে। বালুকা উড়ে এসে পড়ল প্রাসাদগুলির মার্বেল টালির ওপরে। প্রাচীন সমৃদ্ধির স্মৃতি বজায় থাকল শুধু ধ্বংসস্তূপে।

মক্কার পক্ষেও এই ছিল জগতের শেষ। কোথায় পাওয়া যেতে পারত মুক্তি?

এতদিন পর্যন্ত ধনী বণিকদের পক্ষে ব্যাপারটা খুব বেশি খারাপ হয়ে উঠেনি। সম্পদ তারা জমা করেছিল কম নয়। তারা সুদে টাকা ধার দিত। যাদের ধার দিত তারা তাদেরই উপজাতীয় আপনজন—বাজারের ব্যবসায়ী, কৃষক ও বেদুইন যাযাবররা। খাতকদের পক্ষে ব্যাপারটা সহজ ছিল না। ঋণের ফাঁস তাদের দম বন্ধ করে দিত। সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে তারা ঘৃণা করত তাদের ঋণদাতাদের, যারা এক **বেৎসান্ট** ধার দিলে তার বদলে দাবি করত তিন **বেজান্ৎ**।

যে ঘেরা জায়গায় পবিত্র কালো পাথরটি রাখা ছিল সেখানে মানুষজন আরও ঐকান্তিকতার সঙ্গে প্রার্থনা করতে লাগল। পাথর কিন্তু নির্বাক। যাত্রিদলের চালা-গুলোতে লোকে আগ্রহের সঙ্গে শুনতে লাগল বিদেশী বণিকদের কাহিনী। সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে চালান হয়ে এল বিদেশের ধর্মবিশ্বাস। ইহুদীরা বলল তাদের মেসিয়া বা রক্ষাকর্তার কথা, খ্রীস্টানরা বলল তাদের সেভিয়ার বা ত্রাণকর্তার কথা।

সাধু ও মহাপুরুষরা ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁদের বাণীতে একই সঙ্গে শোনা গেল তাঁদের নিজেদের ও বিদেশের ধর্মবিশ্বাসের কথা। ধনী ও কীর্তিমান-দের তারা শাসিয়ে রাখল যে শাস্তি তাদের পেতেই হবে আর ভবিষ্যদ্বাণী করল প্রতিফলের।

এই মহাপুরুষদের মধ্যে একজন ছিলেন যাঁকে বলা হতো মহম্মদ। তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার করতেন। এই নতুন ধর্মবিশ্বাসের টানে বহু মানুষ তাঁর অনুগামী হলো।

মক্কার ধনী বণিকরা পূর্বপুরুষদের ধর্মবিশ্বাস বর্জনকারী এই দলত্যাগীর বিরুদ্ধে গিয়েছিল। ৬২২ সালে মহম্মদকে পালিয়ে যেতে হলো মক্কা থেকে। মুসলমানদের পঞ্জিকা

এই বছর থেকেই শুরু হয়েছে। দীর্ঘ সংগ্রামের পরে মহম্মদ তাঁর বিরোধীদের ওপরে জয়ী হলেন।

খ্রীস্টধর্মের মতো এই ধর্ম সবাইকে কাছে টানল, কোনো বাছবিচার না করে সবাইকে বুকে নিল। এই ধর্মে একেশ্বরের কথা বলা হলো, কিন্তু পাথরটির পবিত্রতার কথা অস্বীকার করা হলো না। বলা হলো যে মহম্মদ হচ্ছেন ইহুদী পয়গম্বরদের ও খ্রীস্টের সরাসরি উত্তরপুরুষ। গরিবদের আশ্বাস দেওয়া হলো স্বর্গীয় সুখের, আর ধনীদের পার্থিব সকল সম্পদের।

এই ধর্মে ডাক দেওয়া হলো, সমগ্র বিশ্বকে জয় করার জন্য একটি পবিত্র যুদ্ধ চালানো হোক। শুরু হয়ে গেল রাজ্যজয়—এবারে পশ্চিমে নয়, পুবে।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল মক্কা। সম্প্রতিকালেও যারা ছিল শত্রু—ধনীরা ও গরিবরা—তারা ইস্‌লামের সবুজ পতাকার নিচে একযোগে চলল সেইসব দেশ জয় করতে যেগুলির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে পুবের দিকে যাত্রীদলের পথ।

আরবরা যখন চারদিকে তাকিয়ে দেখল, তাদের চোখে পড়ল পাঁচটি বৃহৎ রাজ্য। পশ্চিমে রাজত্ব করছিল রুম-এর রাজা (বাইজান্‌টিন সম্রাটকে মুসলমানরা এই নাম দিয়েছিল); তিনি ছিলেন "যোদ্ধাদের রাজা", রোমান সম্রাট। রুম বা বাইজান্‌টিয়ামের পাশাপাশি বিস্তৃত ছিল "ধনদৌলতের রাজার" রাজ্য, ধনী পারসিক শাসনকর্তা। উত্তরে ছিল "অশ্বদের রাজা" তুর্কী খান, যিনি ছিলেন সমতল অঞ্চলে বিচরণকারী অশ্বারোহীদের শাসক। পুবে শাসন করতেন "জাতিসমূহের রাজা", "শিল্প ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের রাজা", চীনা সম্রাট। দক্ষিণে ছিল ভারতবর্ষ তার "হস্তীদের রাজা", "জ্ঞানের রাজা"। মক্কা থেকে অবলোকন করে আরবদের কাছে বিশ্বজগৎ যেমনটি দেখাত তা এইরকম।

মহম্মদের উত্তরাধিকারীরা, খলিফারা, আরব উপজাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করল এবং তাদের চালিত করল বিশ্বজয়ের দিকে—পুব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে। তারা পারস্য জয় করল এবং বাইজান্‌টিয়ামের হাত থেকে মিশর অধিকার করে নিল। দেশের পর দেশ জয় করে চলল তারা। লড়াই করল সমস্ত বড়ো বড়ো রাজার সঙ্গে—ভারতবর্ষ ও বাইজান্‌টিয়ামের রাজাদের সঙ্গে, তুর্কী যাযাবরদের সঙ্গে, মধ্য এশিয়ার সীমান্তে চীনা সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে। তারা স্পেন অধিকার করে নিল। এই সমস্ত কিছুই তারা করল প্রায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে—সপ্তম শতাব্দীর শেষ ও অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে।

অধিকৃত প্রত্যেকটি দেশে তারা গড়ে তুলল সামরিক শিবির, নির্মাণ করল দুর্গ। এই শিবিরগুলো হয়ে উঠল নগর। যোদ্ধাদের পেছনে পেছনে এসে হাজির হলো বণিকরা। ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলোতে ও আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় নিজেদের কায়েম করার পরে আরবরা বাইজান্‌টিন জাহাজ-চলাচলকে ত্রাসিত করে তুলল।

আরব যাত্রীদলকে দেখা যেতে লাগল বিশ্বের সমস্ত সড়কে। ঘোড়া ও ভেড়ার পালকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে তারা নিয়ে আসত আর্মেনিয়া ও জর্জিয়া থেকে রেশম ও উলের কাপড়, কার্পেট ও ফার। কাস্পিয়ান সাগরের তীর থেকে তারা পেত তাদের কামানের জন্য তেল। এই সমস্ত কামান থেকে তরল আগুনের গোলা বর্ষিত হতো শত্রুর দিকে।

শণের কাপড়কে তারা বলত "রুশী রেশম", সেই রুশী রেশম ও ফার তারা নিয়ে যেত নোভগোরদ দেশ "স্লাভিয়া" থেকে। তাদের দেখা যেত বাল্‌টিক সাগরের তীরে, এমনকি সুইডেনের উপকূল ছাড়িয়ে গোট্‌ল্যান্ড দ্বীপে। তারা যেত অনেক দূরের দেশ এশিয়ার সিংহল ও চীনে এবং আফ্রিকার সুদানে।

মানচিত্রগুলোতে বহুকাল আরব পর্যটকদের স্মৃতি বজায় থাকবে। "সাহারা" একটি

শব্দ, তার মানে মরুভূমি। "সুদান" কথাটার অর্থ কালো মানুষদের দেশ। এমনকি "জাভাও" আরব শব্দ।

আরবরা যে-জগতকে তাদের আওতায় এনেছিল তার বিস্তার বেড়ে চলল। এই জগতের একপ্রান্তে ছিল নভ্‌গোরদ দেশ "স্লাভিয়ার" বরফের নিচে চাপা পড়া অরণ্য, দারুময় নগরের চোখা খুঁটির বেড়া, প্রিন্সদের বহু-ছাদ-বিশিষ্ট গৃহ, ওভারকোট ও টুপি পরিহিত হালকা-চুল মানুষ। অন্য প্রান্তে উষ্ণমন্ডলীয় অরণ্য ও জঙ্গলের মাঝখানে তালপাতার তৈরি ঘরে বাস করত সারা গায়ে উল্‌কি আঁকা কৃষ্ণবর্ণ মানুষ। এই সমস্ত অরণ্য ও জঙ্গলে হিপোপটেমাসরা গরমের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বেশির ভাগ সময় কাটাত জলের মধ্যে।

আরব বণিকরা সব জায়গায় যেত—বরফের ওপর দিয়ে স্লেজগাড়িতে, মরুভূমির ওপর দিয়ে উটের পিঠে, সমুদ্রের ওপর দিয়ে উঁচু গলুইওলা জাহাজে, ভারতবর্ষের ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে হাতির পিঠে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে দিয়ে যাবার সময়ে তারা সঙ্গে নিয়ে যেত সামগ্রী : যথা, রেশমী কাপড়, ছুরি—যার চকচকে ইস্পাতের ফলার ওপরে মহম্মদের বাণী খোদাই করা, থলিবোঝাই গোলমরিচ, চিনি ও লবঙ্গ। আরবদের রৌপ্য মুদ্রা হয়ে উঠল বিশ্বের মুখ্য মুদ্রা। বহু আরবী শব্দ ঢুকে গেল রুশ, জার্মান, ফরাসী ও ইংরেজি ভাষায়। 'ক্যারাভ্যান', 'ম্যাগাজিন', 'অ্যাডমিরাল'—এই সমস্ত শব্দ আমাদের ভাষায় নিয়ে এসেছে আরবরা, গোলমরিচ ও লবঙ্গ ও আদার সঙ্গে সঙ্গে।

জার্মান ব্যারন ও ইংরেজ লর্ডদের ওক্‌কাঠের টেবিলে গোলমরিচ উপস্থিত হতে পেরেছিল দীর্ঘপথ পরিক্রমার পরে। একজন জমিদার তাঁর জমিদারির মধ্যেই নিজের যা-কিছু প্রয়োজন পেতে পারতেন। তাঁর দাসরা তাঁকে যোগান দিত খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ ও পাদুকা। কিন্তু গোলমরিচ—এই কড়া পাউডার যা জিভে জ্বলুনি ধরায়, অথচ খিদে জাগিয়ে তোলার পক্ষে এত বেশি উত্তেজক—সেটি ইওরোপে জন্মাত না। সেটি আনতে হতো অদৃশ্য এক দেশ থেকে। চড়া দাম দিতে হতো তার জন্য। কিন্তু গোলমরিচ না থাকলে খাওয়াকে খাওয়া বলে মনে হতো না। গোলমরিচ ছাড়া খাদ্য হয়ে যেত পান্‌সে ও বিস্বাদ—এমনকি সেই খাদ্য যদি হয় আগুনে ঝলসানো ও ধোঁয়া-ওঠা গরম অবস্থায় নিয়ে আসা শুয়োরের মাংসের টুকরো, কিংবা আগুনে ঝলসানো গোটা হাঁস। একথাও বলা হতো যে গোলমরিচ স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি চমৎকার।

গোলমরিচের পরিক্রমার পথটি কী ছিল?

যাত্রা শুরু হতো ভারতবর্ষে। সেখান থেকে সমুদ্রপথে আরবদেশের তীরে। সেখান থেকে তীর্থযাত্রীরা উটের পিঠে চাপিয়ে তাকে নিয়ে যেত মক্কায়। কেননা তীর্থযাত্রীরা ব্যবসাও করত। যদি লাভের কথা ভাবত তাতেও পাপ হতো না। এই সময়ে মক্কা হয়ে উঠেছিল আরো ধনী ও আরো জনাকীর্ণ। এই পবিত্র নগরে ব্যবসায়ীরা আসত সমস্ত বর্ণের, বিশ্বের সমস্ত দেশ থেকে।

মক্কা থেকে গোলমরিচ যাত্রা করত পশ্চিম দিকে, বস্‌ফরাসের তীরে। এটি এমন এক জায়গা যেখানে সংকীর্ণ একটি প্রণালী মাত্র ইওরোপ থেকে এশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এখানে, কন্‌স্টান্‌টিনোপ্‌ল-এ, ভারতে উৎপন্ন গোলমরিচ গিয়ে পড়ত নতুন এক প্রভুর হাতে। তিনি বাইজান্‌টিয়ামের সম্রাট। তাঁর দরবারটি ছিল বিশ্বে সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ। বাইজান্‌টিন গির্জাগুলিতে ধর্মীয় মূর্তিগুলি বসানো থাকত সোনালী

বেদীর ওপরে আর হাজার-হাজার ঝলমলে মূল্যবান পাথর থেকে বিচ্ছুরিত হতো শত শত দোদুল্যমান বাতির আলো।

এতে অবাক হবার কিছু ছিল না। সম্রাট ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী বণিক। তাঁর ভান্ডারে বিপুল পরিমাণে মজুদ থাকত দানাশস্য, রেশমী বস্ত্র, অলিভ তেল ও প্রাচ্যের মশলা। তার মধ্যে অবশ্যই ছিল গোলমরিচ, যেটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। সেখান থেকে ব্যবসায়ীরা যাত্রা করত সমুদ্র ও ডাঙার পথে, পাহাড় ও উপত্যকা পেরিয়ে; তাদের গন্তব্য স্থান হতো মার্সাই, প্যারিস, রাইন, ফ্ল্যান্ডার্স।

২. খলিফার প্রাসাদ ও পুস্তক-বিক্রেতার বিপণি

বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত নগরগুলির তালিকা দীর্ঘ। এই তালিকায় আরো একটি নতুন নাম দেখা দিল—বাগদাদ।

কে না পড়েছে 'সহস্র-এক আরব্য রজনী?' কে না শুনেছে মরুভূমির মরীচিকার মতো বায়বীয় খলিফার রাজপ্রাসাদগুলির কথা, তাদের সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত স্তম্ভ ও খিলানের কথা? শিল্পীর হাতের নিচে পাথর হারিয়েছে তার স্থাণুত্ব ও ভার। ফোয়ারা থেকে জল পড়ছে মার্বেল পাথরের আধারে। দেখে চট করে বোঝা যায় না কী ঘটেছে—জল পরিণত হয়েছে মার্বেল পাথরে, না মার্বেল পাথর হয়ে উঠেছে তরল। কোথাও কোনো চিত্র নেই, কোনো মূর্তি নেই—কেননা, ইসলাম ধর্মে এসব বারণ। কিন্তু প্রত্যেকটি দেয়াল ও প্রত্যেকটি সিলিং ছিল খোদাই-করা কার্পেটের মতো। সেখানে কোরাণের স্তোত্রকে অলংকৃত করা হয়েছিল অতি সুন্দর সব নক্‌শা দিয়ে। আরবী অক্ষরগুলোকেই দেখাচ্ছিল অতি-সুন্দর নক্‌শার মতো। তাদের পাশে আরবী নক্‌শাগুলোকে মনে হচ্ছিল এমন কোনো বর্ণমালার অক্ষর যে বর্ণমালার পাঠোদ্ধার হয়নি।

কী ছিল কোরাণের এই সমস্ত বাণীতে, ছিল মহিমাকীর্তন—আল্লার, মহম্মদের, সারা বিশ্বে সবচেয়ে সুন্দর বাসস্থান হিসেবে খলিফার প্রাসাদের।

এবারে আসুন প্রাসাদ ছেড়ে যাই এবং বাগদাদের রাস্তায় পুস্তক-বিক্রেতা নাদিমের দোকানে হাজির হই। দোকানের মধ্যে পুস্তক-বিক্রেতাকে খুঁজে পাওয়াই শক্ত—মেঝের ওপরে চারদিকে শুধু স্তূপীকৃত বই আর বই। বইগুলো দেখে বড়ো সম্পদ বলে মনে হচ্ছে না। দামী পার্চমেন্ট বা মিশরীয় প্যাপিরাস দিয়ে সেগুলো তৈরি নয়, তৈরি চীনাদের দ্বারা আবিষ্কৃত সস্তা কাগজ দিয়ে। বই রয়েছে প্রচুর, ধুলোও প্রচুর। তবুও, অবাক হবার মতো ব্যাপার খলিফার প্রাসাদে যতো-না আছে তার চেয়ে বেশি আছে এখানে।

পুস্তক-বিক্রেতা বিনীতভাবে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, কী বই আপনার চাই। সে একটি পুস্তক-তালিকা প্রস্তুত করেছে, সেটি আপনাকে দেখাতে চাইবে। তালিকাটি দীর্ঘ; আরবী ভাষায় লেখা। তালিকায় আপনি দেখতে পাবেন পারসিক কবিতা, গ্রীক দার্শনিক-দের লেখা বই, ভারতীয়দের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা। কিসে আপনার আগ্রহ? ভারতীয় গণিত-বিজ্ঞানে? নাকি, জাতি ও দেশের বিজ্ঞান 'ভূগোলবৃত্তান্ত'-এ? নাকি, দিব্যজ্ঞানী ও রাজাদের ইতিহাসে? তারই মধ্যে রয়েছে তাবারি রচিত বৃহৎ একটি গ্রন্থ, যাতে বলা হয়েছে জগতের সমগ্র ইতিহাস, যার মধ্যে আপনি পড়তে পারবেন বহু দেশের বিরাট মানুষদের কথা—ইহুদীদের পয়গম্বর মোজেস-এর কথা, দিগ্বিজয়ী আলেক্‌সান্দারের কথা, পারস্যের রাজা সাইরাসের কথা, সম্রাট অগাস্টাসের কথা।

ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থ আরো আছে। গ্রন্থকার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন সেগুলোকে

সত্যনিষ্ঠ ও সঠিক করে তুলতে। সবসময়েই বলে দিচ্ছেন কোথা থেকে উপকরণ পাওয়া গিয়েছে। প্রত্যেকটি পুস্তকের ভূমিকার পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে : "এই কাহিনী আমি পেয়েছি অমুক-অমুক জায়গা থেকে", "তিনি এই-এই কথা বলেছেন", "তিনি বলেছেন, 'আমি...'" তারপর কাহিনীতে বলা হচ্ছে গ্রন্থকার প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে কী শুনেছেন।

যদি জ্ঞানের কথা শুনতে আপনার আগ্রহ থাকে তাহলে দেখুন একজন পণ্ডিত পারসিকের লেখা এই একটি বই। তিনি আপনাকে জানাচ্ছেন বিভিন্ন ধর্মের কথা, বিভিন্ন বিজ্ঞানের কথা—সম্পূর্ণ বিষয়গতভাবে, কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে।

আপনি যদি জানতে চান কিভাবে পৃথিবী ও আকাশ তৈরি হয়েছে তাহলে ওই হচ্ছে টলেমির লেখা ত্রিশ খণ্ডের 'আল্‌মাজেস্ট', আরবী ভাষায় অনুদিত।

খলিফার প্রাসাদে আপনি শুধু দেখেছিলেন সেখানকার সম্পদ। কিন্তু নাদিমের এই অন্ধকার ধুলোভরা বইয়ের দোকানে জড়ো করা রয়েছে দূরের নক্ষত্র থেকে সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত সারা বিশ্বের বিষয়ে সমস্ত কিছু। এখানে সমাবেশ করা হয়েছে বহু যুগের ও বহু প্রজন্মের জ্ঞান। মার্বেল পাথর বা মণিমুক্তার চেয়ে এই সম্পদ সংগ্রহ করা আরো বেশি শক্ত।

খলিফা যথার্থই বলেছিলেন, "শহীদের রক্ত যতোটা সম্মানীয়, তেমনি সম্মানীয় পণ্ডিত ব্যক্তির কালি।"

অবশ্য, বই যে কত দামী তা প্রত্যেক খলিফাই বুঝতে পারেন তা নয়। শোনা যায়, খলিফা ওমর পারস্যে গিয়ে প্রচুর সংখ্যক বই পেয়েছিলেন। বইগুলো নিয়ে কী করা হবে, সে-কথা তাঁর সহকারী তাঁকে জিজ্ঞেস করল : "এই বইগুলো কি আমরা প্রকৃত বিশ্বাসী-দের মধ্যে বিলিয়ে দেব? সেইসঙ্গে বাকি লুটের মাল?" ওমর জবাব দিলেন, "কোরাণে যা লেখা আছে তাই যদি এই বইগুলোর মধ্যে লেখা থাকে তাহলে এই বইগুলো কোনো কাজের নয়। আর এই বইগুলোর মধ্যে যদি অন্য কিছু থাকে তাহলে তা ক্ষতিকর। যাই হোক না কেন, বইগুলোকে অবশ্যই পুড়িয়ে ফেলা দরকার।"

কেউ কেউ বলেন, এ-ঘটনা আলেকজান্দ্রিয়ায় ঘটেছিল, পারস্যে নয়। আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি বহুবার পোড়ানো হয়েছিল। পুড়িয়েছিল সীজারের বাহিনী ও গোষ্ঠীপতি থিওফিলাসের আশীর্বাদ নিয়ে গোড়ার দিকের খৃস্টানরা। আর আরবরা যখন আলেক-জান্দ্রিয়া দখল করেছিল তারা অন্যদের রেখে যাওয়া বাকিটুকু পুড়িয়ে শেষ করেছিল।

সম্ভবত এইভাবেই ঘটনাগুলো ঘটেছিল। কিন্তু সেইসব দিন বহু আগেই চলে গিয়েছে। আরবরা এখন বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা করে এবং যে যেমন খুশি ভাবুক বা বিশ্বাস করুক তাতে কোনো বাধা দেয় না। খলিফাতন্ত্রের নগরগুলিতে সর্বত্র—কি দামাস্কাস, কি বাগদাদে, কি বোখারায় কি উরগেঞ্জ-এ—আরব ও পারসিক, খারেজমিয়ান ও ইহুদি পণ্ডিতরা স্বাধীনভাবে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতেন, স্বাধীনভাবে তর্ক চালাতেন বিশ্ব কেমনভাবে গড়ে উঠেছে—তাই নিয়ে।

নবম, দশম, একাদশ—শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে গেল।

আরব খলিফাতন্ত্র বহু বিভিন্ন রাজ্যে ভাগ হয়ে গেল। কিন্তু তাতে পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাজ চালিয়ে যেতে কোনো অসুবিধে হলো না। পণ্ডিত ব্যক্তিরা ভাবতেন তাঁরা বিশ্বের নাগরিক, যেখানেই তাঁরা থাকুন না কেন—কোরদোভায় বা বোখারায়, বাগদাদে বা উরগেঞ্জে। প্রত্যেক রাজপুত্র ও প্রত্যেক আমির চেষ্টা করতেন পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিজের নিজের দরবারে টেনে আনতে। বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার ও মানমন্দিরকে মনে করা হতো নগরের পক্ষে আরও বড়ো অলংকার—ধনসমৃদ্ধতম রাজপ্রাসাদের চেয়েও। এমনকি বাইজান্টিন সম্রাটও চেষ্টা

করতেন খলিফার দরবারে যাঁরা বিখ্যাত সেই পণ্ডিত ব্যক্তিদের কনস্টান্টিনপল-এ নিজের দরবারে টেনে আনতে।

অনেক দূরে, মধ্য এশিয়ার মরুভূমিতে, উরগেঞ্জ-এ, লোকে তারা পর্যবেক্ষণ করছিল ও বিশ্ব সম্পর্কে পাঠ নিচ্ছিল। বর্তমানে সেই সময়কার উরগেঞ্জ-এর যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা হচ্ছে জনবসতিহীন মরুভূমির মধ্যিখানে মসজিদের একটি গম্বুজ মাত্র। কিন্তু সে-সময়ে এটি ছিল একটি বৃহৎ ও সমৃদ্ধ নগর, রাজাদের রাজধানী—খারেজম-এর শা'দের, যাঁরা মধ্য এশিয়ায় ও ইরানে রাজত্ব করতেন। খারেজম থেকে পর্যটক আল বিরুণি ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন সেই রহস্যময় দেশটিকে জানবার জন্য।

আল বিরুণি ছিলেন বিদেশী, তিনি প্রচার করতেন ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চল যারা জয় করেছিল ভারতবর্ষের সেই শত্রুদের ধর্ম। তিনি এক-দেবতায় বিশ্বাস করতেন। কিন্তু ভারতবর্ষে যতো না মানুষ তার চেয়ে বেশি সংখ্যক ছিলেন দেবতা। আল বিরুণি মূর্তিকে প্রণাম করার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে বড়ো বড়ো পাথর খোদাই করে বুদ্ধের মূর্তি ফুটিয়ে তোলা হতো। চতুর্ভুজ শিবের মন্দিরে সারা দিন সারা রাত নর্তকীরা নাচত।

তা সত্ত্বেও ভারতীয়রা আল বিরুণিকে প্রচুর শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন বিজ্ঞানে তাঁদের ভ্রাতা হিসেবে। দেশে ফিরে এসে তিনি একটি বই লিখেছিলেন। বইয়ে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছিলেন হিন্দুদের অদ্ভূত সব রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও ধ্যানধারণা সম্পর্কে। এগুলো তাঁর কাছে অসাধারণ মনে হয়েছিল।

পশ্চিম থেকে বিতাড়িত হয়ে বিজ্ঞান বিজয়মণ্ডিত পর্যটন শুরু করেছিল পূবে। পণ্ডিত গ্রীকদের রচনাবলী নকল করা হচ্ছিল পুঁথি থেকে পুঁথিতে, ভাষা থেকে ভাষায়। আরিস্টটল পূবকে জয় করলেন আলেক্সান্দারের তলোয়ার দিয়ে নয়—কলম দিয়ে।

আলমাজেস্ট ভারতে পৌঁছাল সিরিয়া ইরান ও খারেজম হয়ে। মিশরীয় পণ্ডিত ইবন আল হাসানের রচনায় পাওয়া যেত গ্রীক জ্যামিতি ও ভারতীয় বীজগণিত। আরব গণিতবিদরা যেমন পরিচিত ছিলেন গ্রীক আর্কিমিডিসের সঙ্গে তেমনি ভারতীয় আর্যভট্টের সঙ্গে।

পূব থেকে একটি বিপরীত স্রোত ধেয়ে এল পশ্চিমের দিকে। ভারতের সংখ্যা আরবদেশ ঘুরে হাজির হলো ইওরোপে। পথে আসতে আসতে তাদের নাম বদলে গেল। ইওরোপে যখন এসে পৌঁছল তখন তাদের নাম আরবী সংখ্যা। গেরবার্ট নামে একজন পাদ্রি ছিলেন ইওরোপে প্রথম ব্যক্তি যিনি এই সংখ্যাগুলো ব্যবহার করেছিলেন এবং একটি ভারতীয় অ্যাবাকাসে হিসেব করেছিলেন।

চীন থেকে আরবদেশ হয়ে ইওরোপে এসে হাজির হলো চৌম্বক শলাকা ও কাগজ। তারপর থেকে ইতালীয় জাহাজগুলি কম্পাসের সাহায্যে পথ খুঁজে নিতে পেরেছিল। ইতালীয় নাবিকরা চৌম্বক শলাকার ভিতর দিয়ে একটি খড় চালিয়ে দিত আর তখন সেটিকে দেখতে হতো ক্রুসের মতো। তারপরে সেটিকে ভাসিয়ে দিত এক গামলা জলের ওপরে। শলাকাটি আপনা থেকেই ঘুরে যেত আর উত্তর-দক্ষিণ বরাবর দিক নির্দেশ করত। ইওরোপীয়দের মধ্যে ইতালীয়রাই প্রথম চামড়ার বদলে কাগজ ব্যবহার করেছিল। কাগজ তারা পেয়েছিল সিরিয়া থেকে।

মানবিক চিন্তার বিভিন্ন ধারা বিশ্ব বিজ্ঞানের এক মহাসাগর তৈরি শুরু করল। পথে কতই না বাধা অতিক্রম করতে হয়েছিল এই চিন্তাকে। প্রথমত ছিল ভিন্ন ভিন্ন

ভাষা রীতিনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বাভাবিক বাধা, তারপরে ছিল অসহিষ্ণুতার দ্বারা গড়ে ওঠা কৃত্রিম বাধা।

কিন্তু চিন্তাকে রক্ষা করার জন্য ছিল সাহসী যোদ্ধারা। তাই যদি হয় তাহলে চিন্তা সমস্ত বাধা এড়িয়ে যেতে পারে, কিংবা মহাসাগরের দিকে ধাবমান নদীর মতো সমস্ত বাধা ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

মানুষ পুনরায় এসে দাঁড়িয়েছিল বিরাট বিরাট আবিষ্কারের দ্বারদেশে।

মাগেলানের অনেক আগে সিরিয়ার আবুলফিদা প্রমাণ করেছিলেন যে একজন পর্যটক যদি বিশ্বকে প্রদক্ষিণ করে আসে তাহলে সে চব্বিশ ঘণ্টা পিছিয়ে বা এগিয়ে থাকবে। কোন্‌টা হবে তা নির্ভর করবে কোন্‌ দিক দিয়ে সে প্রদক্ষিণ করেছে।

কোপারনিকাসের অনেক আগেই পণ্ডিত তাদাজিক আল বিরুণি ঘোষণা করেছিলেন যে সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর আবর্তনের ফলে নক্ষত্রের চলাচলের সারণির সঙ্গে কোনো বিরোধিতা ঘটে না। তিনি যে এই সমস্ত সারণি প্রস্তুত করেছিলেন, যাতে দেখানো হয়েছিল সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কের বিচারে পৃথিবী ও নক্ষত্রের চলাচল, তার জন্য শা তাঁকে রুপো বোঝাই একটি হাতি উপহার দিয়েছিলেন। উপহারটি তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে যে রুপোর প্রয়োজন তাঁর নেই। কেননা তাঁর আছে আরও সেরা সমুদ্র : জ্ঞান।

অপর একজন পণ্ডিত, আল হাসান, মাপজোক নিয়ে দেখিয়েছিলেন যে সূর্যের কিরণ যখন অদৃশ্য হয় তার আগেই সূর্য দিগন্তের নিচে বাহান্ন-হাজার পদ চলে গিয়েছে। আমাদের আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা যে হিসেব করেছেন তার সঙ্গে এই হিসেবের সামান্যই অমিল।

যে-সময়ে কোনো কোনো বিজ্ঞানী গ্রহের চলাচলের হিসেব করছিলেন তখন অন্যরা ব্যাপৃত ছিলেন ছোট ছোট বিষয় নিয়ে। তাঁদের আরিস্টটলকে তাঁরা ভালোই চিনতেন। আলেকজান্দ্রিয়ার পণ্ডিতদের লেখা তাঁরা পড়তেন। তাঁরা জানতেন এই জগতের সব-কিছুই পরস্পর-পরিবর্তনসাধ্য। তাই যদি হয় তাহলে কেন তামাকে পরিবর্তন করে সোনা করা যাবে না? তাঁরা জানতেন পৃথিবীর গহ্বরে সোনা প্রস্তুত হতে সময় লাগে বহু বহু যুগ। তাহলে মানুষের পক্ষে কি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই কাজটি করা সম্ভব নয়? আরব আলকেমিস্টরা এই প্রশ্নের জবাব খুঁজেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার পণ্ডিতদের প্যাপিরাস কুণ্ডলির মধ্যে।

প্রবাদ আছে এই পুস্তকগুলি লিখেছিলেন নশ্বর মানুষ নয়—মিশরীয় দেবতা টট্‌। এই দেবতাকে গ্রীকরা বলত হারমিস। আর হারমিস নামটি থেকে এই পুস্তক-গুলির নাম হয়েছিল 'হারমিসতত্ত্ব'। একমাত্র ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা ছাড়া আর সকলের কাছে এই সমস্ত পুস্তক নিষিদ্ধ ছিল।

এমনি একটি পুস্তক থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে : "যেহেতু সবকিছু এসেছে একই উৎস থেকে, অতএব সবকিছুর জন্ম একই জিনিস থেকে। তার পিতা—সূর্য, তার মাতা—চন্দ্র। বায়ু তাকে বহন করে নিয়ে যায় মাতৃগর্ভে। পৃথিবী তার ধাত্রী। পার্থিব যখন আগ্নেয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তখন পাওয়া যায় পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত জিনিসটি..."

সাধারণ অজ্ঞান মানুষেরা এই ধাঁধার অর্থ উদ্ধার করার জন্য বৃথাই মাথা ঘামাত। কিন্তু ওয়াকিবহালেরা জানত, অর্থ কী। সূর্য হচ্ছে সোনা, চন্দ্র—রুপো, শনি—সীসে, বুধ—পারদ।

আলেকজান্দ্রিয়ার আলকেমিস্টদের পরীক্ষাকার্যগুলি পুনরনুষ্ঠিত করলেন আরব

পণ্ডিতরা। সোনা—অর্থাৎ, সূর্য—লাভ করার জন্য তাঁরা নানা প্রক্রিয়ার সাহায্য নিলেন—গলন, দহন, পাতন, ইত্যাদি অনেক কিছুর। তামাকে তাঁরা গলাতে চেষ্টা করলেন অন্য নানা পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পেয়ে গেলেন সাদাটে ধরনের পদার্থ, কেউ কেউ হলদেটে ধরনের। তাই দেখে তাঁদের ধারণা হলো, তামাকে রূপো বা ধাতুর রাজা সোনায় রূপান্তরিত করতে তাঁরা প্রায় সফল হয়ে গিয়েছেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থের জগতে তাঁরা এক অলীকের সন্ধানে ধাওয়া করেছিলেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে বহু বাস্তব সম্পদও তাঁদের হাতে এসে যায়। তাঁরা আবিষ্কার করেন নাইট্রস অক্‌সাইড ও সালফিউরিক অ্যাসিড। অবগত হন ধাতু বিগলন ও লবণ লাভের উপায়। জানতে পারেন গন্ধক পারদ ও আর্সেনিকের বৈশিষ্ট্য।

আবছা আধা-আলোকিত গবেষণাগারে, দু-মুখো বোতল ও লম্বা গলাওলা বকযন্ত্র ও আরো সব অদ্ভুত চেহারার বকযন্ত্রের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল প্রকৃত এক বিজ্ঞান—রসায়ন।

খালি চোখে দেখা যায় না এমন সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকা খুশিমতো নাড়াচাড়া করার বিদ্যা আয়ত্ত করছিল মানুষ। এই সমস্ত কণিকার চলন-পথে পেতে রাখছিল কৌশলী ফাঁদ, যার নাম ফিল্‌টার বা ছাঁকুনি। কুণ্ডলী-পাকানো নলের অতি-কুটিল পথ বরাবর সেই কণিকাদের পিছু ধাওয়া করত—শিকারের জন্তুর পিছনে ধাওয়া করার মতো। এক পদার্থের মধ্যে গলিত অবস্থায় থাকা অন্য পদার্থের কণিকাগুলোকে দ্রবণ থেকে বার করে আনত এবং পাত্রের নিচে পেলব স্ফটিকের আকারে নিপতিত হতে দিত।

মনে হতো, আর একটু, আর সামান্য একটু হলেই...

কিন্তু পুবেও আলো নিবতে শুরু করেছিল। চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল শত্রুভাবাপন্ন যাযাবর-দল—তুর্কী সেলজুকরা ও খৃস্টান নাইটরা। চারদিক হয়ে উঠছিল অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকার। নগরের উদ্যানগুলি ক্রমেই বেশি-বেশি আলোকিত হয়ে উঠছিল বই-পোড়ানোর উৎসবের শিখায়।

কিন্তু তাই বলে বিজ্ঞানকে পোড়ানো যায় না। বাগদাদ থেকে বিতাড়িত হয়ে বিজ্ঞান আশ্রয় নিল স্পেনের করদোভায়। বিজ্ঞান সবসময়েই ঘর বাঁধে সেই জায়গায় যেখানে মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করে। করদোভার বণিকরা সেই দিনের কথা ভোলেনি যেদিন খলিফা একটি পাণ্ডুলিপির জন্য এক-হাজার স্বর্ণ-দিনার দিয়েছিলেন।

দূর বাগদাদে আল গাজালি নামে একজন সাধক লিখছিলেন জ্ঞানের দম্ভ ও যুক্তির অসারতা সম্পর্কে। কিন্তু করদোভায় ছিলেন, সেই একই দ্বাদশ শতাব্দীতে, আভেরোয়েস নামে একজন দার্শনিক—আরিস্টটলের শিষ্য। তিনি সাহসের সঙ্গে বিজ্ঞানের পক্ষ নিয়ে কথা বললেন। প্রমাণ করলেন যে মানুষের সবচেয়ে বড়ো সুখ অজানার কাছে নতি-স্বীকারে নয়, সবকিছুকে জানবার চেষ্টায় গর্ববোধ করার মধ্যে।

তিনি বললেন মানবিক বোধির অখণ্ডতা সম্পর্কে। মানুষ মরে, কিন্তু মানবজাতি বেঁচে থাকে। একজন ব্যক্তিমানুষ বেঁচে থাকে খুবই কম সময়। সে কি করে আশা করতে পারে যে সেই অল্প সময়ের মধ্যে সে অনেক কিছু শিখে নিতে পারবে? কিন্তু মানবজাতি অবিনশ্বর, তার বোধি চিরস্থায়ী। বোধির কাছে কোনো কিছুই অলভ্য নয়। বোধির না আছে সীমানা, না সীমাবদ্ধতা।

মানুষ অনুভব করতে শুরু করল, সে হচ্ছে মহাসাগরে একটি ফোঁটার মতো। অনুভব করতে শুরু করল, সে অতি বিরাট, অতি বিশিষ্ট।

একসময়ে মানুষের চেতনা আবদ্ধ হয়েছিল "আমিত্বের" সংকুচিত ক্ষুদ্র প্রাচীরের

মধ্যে। মিশরীয়রা বলল "জনগণ" এবং ভাবত একমাত্র মিশরীয়রাই মানুষ। মিশরীয় যে নয় সে মানুষ নয়।

এবারে মানুষ এই সংকীর্ণ "আমিত্বের" প্রাচীর সম্প্রসারিত করতে শুরু করল। এই সত্য সম্পর্কে অবহিত হতে লাগল যে সকল মানুষই মানুষ এবং সব মানুষ মিলিয়ে মনুষ্যজাতি। আভেরোয়েস বুঝেছিলেন যে তিনি শুধু করদোভার অধিবাসী স্পেন-দেশীয় আরব নন, তিনি একজন মানুষ...

শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল স্পেনদেশীয় আরবদের—মুরদের—শাসন। তাদের স্পেন থেকে তাড়িয়ে দিল খৃস্টান নাইটরা। প্রাচীন বিজ্ঞান আবার বিপদে পড়ল, প্রায় লোপ পেতে বসল। গ্রীক দার্শনিকদের পুস্তকগুলি অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তারা আবার রক্ষাকর্তা পেয়ে গেল। স্পেনে, দক্ষিণ ফ্রান্স ও ইতালিতে। ইহুদী চিকিৎসকরা, জ্যোতির্বিদরা ও দার্শনিকরা আরবী থেকে হিব্রু ও লাতিনে অনুবাদ করছিলেন আরিস্টটল ও আভেরোয়েস, ইউক্লিড ও টলেমির রচনাবলী।

ইহুদী পণ্ডিত যুদা ইব্‌ন টিবনকে বলা হতো "অনুবাদকদের জনক"। তাঁর ছেলে, চিকিৎসক ও দার্শনিক স্যামুয়েল অনুবাদ করেছিলেন আরিস্টটলের 'আবহতত্ত্ব'। তাঁর নাতি, চিকিৎসক ও লেখক মোজেস অনুবাদ করেছিলেন ইউক্লিডের "ভূত" (এলিমেণ্টস) এবং আভেরোয়েস ও তাজিক মনীষী আভিসেনার (ইব্‌ন সেনা) রচনাবলী। তাঁর নাতির ছেলে জ্যাকব, যাঁকে খৃস্টানরা বলত ডন প্রফিয়ট টিবন, তিনি ফ্রান্সের ম'পেইয়ের মেডিকেল বিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে বক্তৃতা করতেন এবং একই সঙ্গে ইউক্লিড অনুবাদ করেছিলেন।

অনুবাদকদের এই পরিবারের কাছে বইয়ের চেয়ে প্রিয় আর কিছু ছিল না। প্রাচীন কোনো পাণ্ডুলিপির খোঁজ করার প্রয়োজন যখন দেখা দিত তখন তাঁরা দূরতম যাত্রায় বেরিয়ে পড়ার জন্যও প্রস্তুত থাকতেন। মোজেস ইব্‌ন টিবন জলপথে মার্সাই থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়েছিলেন, কারণ আলেকজান্দ্রিয়ায় তখনো প্যাপিরাস পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যাত্রাপথেও সময় নষ্ট করেননি—দার্শনিক শব্দসমূহের একটি অভিধান রচনা করেছিলেন।

পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা যুদা ইবন্ টিবন একটি উইল করে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে দিয়েছিলেন সোনার তাল নয়—পুস্তক।

তিনি লিখেছেন, "আমি একটি বিশাল গ্রন্থাগার সংগ্রহ করেছি। এই গ্রন্থাগারটি ঠিকভাবে রেখো। প্রত্যেকটি আলমারির পুস্তকগুলির একটি তালিকা তৈরি কোরো এবং প্রত্যেকটি পুস্তক ঠিক জায়গাটিতে রেখো। পুস্তকগুলির রক্ষণাবেক্ষণ কোরো—সিলিং থেকে পড়া জল থেকে, ইঁদুর থেকে, সমস্ত রকমের অনিষ্ট থেকে। কেননা, এই পুস্তকগুলিই তোমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু। একজন মনীষীর চোখে পুস্তকের আলমারি দিয়ে গড়া একটি গ্রন্থাগার সুন্দরতম বাগানের চেয়েও অধিক আনন্দদায়ক।"

ইব্‌ন টিবনের গ্রন্থাগারের কী হয়েছে আমরা জানি না। গ্রন্থাগারের মালিক চেয়েছিলেন, অতি যত্নের সঙ্গে যেন পুস্তকগুলি রক্ষা করা হয়, তবুও সম্ভবত অনেক আগেই পুস্তকগুলির অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। কিন্তু টিবনের মতো মানুষেরা তাঁদের কাজ সম্পন্ন করে গিয়েছেন। তাঁরা রক্ষা করেছেন প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার এবং ভবিষ্যতের জন্য তা তুলে দিয়ে গিয়েছেন।

প্যাপিরাস থেকে তুলে আনা হলো পার্চমেণ্টে, গ্রীক থেকে আরবীতে, আরবী থেকে

হিব্রুতে, হিব্রু থেকে লাতিনে—এমনিভাবে বিজ্ঞান একটা ঘুরপথ দিয়ে পশ্চিমে ফিরে এল। কখনো কখনো এমনও ঘটেছে পশ্চিমে গ্রীক মনীষীদের ধরে নেওয়া হয়েছে আরব হিসেবে। যেমন, বলা চলে, অস্ট্রিয়ায় কৃত অনুবাদে আর্কিমিডিসকে বলা হয়েছে 'আরাখিমেহিদ'। কেননা, আর্কিমিডিসের পুস্তকগুলি ইওরোপে এসেছে সরাসরি গ্রীস থেকে নয়, আরবদেশের মধ্যে দিয়ে অনেকটা ঘুরপথে।

বিজ্ঞান ছিল মানুষের হাতে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস, সেটিকে তারা হাত থেকে হাতে চালান করে দিয়ে এমনিভাবে বাঁচিয়েছিল।

৩. পুবে যখন এইসব ঘটনা ঘটছিল তখন পশ্চিমে কী হচ্ছিল?

পশ্চিমেও মানুষ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেনি। প্রতি শতাব্দীতে সে আরও দ্রুত অগ্রসর হয়েছে।

একটা সময় ছিল যখন জায়গিরকে মনে হতো অরণ্যের মাঝখানে ছোট একটি দ্বীপের মতো। এই সমস্ত ছোট ছোট দ্বীপে মানুষ বাস করত রবিনসন ক্রুসোর মতো। জমিদারদের জন্য এবং নিজেদের জন্য সবকিছু করে দিত ভূমিদাসরা।

ভূমিদাস কিন্তু ক্রীতদাস নয়, যে ক্রীতদাস সমস্ত রকমে চেষ্টা করে চলে কাজ থেকে বেরিয়ে আসতে। ভূমিদাস কঠোর ও প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে। অরণ্যের গাছ কাটে, জলাভূমির জল নিকেশ করে, অনাবাদী জমিকে আবাদী করে তোলে। তার এই একটানা শ্রমের ফলও সে পায়। শস্যের ফলন হয়ে ওঠে প্রচুর থেকে আরো প্রচুর। অবশ্য একথা সত্য যে ভূমিদাস নিজে পায় যা সে ফলন করে তার অতি সামান্য অংশ মাত্র। বাস করে হীনাবস্থার ছোট এক কুঁড়েঘরে, তার ভিতরটা ধোঁয়ায় কালো, তার ছাদ খড়ে ছাওয়া।

অন্য দিকে, ভূমধিকারীর দুর্গে সবসময়েই পাতা থাকত একটি ভরপুর টেবিল। কেননা ভূম্যধিকারী ছিলেন খুবই অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি চাইতেন অতিথিদের পেট খাদ্য দিয়ে ঠেসে দিতে এবং মাতাল না হওয়া পর্যন্ত পানীয় দিয়ে ভরিয়ে দিতে। ভৃত্যরাও ভালোভাবেই থাকত, আর দুর্গের মধ্যে কত-যে ভৃত্য ছিল! প্রথমত ছিল বহুসংখ্যক ভূমিহীন নাইট ও সশস্ত্র যোদ্ধা, তারপরে ছিল নফর, সহিস, পাচক, মদ্যভাণ্ডারের রক্ষী, সারমেয় রক্ষী, মালবাহক, এবং বিশেষ কোনো কর্মভার ছাড়াই পুরোদস্তুর একদল গৃহভৃত্য।

বিশাল টেবিলে কেউ কেউ খেত। অন্যরা পরিবেশন করত।

সেখানে আসত ভেড়ার আস্ত আস্ত রাঙ ও টেংরি, মোটা মোটা হাঁস, মাছ বা মাংসের বড়ো বড়ো টুকরো। সেগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যেত, পরিবেশন করে ঘুরে দাঁড়াবার আগেই। সেগুলো অবশ্যই সুস্বাদু হতো, তাকে সুগন্ধী করে তোলা হতো গোলমরিচ লবঙ্গ ও আদা মিশিয়ে। আমদানী করে আনা এই সমস্ত মশলা লোকে এমনকি সুরার সঙ্গে মেশাত। যার পেট ভরে গিয়েছে তাকেও এই সমস্ত মশলা দেওয়া খাবার খাইয়ে যাওয়া ও পান করিয়ে যাওয়া চলত।

কারা তাদের খাওয়াত? ভূমিদাসরা।

কারা তাদের পোশাক যোগান দিত?

আগেকার কালে একটা সময় ছিল যখন ভূম্যধিকারী ও তাঁর স্ত্রী ঘরে বোনা কাপড়ের

পোশাক পরতেন। এখন ভূম্যধিকারী পরেন ভেলভেটের পিরাণ আর তাঁর স্ত্রী পরেন কালো আখর দেওয়া সিল্কের আলখাল্লা।

এই সমস্ত পোশাক কোত্থেকে আসত?

আসত নগরের মেলা থেকে। এই সমস্ত সিল্ক ও ভেলভেট, মুক্তো ও মহামূল্য মণি নিয়ে আসা হতো দূরের দেশ থেকে আর তার জন্য দাম দিতে হতো ঝনঝনে মুদ্রা দিয়ে।

ভূম্যধিকারী এই টাকা পেতেন কোত্থেকে?

পেতেন—সমস্ত কিছু যেখান থেকে সেখান থেকে, ভূমিদাসদের কালো হয়ে যাওয়া ও খড়ে ছাওয়া কুঁড়েগুলো থেকে। ভূমিদাসরা আগে কর দিত সামগ্রীতে, এখন নগদ অর্থে। ঠিক সময়ে দিতে হতো এই টাকা। সেজন্য যদি তাদের উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হতো, শেষ গোরুটি বিক্রি করতে হতো, কোনো ছুতোর বা মুচী বা এমনি অন্য কোনো জায়গায় কাজ নিতে হতো—তবুও।

প্রভুর টাকার খাঁই কখনো মিটত না। যখন তিনি কোনো অভিযানের জন্য তৈরি হচ্ছেন তখনো তাঁর টাকা চাই তলোয়ার শিরস্ত্রাণ ও অন্যান্য জিনিসপত্র কেনবার জন্য। যখন তিনি ঘরের মধ্যেই একটা ভোজের আয়োজন করছেন তখনো তাঁর টাকা চাই বিলাসদ্রব্য আমদানী করার জন্য। দুর্গ থেকে আরো ঘন ঘন শহরে লোক ছুটত সুরার নতুন যোগান আনার জন্য, বাতির মোম আনার জন্য, সিল্ক ও ভেলভেট আনার জন্য।...

আর গত কয়েক দশকের মধ্যে শহরের কী বাড়বৃদ্ধিই না হয়েছে। শহর আগে ছিল খুঁটির বেড়া দিয়ে ঘেরা একটুকরো গ্রামেরই মতো, ভিতরে থাকত নোংরা ছোট একটা চক, আর গির্জা ও বাজারের এলাকা ঘিরে কয়েকটা ছড়ানো ছিটানো কুঁড়েঘর। কিন্তু এখন কী সব বাড়িই না তৈরি হয়েছে বণিকদের জন্য, তাঁতীদের জন্য, অস্ত্র-নির্মাণকারীদের জন্য। আর তারপরেও রয়েছে নগরসভার সদস্যদের জন্য সুন্দর সুন্দর সব বাড়ি, সোনার পাত দিয়ে মোড়া গয়নার সিন্দুকের মতো। কার ঐশ্বর্য বেশি তাই নিয়ে বাড়িগুলো যেন পরস্পর পাল্লা দিচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন বণিককে কাঁধে ভারী বাক্স নিয়ে রাজ্য থেকে রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে হতো। সেলাই করার লোকজন নিয়ে ভ্রাম্যমাণ দরজিকে ঘুরে বেড়াতে হতো এক দুর্গ থেকে আরেক দুর্গে। ইস্টারের পরব উপলক্ষে বা কোনো একটা বিয়ের প্রস্তুতির জন্য সে দুই বা তিনমাস থেকে যেত এবং ছেলে থেকে বুড়ো পর্যন্ত প্রত্যেকের জন্য পোশাক তৈরি করে দিত।

কিন্তু এখন বণিকরা, তাঁতীরা, দরজিরা ও তাদের আত্মীয়রা সবাই শহরে বসতি করেছে। অন্যান্য কিছু কিছু এলাকাও আছে যেখানে পুরোপুরি বসতি করে আছে কুমোররা, রঞ্জনকারীরা কিংবা অন্যান্য কারিগররা। একজন কারিগরের বাপ হয়তো কোনো এক জমিদারিতে ছুতোর হয়ে আছে, কিন্তু কারিগর নিজে এখন আর ভূমিদাস নয়। এমনকি একজন ছুতোরও নয়। সে এখন সঙ্ঘের সর্দার, একজন দক্ষ কাঠ-খোদাইকর। তার পরনে নতুন কাপড়ের পোশাক, পায়ে সুন্দর ছোট আঙটা লাগানো বুটজুতো। কোমরবন্ধনীতে গোঁজা ছুরি। ছুরির খাপ তামার নয়—রুপোর।

আর বণিক যখন ঘোড়ার পিঠে চেপে বেরোয়, সে এক দেখার মতো দৃশ্য। তার মাথায় লম্বা ফারের টুপি, গায়ে ওভারকোট! কারও কাছে একটি পয়সাও তার ধার আছে, এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। সবকিছুর জন্য সে নগদ দাম দেয়।

কৃষকরা ছাড়া আর সবাই বড়ো চমৎকার আছে।

দেশে যদি যুদ্ধ লাগে তাহলে শহরের লোকরা সদর দরজা বন্ধ করে দেয় এবং

শক্তপোক্ত দেয়ালের আড়ালে নিরাপদ থাকে। যোদ্ধারা দুর্গের তোরণ আটকে দেয়। কিন্তু গরিব কৃষকের কোনো দেওয়াল নেই, যা তাকে রক্ষা করবে। প্রতিটি সশস্ত্র বাহিনী তার ক্ষেত মাড়িয়ে যায়, তার কুঁড়েতে আগুন লাগায়, তার গোরুভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

প্রভুরা যুদ্ধ লাগায়, কৃষকরা তার ফল ভোগ করে। ক্ষেতগুলো আগাছায় ভরে যায়। শরৎকালে যখন ফসল কাটার সময় আসে তখন যতোটা বুনেছিল তার ছ-ভাগের একভাগ মাত্র তুলতে পারে। বাচ্চা ছেলে যখন মায়ের কাছে একটুকরো রুটি চায়, মা তাকে বলে, "প্রভু আমাদের রুটি নিয়ে নিয়েছেন।" যখন সেই ছেলে তার বাপকে সাহায্য করতে শুরু করে এবং এতই দুর্বল হয় যে লাঙল ঠেলার সামর্থ্য তার থাকে না, তখন তার বাপ তাকে বলে, "প্রভু আমাদের হুকুম দিয়েছেন আমরা যেন লাঙল চালাই।" প্রতি রবিবার গির্জার যাজক লোককে উপদেশ দেন, তারা যেন ধৈর্যশীল হয়। স্বয়ং যীশুখৃস্টই তো ছিলেন ধৈর্যশীল—তাই না?

সতত ধৈর্য এবং আরো ধৈর্য। কিন্তু সবকিছু সহ্য করবার মতো ধৈর্য কোথা থেকে পাবে কৃষক? আর কিসের জন্যই বা ধৈর্য!

প্রত্যেকেই আশা করে, এমন দিন থাকবে না, তার ছেলেমেয়েদের অবস্থা আরো ভালো হবে। কিন্তু কবরখানায়, সাদা ক্রুসের সংখ্যা বেড়েই চলে। মাটিতে পাশাপাশি শুয়ে থাকে কোনো একজনের নাতিনাতনীরা। অবস্থা ভালো হবার কোনো লক্ষণই নেই।

এই অবস্থায় কৃষকের সামনে একটিমাত্র পথই খোলা থাকে—রাত্রিবেলা দেশের ক্ষেত-খামার বাড়িঘর ফেলে রেখে চলে যাওয়া, অন্ধকারে ডুবে থাকা গ্রামের দিকে একবারও ফিরে না তাকানো।

কিন্তু কোথায় যাবে সে? যাবে শহরে।

কথাতেই তো আছে: "শহরের বাতাস মানুষকে স্বাধীন করে দেয়!"

জমি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার বিপদ অনেক। ভূমিদাস যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে তাকে ঠেলে দেওয়া হতে পারে অন্ধকার কারাগারে। কেননা, বোঝাই তো যাচ্ছে, সে হচ্ছে ভূস্বামীর সম্পত্তিরই অংশ।

এই অবস্থায় জীবন কাটানো এবং নিষ্পেষণ ও নির্যাতন সহ্য করা ক্রমেই শক্ত থেকে আরো বেশি শক্ত হয়ে ওঠে। ধৈর্যেরও শেষ সীমায় পৌঁছতে হয়।

ভূস্বামীদের দুর্গগুলি পুড়তে থাকে, তাতে আগুন লাগায় বিদ্রোহী কৃষকরা। শহর-গুলি ঢেকে যায় কালো ধোঁয়ায়...

যুদ্ধের পিছু পিছু আসে ভুখা, বিধ্বস্ত বিনষ্ট দেশগাঁয়ের ওপরে চেপে বসে—ইতালি থেকে দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রোভেন্স পর্যন্ত, প্রোভেন্স থেকে বারগান্ডি পর্যন্ত। এক কুন্‌কে শস্যের দাম হয় একমুঠো স্বর্ণমুদ্রার সমান।

দুর্ভিক্ষের পিছু পিছু আসে মড়ক। গ্রাম থেকে গ্রামে মৃত্যু হানা দিতে থাকে। কারখানাগুলো ভরে যায়। গ্রামে জীবিত মানুষের সংখ্যা খুবই কমে যেতে থাকে। অনেকেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে জগৎসংসার শেষ হয়ে যাবার দিনটির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। অন্যরা নিজেদের ভাগ্যকে অভিশাপ দিয়ে বলে যে জগৎসংসার নিশ্চয়ই কোনো দুষ্ট আত্মার সৃষ্টি—তা যদি না হতো তাহলে জগৎসংসারের এমন দুর্দশা হতো না।

পৃথিবীর ওপরে নেমে আসে ধর্ম-বিরোধিতা। গির্জা থেকে আগুন ও তলোয়ার দিয়ে এই ধর্ম-বিরোধিতাকে উপড়ে দেবার চেষ্টা চলে। কিন্তু চরম হতাশাকে উপড়ে দেওয়াটা এত সহজ নয়।

পরিত্রাণের পথ কী?

লোকে বুঝতে পারে, ঘরে বসে থাকলে কোনো দিক থেকেই কোনো আশা নেই। কাজেই পুরনো ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া উদ্বাস্তুদের ভিড়ে রাস্তা ভরে যায়। চলনদার কৃষকরা ঘরে-তৈরি তলোয়ার ও বর্শা দিয়ে নিজেদের অস্ত্রসজ্জিত করে তোলে। তাদের পাশ দিয়ে ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে যায় কাঁধে ক্রসচিহ্ন আঁকা, ঝকমকে বর্ম পরা যোদ্ধারা। দু-চাকার ঠেলাগাড়িতে কৃষকদের শিশুরা কেঁদে চলে, তাদের কান্নার সঙ্গে মিশে যায় গোরুভেড়ার ডাক, ঘোড়ার হ্রেষা। যে যতোটা পারে মালপত্র টেনে নিয়ে চলেছে—যেন কোনোকালে ঘরে ফেরার ইচ্ছা কারও নেই।

ভূস্বামীরা চলেছে তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। সঙ্গে নিয়েছে তাদের ভূমিদাসদের ও ভৃত্যদের, তাদের বয়স্যদের ও গায়কদের, এমন কি তাদের বাজপাখির পালকদেরও যাদের হাতের ওপরে বাজপাখি বসে আছে।

সারাক্ষণ গুঞ্জন শোনা যায় হাটেবাজারে, পারাণি নৌকোয় ও দোকানপাটে। সর্বত্র চলেছে ফলাও কারবার, এমনটি আগে কখনো হয়নি। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময়ে অনেকেই বাড়তি জিনিসপত্র বিক্রি করে এসেছিল। বণিকদের পেটিকাতে টাকার স্রোত নামতে থাকে। শস্যাগারের ভারী পাল্লা তারা খুলে দেয়, শস্যাগারের মধ্যে যে শস্য লুকিয়ে রেখেছিল গাড়িবোঝাই করে তা নিয়ে যায় বাজারে, এই আশায় যে চড়া দামে বিক্রি করে মোটা মুনাফা করবে।

রাস্তায় এমনকি লম্বা সারি দিয়ে চলেছে দলে দলে শিশুও।

কোথায় যাচ্ছে সবাই? কিসের আশায়?

আশা করছে অলৌকিকের। তারা চলেছে পুবের দিকে, সুরাসেনদের* হাত থেকে পুণ্য-শহর প্যালেস্টাইন দখল করতে, সেই সঙ্গে পুবের বিপুল সম্পদও।

---

* প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার মুসলমানদের বলা হত সুরাসেন—অ

চতুর্থ অধ্যায়

১. জগৎ পুনরায় ছড়িয়ে গেল

ক্রুসেডাররা* প্যালেস্টাইন জয় করল। প্রতিষ্ঠা করল জেরুজালেম রাজ্য। পাশাপাশি বাস করতে লাগল ফরাসী, ইংরেজ, ইতালীয়, জার্মান, সিরিয়ান, গ্রীক ও আর্মেনিয়ানরা। জলপাইকুঞ্জ ও আঙুরক্ষেত্র আড়াল করে দাঁড়াল যোদ্ধাদের দুর্গগুলির সাঁজোয়া দেয়াল ও গম্বুজ। জেরুজালেমের রাজার দরবারে দেখতে পাওয়া যেত উদ্ভট পদবীওলা ভূস্বামীদের। যেমন, গ্যালিলির প্রিন্স, জাফার কাউণ্ট, সিডোনিয়ার লর্ড। এই সব ভূস্বামীর বিরাট ভূ-সম্পত্তি ছিল, সিরিয়ার ভূমিদাসরা সেখানে কাজ করত।

ফিনিসীয় নগর টাইরের কারিগররা তখনো বেগুনী রঙ সংগ্রহ করত শামুকের খোলা থেকে আর কাঁচে ফুঁ দিয়ে তৈরি করত মূল্যবান বাটি—হাজার বছর আগেও যেমন তারা করত। আর টাইরের রাস্তায় দেখা ও শোনা যেত নানা ধরনের মুখ ও নাম ও ভাষার অদ্ভুত এক মিশ্রণ। অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ ছিল ভেনিসীয়। তাদের ছিল নিজস্ব বাসের এলাকা, নিজস্ব বাজার, নিজস্ব গির্জা, নিজস্ব পণ্যাগার, নিজস্ব স্নানাগার ও রুটিশালা।

ভেনিসীয়, ফরাসী ও ইংরেজরা চাইত পূর্বদিকে বাস করতে। প্রতিবেশীদের থেকে দেয়াল দিয়ে আড়াল তুলে—দেশে থাকতে যেমনটি তারা করত। কিন্তু এখানে কথাটা বলা যতো সহজ, করা ততো নয়। সুরাসেনদের—ওই অবিশ্বাসীদের—তারা ঘৃণা করত। তবুও তারা শান্তিতেই বাস করত তাদের পাশাপাশি, মুসলমান সিরীয় মেয়েদের বিয়ে করত। স্থানীয় ভাষা থেকে অনেক কিছু শব্দ এসে গেল তাদের কথাবার্তার মধ্যে—যেমন, কাফ্‌তান, মুসলিম ইত্যাদি। খৃস্টান লর্ডরা যে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করত তার ওপরে থাকত কোরাণ থেকে উদ্ধৃতি। এটা তারা করত সুরাসেন বেজাতদের মুসলমানদের সঙ্গে কারবার করবার জন্য।

ইতালীয় পোত মিশরের সুলতানের জন্য নিয়ে এল ক্রীতদাস ও অস্ত্র। সুলতান ছিলেন খৃস্টধর্মের শত্রু—তা সত্ত্বেও। সুরাসেনদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে রোমের পোপ কড়া হুকুমনামা জারী করলেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো কাজ হলো না। সুগন্ধী, রঙ, সিল্‌ক, সুরা ও চিনি বোঝাই হয়ে শত শত জাহাজ সমুদ্র-পথে সিরিয়া থেকে জেনোয়ায় যেতে লাগল—তিনি তা বন্ধ করতে পারলেন না। গাছের

---

*মুসলমানদের অধিকার থেকে পুণ্যভূমি উদ্ধার করার জন্য খৃস্টানদের সামরিক অভিযানকে বলা হয় ক্রুসেড, আর এই অভিযানে যোগদানকারীদের ক্রুসেডার। ১১শ, ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীতে এ-ধরনের অভিযান হয়েছিল।—অ

ছালের একটা কুণ্ডলীর ক্ষমতা কি, সিরিয়ার মরুভূমির মধ্যে দিয়ে পথ তৈরি করে চলা দীর্ঘ আঁকাবাঁকা যাত্রিদলের গতি রোধ করে! পূবের সামগ্রী পাবার জন্য যে জার্মান বণিকরা আল্‌প্‌স ডিঙিয়ে ইতালির দিকে যাত্রা করেছিল, কেমন করে তাদের ফিরিয়ে আনা যায়!

ইতিহাসের বিরাট দোলনটি দু-বার দক্ষিণে ও বামে দুলেছে। অষ্টম শতাব্দীতে আরবরা এসেছিল পশ্চিমে একেবারে পীরেনিজ পর্যন্ত। একাদশ শতাব্দীতে ক্রুসেডাররা গিয়েছিল পূবে জেরুজালেম পর্যন্ত।

এই সময়ের মধ্যে কতই না পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে! যে-সব জাতিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল সমুদ্র ও মরুভূমি, আচার-ব্যবহার ও ধর্ম—তারা কাছাকাছি এসেছে। একটা সময় ছিল যখন ফরাসী ও জার্মান যোদ্ধারা নিজেদের দুর্গে আবদ্ধ হয়ে থাকত—শীতকালে গুহার মধ্যে মৃতপ্রায় অবস্থায় থাকা ভালুকের মতো। সেই সময় অনেক আগেই চলে গিয়েছে।

জগৎ সম্পর্কে, অন্যান্য দেশ সম্পর্কে কী তারা জেনেছিল?

তারা শুনেছিল জেরুজালেম নামে একটি নগর আছে আর সেই নগরটির অবস্থান জগতের ঠিক মাঝখানটিতে। বৃহৎ নগর আছে আরো দুটি—রোম ও কন্‌স্টান্‌টিনোপ্‌ল। কিন্তু ওই সমস্ত নগর সম্পর্কে এবং ওই সমস্ত নগরে যারা বাস করে তাদের সম্পর্কে তাদের ধারণা কতই না আবছা ছিল। এবং তখনো তারা বিশ্বাস করত, জগতের একেবারে কিনারে, কোথাও না কোথাও, এমন দেশ আছে যেখানে চন্দ্র নেই, সূর্য নেই, যেখানকার মানুষদের মাথায় আছে শিঙ আর হাতে আছে সিংহের মতো থাবা।

কখনো কখনো দুর্গে এসে হাজির হয় টহলদার বণিক কিংবা তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ানো সাধু। যা কিছু তারা দেখেছে বা শুনেছে সে সম্পর্কে তারা বলে আর বলতে গিয়ে খানিকটা রঙও চড়ায়। গল্পের ভাগটা আরও বেশি পাওয়া যায় চারণদের ও বাজিকরদের গানে। যোদ্ধারা ভাবত, দেশ থেকে তাদের একশো মাইলও যেতে হবে না, তার আগেই তারা পৌঁছে যাবে সেইসব রূপকথার দেশে যেখানে বাস করে দৈত্যরা, যেখানে পর্যটকদের আক্রমণ করে ড্রাগনরা।

এখন সেই যোদ্ধারা উপস্থিত হয়েছে জেরুজালেমে, অ্যান্টিয়কে, কনস্টান্টিনোপলে। এখন তারা নিজেদের চোখে দেখছে বাইজান্‌টিয়ামের সুন্দর সুন্দর গির্জা, পূবের প্রাসাদ ও মসজিদ। গ্রীসে ও সিরিয়ায় তারা যা দেখছে তার তুলনায় তাদের দেশের জীবনকে মনে হতে থাকে দারুণ অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিত।

সেখানে জমিটাই এমন যেন মহান অতীতের স্মৃতি বজায় রাখতে পেরেছে। সেখানে আরব পণ্ডিতরা এখনো পাঠ করে চলেছেন আরিস্টটল ও টলেমি। সেখানে ভূগোল-বিদরা বই লিখছেন চীন ও ভারতবর্ষের আশ্চর্য সব বিষয় নিয়ে। যেখানেই তাকানো যাক, দেখা যায় প্রাচীন স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ। অতীতের ঐতিহ্য এখনো বেঁচে আছে। ফিনিসীয় নগর টাইরেতে একজন খৃস্টান বিশপ কোরাণ ও আরব ঐতিহাসিকদের রচনাবলী পাঠ করলেন। তিনি একটি বই লিখলেন। সেই বইয়ে ইসলাম সম্পর্কে কিংবা অদ্ভুত সব রীতি ও বিশ্বাস সম্পর্কে কোনো ঘৃণার কথা ছিল না।

যুদ্ধ ও সংঘর্ষের মধ্যেই গড়ে উঠছিল ও পরিণতি লাভ করছিল মানুষের সাংস্কৃতিক ঐক্য।

খলিফাতন্ত্র লোপ পেল। জেরুজালেমের রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেল।

কিন্তু মানুষদের যৌথ শ্রমের ফল ধ্বংস করা এত সহজ নয়। কি পূবে, কি পশ্চিমে,

লক্ষ লক্ষ মানুষ শ্রমে নিযুক্ত আছে। তারা চাষ করছে জমি ও আঙুরের ক্ষেত, ছড়িয়ে দিচ্ছে রেশমকীটের পালন, রোপণ করছে তুঁতগাছ, রঙ তৈরি করছে শামুক থেকে, চাপ দিয়ে বার করছে জলপাইয়ের তেল, নিঙড়ে নিচ্ছে আখ থেকে চিনি, তুলছে তুলো, লোম ছাঁটাই করছে ভেড়ার, ঢালাই করছে লোহা, বুনছে কাপড়।

কি পূবে, কি পশ্চিমে, মানুষের শ্রম থেকে ক্রমেই আরো বেশি বেশি সম্পদ সংগ্রহ করা হচ্ছিল।

পশ্চিমের প্রয়োজন ছিল পূবকে, পূবের প্রয়োজন ছিল পশ্চিমকে। পরস্পরের দিকে তারা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল—সমুদ্র ও মরুভূমি পেরিয়ে, তাদের মধ্যেকার শত্রুতা যে-সব বাধা খাড়া করেছিল তাকে জয় করে। কিন্তু এই শত্রুতা তারপরেও দীর্ঘকাল বজায় ছিল।

একশো-দাঁড়ীর উচ্চাগ্র ইতালীয় বাণিজ্য-জাহাজগুলি ভূমধ্যসাগরে ঘুরে বেড়াত। কোনো সুরাসেন জাহাজ দেখলে পরেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ত তার ওপরে, তাকে দখল করত ও লম্বা আঁকশি দিয়ে কাছে টেনে আনত। সশস্ত্র মানুষেরা নিজেদের জাহাজের পাটাতন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ত শত্রুর জাহাজের পাটাতনের ওপরে। কার পতাকা তোলা হবে জাহাজের ওপরে? জিনোয়েসদের ক্রস? না, সুরাসেনদের ফালিচাঁদ? দু-দলই নিজেদের মনে করত সমুদ্রের প্রভু, আর অন্য সমস্ত জাহাজকে বোম্বেটে।

কিন্তু এই সমস্ত জাহাজ বন্দরে এসে লাগত এবং জাহাজ থেকে বেরিয়ে আসত ঝাঁকে ঝাঁকে বণিক ও তীর্থযাত্রী সাধু। লেভান্তের নগরগুলিতে—আন্তিয়েকে, জাভায়, সীজারিয়ায়—ইওরোপীয় ভাষাগুলি আরো বেশি বেশি শোনা যেত। মসজিদের মিনারের ঠিক পাশেই গির্জার ঘণ্টাঘর সিরিয়ার নীল উত্তপ্ত আকাশ ভেদ করত। আজানের ডাক মিশে যেত ঘণ্টার আওয়াজের সঙ্গে।

এই একই সময়ে মুক্ত জার্মান নগর লুবেক-এ নভ্‌গোরদ বণিকরা যোগ দিত তাদের নিজস্ব রুশ গির্জায়, তাদের পরনে থাকত গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলে থাকা লম্বা ওভারকোট, মাথায় থাকত লম্বা টুপি। এই "অতিথিরা" বিদেশে বাস করত নিজস্ব আচার-আচরণ অনুযায়ী—যেমন তারা থাকত স্বদেশে।

জগৎ ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তরের দিকে এবং দক্ষিণের দিকে।

নভ্‌গোরদের প্রথম মানুষরা তাদের ছোট ছোট নৌকায় নদীপথে পাড়ি দিয়েছিল। নভ্‌গোরদের এই মানুষরা জানত নভ্‌গোরদকে যে গরিব মনে হয় সেটা নিতান্তই মনে হওয়া। তাদের দেশের ঘন জঙ্গলে, গাছ উপত্যকার মধ্যে লুকানো রয়েছে এমন কিছু যা সোনার চেয়েও দামী—কৃষ্ণসার হরিণ ও লোমশ চামড়ার নেউল। নভ্‌গোরদ নগরে বোয়ারদের* গুদামঘরে ও বণিকদের দোকানে থরে থরে এই সমস্ত নরম চামড়া সাজানো রয়েছে। আর সেই সমস্ত চামড়ার পাশেই দেখা যেত ফ্লান্ডার্সের দামী দামী কাপড়ের গাঁটরি।

ফ্রান্স, ইতালি ও জার্মানির বণিকরা ইংলণ্ডের বাজারে আসত। মেলা শুরু হবার উৎসবমুখর দিনটিতে ঠিক সময়ে তাড়াতাড়ি চলে আসত সকলে।

বিশ্বজগৎ আরো ছড়িয়ে পড়ছিল...

---

* বোয়ার—রুশ অভিজাত, পদমর্যাদায় শাসক প্রিন্সের ঠিক নিচে।—অ

ছোট একটি পাহাড়ের পাশে বাজার। বাজারের ওপরে উড়ছে রাজকীয় পতাকা। এই পতাকা বুঝিয়ে দিচ্ছে বাজারটি রাজার রক্ষণাধীন। বুঝিয়ে দিচ্ছে, যে-কেউ রাজ-পথের ওপরে রাজার বণিকদের ওপরে ডাকাতি করবে তাকেই রাজার দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।

পতাকার পাশে বিরাট একটা তাঁবু। এখানে রয়েছে বাজারের আদালত। আদালতকে দেখতে হয় কেউ যেন মাপে বা ওজনে কম না দেয়, মুদ্রা যেন খাঁটি হয় এবং জাল না হয়, সামগ্রী যেন দামের তুলনায় খেলো না হয়। যে-সব অপরাধী রুটি বা সুরার জন্য ন্যায্য দামের চেয়ে তিনগুণ বেশি দাম চেয়ে ধরা পড়েছে তাদের শাস্তি দেবার জন্য এখানে আছে হাত-পা আবদ্ধ করে রাখার হাঁড়িকাঠ।

কাঠের স্টল ও দোকানের ছোট একটি নগরের মতো এই বাজারটি। এখানেও আছে রাস্তা, যেমন থাকে নগরে। কোনো দোকানে বিক্রি হচ্ছে জায়ফল, গোলমরিচ অন্য কোনো দোকানের কারবার বস্ত্র নিয়ে। সেখানে রয়েছে ব্রুগেস, গেণ্ট ও শ্যামপেন থেকে আনা সবুজ ও লাল কাপড়ের প্রকাণ্ড থাক। বণিকরা ভাগ ভাগ করে রয়েছে যেখান থেকে তারা এসেছে সেই স্থান অনুসারে—ফ্লেমিশ, জার্মানের সঙ্গে জার্মান।

কাঠের তৈরি এই নগরের আছে ঘিরে-থাকা দেয়াল, উঁচু উঁচু খুঁটি পুঁতে তৈরি রক্ষাব্যবস্থা ও তোরণ। তোরণে প্রহরী দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে দেখতে হয় কেউ যেন শুল্ক ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে না পারে।

কী হৈ-হট্টগোল! কী গোলমাল ও চেঁচামেচি! ক্রেতারা বারবার দোকানগুলোতে যাতায়াত করছে, দেখছে কোন্ দোকানে সবচেয়ে লাভজনকভাবে কেনাকাটি করা যায়। বাজারে আছে অন্ধরা—স্তোত্র আবৃত্তি করছে, গণৎকাররা—ভাগ্যগণনা করছে, দন্ত-চিকিৎসকরা—দাঁত টেনে তুলছে, নাপিতরা—দাড়ি কামাচ্ছে, ভাঁড়রা—কায়দা-কেরামতি দেখাচ্ছে। যে যা-খুশি করে চলেছে—পান করছে, খাচ্ছে, গান গাইছে, লড়াই করছে, নাচছে।

পাশের এলাকার দুর্গ থেকে জমিদার এসেছে বাজারে, আধা-মাতাল অবস্থায় বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যতোই কেনাকাটি করছে ততোই হাল্কা হয়ে যাচ্ছে তার টাকার থলি। ভূমিদাসদের কাছ থেকে যে টাকা সে পেয়েছিল তা কিছুক্ষণের মধ্যেই শরৎকালের পাতার মতো মিলিয়ে গেল।

বাজারের প্রলোভন থেকে প্রাচীন মানুষরা তখনো পর্যন্ত নিজেদের সরিয়ে রাখত। কিন্তু নবীনরা কদাচ নয়। বাপেরা একটি একটি করে পয়সা জমিয়ে যা-কিছু সঞ্চয় করতে পেরেছিল, তাদের তরলমতি সন্তানরা সরেস কাপড় কিনে ও ফুর্তি করে কয়েক দিনের মধ্যেই তা উড়িয়ে দিচ্ছে। নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে দুর্গের কোষাখানার তালাবন্ধ লোহার সিন্দুক। ডিউকের মস্তক ছাপানো রুপোর বা সোনার মুদ্রা—কিছুই আর থাকছে না। মনে হতে পারে, কোনো একটি শক্তি যেন টাকাগুলোকে মেলার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এই টাকা চলে যাচ্ছে মেলা থেকে মেলায়। চলে যাচ্ছে দক্ষিণে। চলে যাচ্ছে পুবে। যাবার পথে তার অনেকখানিই ঝরে পড়ছে সোনালী বালুকার মতো এবং জমা হচ্ছে ইতালীয় বণিক ও মহাজনদের গুদামঘরে। কিছু কিছু যাচ্ছে কন্স্তান্তিনোপ্ল-এ

ও আলেকজান্দ্রিয়ায়, বাদবাকি অংশ শুল্কঘরগুলিতে এবং বাইজান্টিয়ামের সম্রাট ও মিশরের সুলতানের কোষাগার ভরিয়ে তুলছে।

তুর্কীরা আলেকজান্দ্রিয়ার প্রভু হবার পরে আমদানী কর বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।

কিন্তু সোনার স্রোত সেখানেই থামেনি। চলে গিয়েছে সেই সমস্ত অজানা দেশের দিকেও যেখান থেকে পশ্চিমে নিয়ে আসা হয়েছে সিল্ক, মূল্যবান পাথর ও মশলা।

পশ্চিমে ক্রেতাদের কাছে এই জিনিসগুলি যখন এসে পৌঁছয় তখন তাদের দাম যে এত বেশি বেড়ে যায়, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ভারতে তাদের যা দাম আলেক-জান্দ্রিয়ায় তার চেয়ে পাঁচগুণ বেশি, আলেকজান্দ্রিয়ায় যা দাম শ্যাম্পেনের মেলায় তার চেয়ে পাঁচগুণ বেশি। কত সময় নিয়ে তাদের যেতে হয়েছে সেখানে, জাহাজ থেকে জাহাজে, উটের কুঁজ থেকে ঘোড়ার পিঠে। কিন্তু কোনো কিছুই এই সামগ্রী ও টাকার স্রোত বন্ধ করতে পারেনি। আর কেউ পারেনি বণিকদের ভয় দেখিয়ে এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা বন্ধ করতে...

জগৎ সবসময়েই আরো ছড়িয়ে পড়ছে। লোকে যখন এই জগতের দিকে তাকায়, দেখতে পায় বিশাল বিস্তৃত অরণ্য ও প্রান্তর, পর্বত ও উপত্যকা, সমুদ্র ও শুকনো জমি—পূবের দিকে বাল্টিক সাগর থেকে নভ্গোরদ পর্যন্ত, নভ্গোরদ থেকে কিয়েভ পর্যন্ত, কিয়েভ থেকে বাইজান্টিয়াম পর্যন্ত, বাইজান্টিয়াম থেকে পূবের দেশগুলি পর্যন্ত; পশ্চিমের দিকে হান্জীয়াটিক লীগের জার্মান নগরগুলি পর্যন্ত, ফ্ল্যান্ডার্স ও তারপরে ফ্রান্স পর্যন্ত, চ্যানেল পেরিয়ে ইংলন্ড পর্যন্ত। এই জগৎ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে, প্রত্যেকটি রাজ্য অন্য রাজ্যগুলির সঙ্গে যুদ্ধরত। কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করছে শুধু বিদেশীরাই নয়, যুদ্ধ চলেছে ভাইয়ে ভাইয়ে ও প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে।

তবুও কিন্তু, এমনকি সেই দিনগুলিতে, এমন মানুষ ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছিলেন যাঁরা বুঝতেন জনগণের ঐক্যের অর্থ কী।

৩. "এক হোক আমাদের হৃদয়"

পার্চমেন্ট কাগজের পৃষ্ঠাগুলো আরো একবার উল্টিয়ে দেখা যাক। সেখানে শুধুই রক্তাক্ত যুদ্ধ ও লড়াইয়ের বিবরণ। এক পলক তাকিয়ে বোঝার উপায় নেই কে কার সঙ্গে যুদ্ধ করছে। আজ যারা শত্রু, কাল তারা মিত্র, তার পরের দিনই তারা আবার শত্রু।

জার্মান সাধু ল্যামবার্টের লেখা থেকে একটি কাহিনী এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে। ল্যামবার্ট নির্বিবাদে ও নির্বিকারভাবে বলে চলেছে কেমন যুদ্ধ চলেছে রাজায় রাজায়, ব্যারনে ব্যারনে, বিশপে বিশপে। এমনও যদি হয় যে তারা একই গির্জার সদস্য, একই ধর্মে বিশ্বাসী, তাতেও তারা পরস্পরের বন্ধু হতে পারেনি।

একজন বিশপ ও একজন মঠের সাধুর অনুগামীদের মধ্যে লড়াইয়ের বিবরণ ল্যামবার্ট এমনভাবে দিচ্ছেন যেন জগতে এটা একটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ব্যাপারটা ঘটেছিল ট্রিনিটির ছুটির দিনে। ধর্মবিশ্বাসীদের ভিড়ে গির্জা ভরে গিয়েছিল। প্রার্থনা তখনো চলছে, তারই ঠিক মাঝখানে মানুষগুলো খোলা তলোয়ার নিয়ে পরস্পরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেদীর ওপরে দাঁড়িয়ে বিশপ তাঁর অনুগামীদের উৎসাহ দিতে থাকেন। প্রার্থনা ও স্তোত্রপাঠের বদলে শোনা যেতে থাকে যোদ্ধাদের চিৎকার ও মরণাপন্নদের কাৎরানি।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বিশপ ও সাধু তাঁদের বিতর্কের মীমাংসা করার জন্য এর চেয়ে ভালো স্থান ও সময় খুঁজে পাননি।

কী ছিল তাঁদের বিতর্কের বিষয়? সাধুর এতই ধৃষ্টতা যে আর্চবিশপের পাশে বসেন আর বিশপ ভাবছেন এই সম্মানের আসনটি তাঁর প্রাপ্য।

ইংলন্ডে, ফ্রান্সে, ইতালিতে—সারা ইওরোপে—প্রিন্সরা ও অভিজাতরা নিজেদের মধ্যে লড়াই চালাচ্ছিল। কিন্তু এমন মানুষও কিছু ছিলেন যাঁরা এইসব তুচ্ছ বিবাদের ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করতে পেরেছিলেন।

আরেকটি কাহিনী বলা যাক—এটি রুশী কাহিনী। সেই একই সময়ের কাহিনী—একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ।

এখানেও দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে লড়াই করছে। কিয়েভের প্রিন্স অবরোধ করেছে চের্নিগভ, নভ্গোরদের প্রিন্স অবরোধ করেছে সুজ্দাল। রুশ প্রিন্সরা স্তেপভূমির যাযাবর লোলোভৎসিদের ডাক দিচ্ছে অন্য রুশ প্রিন্সদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করার জন্য। একজোট হয়ে তারা রুশ নগরগুলি বিধ্বস্ত করল ও পুড়িয়ে দিল।

কাহিনীকার কোন্ পক্ষে? চের্নিগভের পক্ষে, না, কিয়েভের পক্ষে? কোনো পক্ষেই নয়। তিনি রয়েছেন সমগ্র রুশভূমির পক্ষে। ল্যুবেক সম্মেলনের ভাষণ তিনি অনুমোদন করছেন এবং তা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। এই ল্যুবেক সম্মেলনে রুশ প্রিন্সরা মিলিত হয়ে পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে পুত্রের অধিকার সম্পর্কে একমত হয়েছিলেন।

"আমরা যেন রুশভূমিকে ধ্বংস করছি? আমাদের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলে তখন পোলোভ্ৎসিরা এসে আমাদের দেশ ছিন্নভিন্ন করে দেয়। এখন থেকে এক হোক আমাদের হৃদয়। আসুন আমরা আমাদের পিতৃভূমি রক্ষা করি।"

সবল মানুষের হৃদয় এক হওয়ার কথা কাহিনীকার লিখেছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে। একাদশ শতাব্দীতে সবকিছু চলত সামন্ততান্ত্রিক আমলের রীতি অনুযায়ী। তখনো পর্যন্ত কেউ বলত না 'রুশ জনগণ'। সবাই বলত 'রুশ ভূমি'। কিন্তু এই কাহিনীকার আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন সেই সময়কে যখন নগরগুলির মধ্যে কোনো শত্রুতা থাকবে না এবং রুশ জনগণ ঐক্যবদ্ধ হবে। তাঁর কাছে চের্নিগভ, কিয়েভ ও নভ্গোরদ সবই ছিল সমান প্রিয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, হাজার হাজার মানুষের থাকতে পারে একই হৃদয়।

তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের চেয়ে এগিয়ে, কিন্তু শেষপর্যন্ত সময়ও তাঁর নিজস্ব ধারা লাভ করে।

ল্যুবেকের সম্মেলন থেকে ফিরে আসতে না আসতেই প্রিন্সরা অনিষ্ট পাকাবার জন্য মেতে উঠেছিল। প্রিন্সদের একটি শক্তিশালী দল—মোনোমাক ভাইরা—তাদের ভাইপোদের একটি রাজ্য দখল করার জন্য চক্রান্ত করছিল।

কিয়েভের প্রিন্স ভ্লাদিমির মোনোমাক তাঁর 'উপদেশাবলী'তে এ-বিষয়ে বলছেন :

"ভল্গা-তীর থেকে আমার ভাইদের দূত আমার কাছে এসে বলল, 'আমাদের সঙ্গে যোগ দাও, রস্তিস্লাভদের আমরা শহর থেকে তাড়িয়ে দেব। আর যদি আমাদের সঙ্গে যোগ না দাও আমরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা যাব আর তোমাকেও তাহলে আলাদা হয়ে যেতে হবে।' আমি জবাব দিলাম, 'তোমরা যদি আমার শত্রু হয়ে যাও তাহলেও আমি তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারি না।' এইভাবে ওদের বাতিল করে দেবার পরে আমি বিষণ্ণ মনে আমার স্তোত্রের বই তুলে নিলাম। বইটি খুলে পেয়ে গেলাম ঠিক সেই

মুহূর্তে যা আমার দরকার ছিল : 'হে আমার আত্মা, কেন তুমি এত বিমর্ষ? কেন তুমি আমাতে এত অশান্ত?' "

ভাইরা ভেবেছিল ভ্লাদিমির মেনোমাক তাদের সঙ্গে যোগ দেবে, ভাবাটা তাদের ভুল হয়েছিল। তিনি সে-ধরনের মানুষ নন। নিজের আত্মীয়দের সঙ্গে লড়াই করতে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন পোলোভ্ৎসিদের বিরুদ্ধে সমস্ত রাশিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করতে। রুশভূমির জন্যে তিনি যা করতে পেরেছিলেন তা সবাই পারে না। ল্যুবেক সম্মেলনের ঠিক আগে মোনোমাককে বিরাট ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছিল। চের্নিগভের প্রিন্সের সঙ্গে লড়াইয়ে নিহত হয়েছিল তাঁর ছেলে। মোনোমাকের জায়গায় অন্য কেউ হলে ভীষণ প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করত। সেটাই রীতি। কিন্তু তিনি ওলেগকে লিখলেন, "আমি তোমার শত্রু নই, আমি তোমার ওপরে প্রতিশোধ নিতেও চাই না। সে ভার ঈশ্বরের ওপরে থাক। রুশভূমিকে ধ্বংস করার দিকে আমরা যাব না।" নিজের শত্রুর দিকে এইভাবে বন্ধুত্বের হাত বাড়ানো তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু তাঁর ছিল আরও বড়ো করে দেখার দৃষ্টি। নিজের ঘরবাড়ি, নিজের টুকরো জমি, সে-সব ছাড়িয়ে আরও দূর পর্যন্ত দেখতে পেতেন তিনি। দেখতে পেতেন সমগ্র রুশ-ভূমি। সেইসঙ্গে দেখতে পেতেন অন্যান্য দেশও।

নিজের ছেলেমেয়েদের মোনোমাক উপদেশ দিতেন তারা যেন বিদেশী ভাষা শেখে। বলতেন, "ওরই মধ্যে আছে অন্যান্য দেশের গুণাবলী।" ছেলেমেয়েদের মনে করিয়ে দিতেন, তাঁর নিজের পিতা পাঁচটি ভাষা জানতেন।

আর এই সমস্ত বিদেশের ভূমি পেরিয়ে মোনোমাকের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হতো সমগ্র সীমাহীন বিশ্ব।

বিশ্বের বিপুল বিস্ময়ের প্রশংসা করেছিলেন মোনোমাক তার 'উপদেশাবলী'তে। আশ্চর্য হয়েছিলেন আকাশের গঠন দেখে এবং কি-ভাবে এই বিশ্ব জলের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে সেই কথা ভেবে। তাছাড়া তিনি লিখেছিলেন সূর্য ও নক্ষত্রদের সম্পর্কে পশু ও পাখিদের সম্পর্কে, এবং পাখিরা কি-ভাবে উষ্ণ দেশ থেকে যায় এবং অরণ্য ও ক্ষেত-খামার ভরিয়ে পৃথিবীর ওপরে ছড়িয়ে পড়ে সে-সম্পর্কে। স্পষ্টই বোঝা যায় মোনোমাক প্রচুর পড়েছিলেন এবং কি-ভাবে কলম চালাতে হয় জানতেন।

এমনকি যখন তিনি প্রচারে বেরোতেন তখনো লিখতেন, সীজার ও মার্কস আরলিয়াসের মতো। তাঁর সমস্ত উপদেশই এইভাবে শুরু হতো, "আমি যখন স্লেজগাড়িতে চেপে যাচ্ছিলাম তখন আমি চিন্তা করতে লাগলাম..." তিনি ছিলেন ভাবুক ও কবি, অথচ মানুষটি ছিলেন এতই শক্তিমান যে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে বুনো ঘোড়া ধরতে পারতেন, জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে খালি হাতে ভালুকের সঙ্গে লড়াই করতে পারতেন। পোলোভ্ৎসিদের বিরুদ্ধে এবং স্তেপভূমির অন্যান্য যাযাবর উপজাতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাশিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বিপুল শক্তি ও মেধার প্রয়োজন ছিল তাঁর।

মোনোমাকও ছিলেন তাঁর সময়ের থেকে এগিয়ে। তাঁর মৃত্যুর পরেই আবার লড়াই শুরু হয়ে গেল এবং যাযাবররা রাশিয়ার ক্ষেতখামার মাড়িয়ে যেতে শুরু করল।

কিন্তু তখনো কিছু সৎ মানুষ ছিলেন যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে সব মানুষের হৃদয় এক হতে পারে।

'প্রিন্স ইগরের গাথা'য় চারণকবি প্রিন্সদের কাছে আবেগময় আবেদন জানিয়েছেন এবং এই বলে তাঁদের তিরস্কার করেছেন, "দেশদ্রোহিতা করে তোমরা সকল স্লাভের দেশ রুশভূমিকে কলুষিত করতে শুরু করেছ।"

'প্রিন্স ইগরের গাথা' যিনি রচনা করেছিলেন সেই মহান চারণকবির নাম আমরা জানি না। কিন্তু তাঁর রচনা থেকে গিয়েছে এবং বেঁচে আছে। পুরনো দিনের মতো এখনো এই গান ঝংকৃত হয়, যেমন হয় চারণকবির হাতের ছোঁয়ায় বাদ্যযন্ত্রের তার।

"ভোর হবার আগেই দূর থেকে কোন্ শব্দ আসছে আমার কানে, কী বাজছে আমার কানে?"

আসছে রুশ যোদ্ধারা, "ভেঁপু বাজিয়ে, শিরস্ত্রাণ নাচিয়ে, বর্শাফলক উঁচিয়ে। রাস্তা তাদের চেনা, গিরিপথ তাদের পরিচিত, তাদের ধনুক টান ধরানো, তাদের তূনীর খোলা, তাদের তলোয়ার ধারালো। তারা লাফায়, নিজেরাই পেতে চায় নিজেদের জন্যে সম্মান, তাদের প্রিন্সদের জন্য গৌরব।'

এই চারণকবি অনেককাল আগেই চলে গিয়েছেন, তাঁর নাম কেউ মনে রাখেনি। কিন্তু তবুও তাঁর হাতের নিচে তারের ঝংকার উঠছে, গাথার মধ্যে সময় আবার বেঁচে উঠছে।

পাহাড়ের চুড়োয় প্রিন্সদের সোনার ছাদওলা প্রাসাদ দেখা যায়। আবার ভেঁপু বাজে, পৎপৎ করে পতাকা ওড়ে। অমাদের চারদিকে অনেক দূর পর্যন্ত আমরা দেখি পাহাড় ও উপত্যকা, নদী ও হ্রদ, ঝরণা ও সরোবর। ক্ষেতে চাষীরা লাঙল দিতে দিতে একে অপরের উদ্দেশে হাঁক দেয়। নদীর তীর উষ্ণ কুয়াশায় মোড়া। গাঙচিল ও সোনালী ঈগল নদীর ওপরে ভেসে বেড়ায়। ঢেউয়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নৌকো চলে। প্রিন্স মাঠে শিকার করে বেড়ায়। হাঁস ও রাজহাঁস নিধন করে বাজপাখি উঁচু আকাশে ওড়ে।

আমরা জানি না এই চারণকবি কোন প্রিন্সের দরবারে থাকতেন। কেননা তিনি কোনো একজন বিশেষ প্রিন্সের জয়গান করেননি। জয়গান করেছেন সমগ্র রুশভূমির। তিনি দেখেছিলেন পোলোভ্‌ৎসিরা রুশ বাহিনীকে হটিয়ে দিচ্ছে, "যুদ্ধের হুংকার তুলে মাঠ ঘিরে ফেলেছেন।" এবং তিনি পরাক্রান্ত রুশ প্রিন্সদের উদ্দেশে ডাক দিয়েছিলেন তাঁরা যেন "সোনালী রেকাবের ওপরে উঠে দাঁড়ান এবং তোরণের সামনে মাঠের মধ্যে তীক্ষ্ম শর বিছিয়ে দিন—রুশভূমির প্রতি তখনকার দিনের অপমানের শোধ নেবার জন্যে।"

'প্রিন্স ইগরের গাথা' শুধু প্রিন্স ইগরের গান নয়, সারা রুশভূমির গান।

এই চারণকবির কাছে সমান প্রিয় ছিল পশ্চিমের কিয়েভ, নভ্‌গোরদ ও গ্যালিসিয়া। দূরের অন্যান্য দেশের দিকেও তিনি তাকিয়েছিলেন। পোলোভ্‌ৎসদের কাছে প্রিন্স ইগর যখন বন্দী হলেন তখন তিনি গ্রীক ও মোরাভিয়ান ভেনেসিয়ানদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন। ইগর যখন স্বদেশ কিয়েভে ফিরে এলেন তখন "সারা দেশ খুশি হলো, সমস্ত নগর আনন্দে ভাসল।" গাথার চারণকবি তখনই বুঝতে পেরেছিলেন সমস্ত মানুষ একই জীবন কাটায়।

সাধু ফিওদোসিন প্রিন্স ইজিয়াস্লাভক লিখেছিলেন, "করুণা দেখাবে শুধু তাদেরই নয় যারা তোমার নিজের ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী, তাদেরও যাদের ধর্মবিশ্বাস ভিন্ন। যদি এমন কাউকে দেখতে পাও যে অন্নহীন ও বস্ত্রহীন, দুঃসময়েই হোক বা দুর্ভাগ্যের তাড়নাতেই হোক, যদিও বা সে হয় ইহুদী বা সুরাসেন বা বুলগার বা নাস্তিক বা সকলের ঘৃণার পাত্র—সকলকে করুণা কোরো, আর যদি তোমার ক্ষমতা থাকে তাহলেই তাদের দুর্দশা দূর করতে চেষ্টা কোরো।"

এই সরল কথাগুলির মধ্যে কী উচ্চ চিন্তাই না প্রকাশ পেয়েছে—মানুষের বন্ধুত্বের চিন্তা!

যতোই শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হবে ততোই মানুষ বুঝতে শিখবে যে মানুষের শক্তি রয়েছে মানুষের বন্ধুত্বের মধ্যে। তারা আরও দূরের দিকে ঠেলে সরিয়ে দেবে তাদের জগতের দেয়াল। তারা রক্ষা করে চলবে এবং ভালোবাসবে শুধু তাদের নিজের মাটিটুকু নয়, সমগ্র পৃথিবীকে, সমগ্র গ্রহকে...

কিন্তু আমরা আমাদের কাহিনী থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছি। আবার ফিরে আসা যাক সামন্ততন্ত্রের কালে, যখন মানুষ থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্যে প্রচুর দেয়াল ছিল। কিন্তু এমনকি তখনো দেয়ালের মধ্যে আটক থাকা ছোট ছোট জগতগুলি পরস্পরের সম্পর্কে জানতে পারছিল।

গ্যালিসিয়ায় গোঁড়া গির্জাগুলি আর ফ্রান্সের ক্যাথলিক গির্জাগুলি ছিল হুবহু একই রকম। রঙীন কাঁচের মধ্যে দিয়ে লাল ও নীল আলো বেরিয়ে এসে সাধুদের মূর্তিগুলি আলোকিত করত। বিদেশীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত কিয়েভের সমৃদ্ধির দিকে এবং বলত যে সৌন্দর্যের দিক থেকে কিয়েভ বাইজান্টিয়ামের সংগে পাল্লা দিতে পারে।

নভ্গোরদ ও মস্কোর মধ্যে যে অরণ্য ছিল সেখানে দ্বাদশ শতাব্দীতে গড়ে উঠল বিরাট নগর ভ্লাদিমির। ক্লিয়াজমা নদীর অনেক উঁচুতে অরণ্যের অসমান দেয়ালের ওপরে উঠে দাঁড়ালো মনোহর ও সুসমন্বিত গির্জাগুলি।

বিদেশ থেকে দর্শকরা এসে দিমিত্রভ গির্জার দেয়ালে পাথরের খোদাইগুলি দেখত। তারা অবাক হতো কারিগরদের দক্ষতা দেখে, যে কারিগররা কঠিন পাথরের ওপরে ফুটিয়ে তুলেছিল এত সব মানুষ ও পাখি ও জীবজন্তু। এখানে ছিল ডানাওয়ালা দৈত্যরা, যারা মনে পড়িয়ে দিত নৎর্‌দাম-এর উঁচু ছাদ থেকে তাকিয়ে থাকা সিংহের মতো মাথা, সাপের মতো লেজ, ছাগলের মতো শরীর, উদ্ভট দৈত্যগুলির কথা। কিন্তু সম্ভবত আরও বেশি সুন্দর ছিল সেই গির্জাটি যেটি দাঁড়িয়ে ছিল ভ্লাদিমিরের অদূরে নেরলা নদীর তীরে—১১৬৫ সালে তৈরি সাদা পাথরের আশ্চর্য রকমের হাল্‌কা সুন্দর একটি অট্টালিকা।

এই একই দ্বাদশ শতাব্দীতে ককেসাসের জর্জিয়ার মহান কবি শোৎহা রুস্তহ্‌ভেলি একটি কবিতা লিখেছিলেন, যাতে যুক্ত হয়েছিল পশ্চিমের প্রজ্ঞার সংগে পূবের কাব্য। জর্জিয়ানদের সম্পর্কে বাইজান্টাইনরা বলত, 'তোমরা যদিও জন্মের দিক থেকে জর্জিয়ান কিন্তু সংস্কৃতির দিক থেকে প্রকৃত গ্রীক।'

কিয়েভে ও প্যারিসে, কনস্টান্টিনোপ্‌লে ও লন্ডনে লোকে মঠের গ্রন্থাগারে বই পড়ত, গল্প ও কাহিনী লিখত, ভালোবাসার সংগে পাণ্ডুলিপিকে সোনা ও নানা রকমের রঙ দিয়ে অলংকৃত করত, অধ্যায়ের শুরুতে বড়োহাতের অক্ষরটিকে নানাভাবে সাজাত।

ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে যেতো, লিখতে ও পড়তে শিখত। তাদের কাছে প্রত্যেকটি বই ছিল একটি জানালা, যার মধ্যে দিয়ে বাইরের জগতের দিকে তাকানো যেতো।

পঞ্চম অধ্যায়

১. বই, বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্ক

বিদ্যালয়ে মৌচাকের মতো গুঞ্জন। ছেলেরা সবাই বসে আছে একটা লম্বা টেবিলের ধারে, বড়োরা ও ছোটরা সবাই একজায়গায়, সব ক্লাশ একসঙ্গে। ছোটরা গলা মিলিয়ে গান গাইছে, "আমাদের পিতা, যিনি আছেন স্বর্গে"। যারা আরো একটু বড়ো তারা বানান করে করে শব্দ বলছে, একটি একটি করে অক্ষরে। যারা সবচেয়ে বড়ো তারা প্রার্থনাসঙ্গীত নিয়ে ব্যস্ত। চারদিকে এত বেশি শব্দ যে কী হচ্ছে বোঝা যায় না।

যারা অল্পস্বল্প পড়তে পারে তারা বসে আছে শিক্ষকের পাশে। শিক্ষক যা বলছেন তাই তারা আবার বলছে, কোনো শব্দ বাদ না দিয়ে, ঠিক লাইনটির ওপরে আঙুল রেখে। তারা যতো-না নির্ভর করছে চোখের ওপরে, তার চেয়ে বেশি কানের ওপরে। শিক্ষক যা বলছেন তাই তাদের আবার বলা চাই।

তারা ভাবছে অন্য কথা, তারা যা শিখছে তা নয়। ওই দেখা যায় একঝাঁক পায়রা গির্জার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। ওই দেখা যায় মেষপালক ধুলোভরা রাস্তার ওপর দিয়ে ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তাদের মাথায় ঠাসা হয়ে আছে তাদের নিজেদের ব্যাপার। মুখে তারা কী বলছে তাই নিয়ে তারা ভাবছে না। যদি ভাবেও তাহলে বইয়ের লেখার অর্থ বোঝার ক্ষমতা তাদের নেই। তারা পড়তে চেষ্টা করছিল স্লাভিক 'প্রাচীন গির্জা', এই গ্রন্থ অনুধাবন করা রুশ শিশুদের পক্ষে যথেষ্ট শক্ত। পশ্চিমে ব্যাপারটা আরও বেশি শক্ত। সেখানে পড়ানো হয় লাতিন ভাষায়, যে ভাষা যাজক ও শিক্ষক ছাড়া আর কেউ বোঝে না। তাই তারা শিক্ষককে অনুসরণ করে প্রতিটি শব্দ শুধু আউড়ে যাচ্ছে। একটি বই শেষ হলেই অন্য একটি বই ধরা হয়। শিক্ষককে অর্থ দেওয়া হয় পড়িয়ে শেষ করা প্রত্যেকটি বইয়ের জন্যে আলাদা করে। পড়ুয়াদের অভিভাবকদের সঙ্গে এইভাবেই তার দর কষাকষি হয়েছে—ঠিক যেমন হয় একটি ওভারকোট বিক্রি করার জন্য। শিক্ষককে বলা হয় 'মাস্টার'—যেমন বলা হয় 'তাঁতী' বা 'দরজি'।

অঙ্ক শেখানোর ব্যাপারে মাস্টারের কোনো ভণিতা নেই—শেখান শুধু যোগ। আরো শিখতে হলে অন্য বিদ্যালয়ে যেতে হবে—প্রধান গির্জার বা মঠের। সেখানে শেখানো হয় ব্যাকরণ, ছন্দশাস্ত্র ও দ্বান্দ্বিকতাতত্ত্ব। এই বিষয়গুলি আয়ত্ত হবার পরে ছাত্রদের যেতে হয় পাটিগণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, সঙ্গীত ও জ্যামিতি পড়বার জন্যে।

শিক্ষণীয় বিষয়ের শাখা আছে সাতটি—সাত বোনের মতো। ব্যাকরণের বিষয় বাচন, দ্বান্দ্বিকতাতত্ত্ব থেকে শেখা যায় সত্য কী, ছন্দশাস্ত্র বচনকে মার্জিত করে, সঙ্গীত ছাত্রদের গান করতে শেখায়, পাটিগণিত শেখায় কি-ভাবে হিসেব করতে হয়, জ্যোতির্বিদ্যা থেকে নক্ষত্রদের সম্পর্কে জানা যায়, জ্যামিতি শেখায় মাপজোখ।

সেই সময় আর নেই যখন এমনকি বিশপরাও বলতেন যে ব্যাকরণ পড়লে পাপ হয়। এখন আর শুধু বিশপরা নন, সামান্য মোহান্তদের পর্যন্ত জানা চাই কি-ভাবে লিখতে ও পড়তে হয়।

ব্যাকরণ খুব একটা সোজা বিষয় নয়, পাটিগণিত তার চেয়েও শক্ত। আরবী সংখ্যার সঙ্গে পরিচয় ছিল অল্প লোকেরই। সংখ্যাগুলো তখনো লেখা হতো পুরনো লাতিন উপায়ে। সংখ্যাবাচক রোমান লিপিগুলো যোগ করে করে পূর্ণসংখ্যাটি নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার ছিল না। আর রোমান লিপিতে ভগ্নাংশ প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

তাছাড়া শিখতে হতো প্রত্যেকটি সংখ্যার অর্থ। ছাত্রদের কাছে শিক্ষক এমনিভাবে ব্যাখ্যা করতেন : ধরো সংখ্যাটি হচ্ছে চার। চার দিয়ে বোঝানো হচ্ছে চারটি ঋতু, দিনের চারটি ভাগ—দিন, রাত্রি, সকাল ও সন্ধ্যা। তার মানে, আমাদের অস্থায়ী পার্থিব জীবন, ছোট ছোট চিন্তাভাবনা ও আনন্দ দিয়ে যা ভরা। যদি কেউ অমরত্ব লাভ করতে চায় তবে তাকে বর্জন করতে হবে সকল অস্থায়ী আরাম ও উপভোগ এবং সারাটি দিন ব্যয় করতে হবে উপবাসে ও প্রার্থনায়।

সংখ্যাটি যদি হয় তিন—সেটি হচ্ছে পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মার ত্রয়ী, খৃস্টানরা যাতে বিশ্বাস করে।

সাত—সাত হচ্ছে মানুষ। কথাটা এই যে মানুষের আছে পবিত্র দেহ ও সত্তা। সত্তা গঠন করে হৃদয় আত্মা ও মন। কেননা, লেখা আছে—"তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তুমি ভালোবাসবে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত আত্মা দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে।" দেহ গঠন করার চারটি উপাদান—আগুন, জল, মাটি ও বাতাস। সবকটিকে যোগ করলে পাওয়া যায় সাত।

জ্যোতির্বিদ্যা শিখতে গিয়ে ছাত্ররা পড়ে পৃথিবী ও আকাশের বিবরণ। বৃষ্টি ও তুষারঝড় সম্পর্কে, জীবজন্তু ও পাখি সম্পর্কে আগেকার কালে তারা শিখত উদ্ভট সব কাহিনী। বৃষ্টি হয়ে থাকে এই কারণে যে দেবদূতেরা তাদের ঘড়ায় সমুদ্রের জল ভরে আর তারপরে সেই ঘড়ার জল ডাঙার ওপরে ঢেলে দিয়ে যায়। মেষশাবকের শিঙ গড়ায় শিকড় থেকে গাছের মতো। পাখির জন্ম হয় ফলে তা দিয়ে। এখন আর কেউ এসব কাহিনী বিশ্বাস করে না, এখনকার মানুষ অনেক বেশি জানে।

আরবদের মাধ্যমে আরিস্টটল, টলেমি ও প্রাচীন বিজ্ঞানীদের লেখা বইগুলি পুব থেকে পশ্চিমে চলে এল। মঠের বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানীরা জানতে পারলেন চারটি উপাদান সম্পর্কে, আকাশের স্ফটিক গোলকগুলি সম্পর্কে, যে গোলকগুলি নক্ষত্র ও গ্রহকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছে। অন্ততপক্ষে এই ব্যবস্থাটি অনেক বেশি জাগতিক—কস্‌মাস যে সংকীর্ণ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের কথা লিখেছিলেন তার চেয়েও।

বোলোঞ্ঞায় ও প্যারিসে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়। পিঠে ঝোলা ঝুলিয়ে ও হাতে লাঠি নিয়ে তীর্থযাত্রীরা এসে হাজির হতো এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারা কিন্তু আগেকার কালের তীর্থযাত্রী নয়, তারা নিতান্তই বালক মাত্র। মুনিঋষির অস্থির কোনো একটা পুণ্য স্তূপের প্রতি বা বৃদ্ধ পুণ্যবান কোনো একজন মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তারা আসেনি। তারা এসেছে নৎরদামের প্যারিস গির্জার বিদ্যালয়ে—শাঁপীয়ার গুইয়ামে ও পিয়ের আবেয়ারের অধ্যাপনা শোনার জন্য। এই দুজন মানুষের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়েছিল। পয়াতিয়েরে, আন্‌জোউ, বৃটানি ও ইংলন্ডে তাঁদের নাম পরিচিত ছিল।

প্যারিসে পৌঁছে এই ভাবী ছাত্ররা তাদের দেশের মানুষদের খুঁজে বার করল। তারা তাদের জানিয়ে দিল যেখানে তারা যেতে চায় সেখানে কি-ভাবে যেতে হবে—ছোট পুলের

ওপর দিয়ে, সীন নদীর বাম তীরে। সেখানে গিয়ে তারা দেখল তাদের মতো আরো প্রচুর ছাত্র রয়েছে। এক কি দু মাস পরে আনাড়িরা হয়ে উঠত পুরোদস্তুর নাগরিক। স্থানটি যে-নামে পরিচিত ছিল—লাতিন কোয়ার্টার—

ফ্রান্সে সবাই অবশ্য কথা বলত ফরাসী ভাষায়। কিন্তু লাতিন কোয়ার্টারের তা নয়। এখানে কী ফরাসী, কি ইংরেজ, কি ইতালীয়, কি জার্মান, সবাই কথা বলে লাতিন ভাষায়।

প্যারিসের মানুষরা এই ছাত্রদের দিকে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকাত। এরা তাদের দেশের মানুষ নয়, বিদেশী। এদের চালচলন লাগামছাড়া। প্যারিসের মানুষদের সঙ্গে ছাত্রদের সঙ্ঘর্ষ প্রায়ই ঘটত—রাস্তায় কিংবা ভাটিখানায় দেখা হয়ে গেলে। এমনও হতো যে পানভোজনে মত্ত ছাত্রদের গ্রেস্তার করাবার জন্যে নগর-রক্ষীদের ডেকে এনেছে কোনো একজন নগর-প্রধান বা বণিক বা মুখ্য দোকানী। কিন্তু কাজটা সহজ ছিল না। ছাত্ররা বীরবিক্রমে লড়াই চালাত। নগর-প্রধানদের কর্তৃত্ব তারা মানত না। তাদের ছিল নিজস্ব কর্তা। তিনি হচ্ছেন নৎরদাম গির্জার উপাধ্যক্ষ।

লাতিন কোয়ার্টারের ছাত্ররা ও শিক্ষকরা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে অজ্ঞ বণিক ও কারিগরদের দিকে তাকাত। কতটুকুই বা জানে এই লোকগুলো দর্শন সম্পর্কে বা ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে বা আইন সম্পর্কে! আর চিকিৎসাবিদ্যার কথা যদি বলতে হয় তাহলে কি একজন ডাক্তারের সঙ্গে একজন নাপিতের তুলনা করা চলে—যে নাপিত লোকের রক্ত ঝরায় ও দাড়ি কামায়? গ্যালেন বা হিপোক্রাটিস সম্পর্কে কতটুকু জানে একজন নাপিত? চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এই জনকদের নামও সে কখনো শোনেনি।

নগরের কোনো মানুষকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আরিস্টটল কে? এই প্রশ্নের জবাবটুকু পর্যন্ত সে দিতে পারে না। সেখানে ছাত্ররা সযত্নে পাঠ করে যেমন সেন্ট অগাস্টিন তেমনি আরিস্টটল।

খুব বেশি কাল আগের কথা নয়, এমন সময়ও ছিল যখন গ্রীকদের রচনাবলীকে মনে করা হতো নরকের উদ্গার। হিব্রু ও আরব ভাষা থেকে অনূদিত তাঁদের বইগুলো পাদ্রিদের হুকুমে পুড়িয়ে ফেলা হতো। কিন্তু এখন, যীশুখৃস্টকে যতোখানি উচ্চশ্রদ্ধা দেখানো হয় প্রায় ততোখানি দেখানো হয় আরিস্টটলকে। একথা ঠিক যে আরিস্টটল ছিলেন বিধর্মী, কিন্তু তিনি জানতেন কি-ভাবে মস্তিক ব্যবহার করতে হয় এবং সব-কিছুকে শ্রেণীবিভক্ত করতে হয়। এত কিছু জ্ঞানের কথা চিন্তা করা ও শ্রেণীবিভক্ত করা বড়ো সহজ কাজ ছিল না। তিনি ছিলেন অতি মস্ত মানুষ।

যে বিধর্মীরা আজকাল সংখ্যায় এত বেশি বেড়ে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে একটা কিছু আলোচনা করতে হলে ব্যাপারটা বোঝা যায়। ওদের যুক্তি খণ্ডন করতে হলে ওরা যে-স্তরের মানুষ সেই স্তরে নেমে গিয়ে কথা বলতে হয়। নইলে কথার কোনো দাম থাকে না এবং লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হতে হয়। এমনকি ওদের শয়তানীর জালে আটক হয়ে পড়াটাও আশ্চর্য নয়। নিজের বিশ্বাসে অবিচল থাকাটাই যথেষ্ট নয়, ঘাড়ের ওপরে মাথা রেখে চলতে হবে।

এমনিভাবে লোকে বৃহৎ পদক্ষেপে এগিয়ে গেল। শতাব্দীর পর শতাব্দী তাদের শেখানো হয়েছিল চিন্তা না করে শুধু বিশ্বাস করতে। কিন্তু তারা আবার চিন্তা করতে শুরু করেছে। তারপরে তাদের থামানো শক্ত। মানুষ যখন কোনো কিছু প্রমাণ করতে শুরু করে তখন তার মধ্যে নিশ্চয়ই এসে যায় যুক্তি ও সন্দেহ।

সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল যারা অন্ধভাবে বিশ্বাস করত তাদের সঙ্গে যারা বিশ্বাসকে

জ্ঞান দিয়ে যাচাই করে নিতে চাইত তাদের। তাদের মধ্যে ক্লেয়ারভাউ-এর মোহান্ত বার্নার্দের মতো কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা কানে তুলো এ'টে থাকতেন। তাঁরা এমনকি জাগতিক মানুষদের বক্তব্য পর্যন্ত শুনতে চাইতেন না।

গল্প শোনা যায়, একবার নাকি বার্নার্দ জেনিভা হ্রদের পাশ দিয়ে হে'টে যাচ্ছিলেন। নিজের চিন্তায় এমনই ডুবে ছিলেন হ্রদটি পর্যন্ত দেখতে পাননি। তাঁর সঙ্গী যখন হ্রদের কথা বলতে শুরু করে তিনি একেবারে হতভম্ব হয়ে যান। তাঁর চোখ খোলা ছিল কিন্তু চোখের সামনের জগৎ তিনি দেখতে পাননি।

অন্যদিকে তরুণ অধ্যাপক পিয়ের আবেলারের মতো অন্যরা চাইতেন দেখতে, শুনতে ও চিন্তা করতে। তাঁদের সামনে ছিল বিপুল জগৎ, মঠের সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠ মাত্র নয়।

২. বার্নার্দ ও আবেলার্দের কাহিনী

আবেলার্দের বিরুদ্ধে বিধর্মিতার অভিযোগ তুললেন বার্নার্দ। আবেলার্দ দাবি করলেন, বিচারসভায় স্থির হোক কে যথার্থ।

বিচারের জন্যে নির্ধারিত দিনে দুই বিরোধী পক্ষ প্যারিসে হাজির হলেন—একটি তোরণ দিয়ে বার্নার্দ ও অপর একটি তোরণ দিয়ে আবেলার্দ। নগরের সমস্ত মানুষ তাদের অভ্যার্থনা জানাবার জন্যে উপস্থিত হলো। বার্নার্দ যখন এলেন তখন ভিড়ের মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে সরে গিয়ে তাঁর জন্যে পথ করে দিল। তিনি এলেন পায়ে হে'টে, সাদামাটা সাধুর আলখাল্লা গায়ে দিয়ে, মাথা নিচু করে। সবাই তাকিয়ে দেখল তাঁর মুখের দিকে, উপবাস করে আর নিদ্রাহীন রাত কাটিয়ে মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে, ভিতরকার ঘনীভূত আগুনে চোখদুটো জ্বলছে। চাপা স্বরে সবাই বলাবলি করতে লাগল তাঁর আশ্চর্য অলৌকিকতার বিষয়ে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা সম্পর্কে।

"উনি একজন ঋষি।" বার্নার্দ সম্পর্কে তারা মন্তব্য করল।

বিকলাঙ্গরা ও রুগ্ন ব্যক্তিরা তাঁর চারদিকে ভিড় করল, হাঁটু মুড়ে বসে তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইতে লাগল তিনি যেন তাঁদের আশীর্বাদ করেন ও সারিয়ে তোলেন।

আবেলার্দের নামও সবাই জানে। সারা দেশের মানুষ হেলোআইজের উদ্দেশে রচিত তাঁর গান গেয়ে থাকে।

শোনা যায়, হেলোআইজ নাকি আবেলার্দের এক ছাত্রী। হেলোআইজ সে-সময়ের অন্য মেয়েদের মতো নয়, যারা শুধু জানে বুনতে ও ছুঁচের কাজ করতে। হেলোআইজ বই ভালোবাসে। আবেলার্দ তাঁর এই ছাত্রীকে নিয়ে একসঙ্গে পড়েছেন সেন্ট অগাস্টিন, আরিস্টটল ও প্লেটো। একই বইয়ের ওপরে তাঁরা ঝুঁকে পড়েছেন—এবং তাঁরা পরস্পরের প্রেমে পড়েছেন। আবেলার্দের সঙ্গে প্রেমে না পড়ে উপায় কি ছিল হেলোআইজের? আবেলার্দ যখন ছাত্র-পরিবৃত হয়ে রাস্তায় বার হন তখন সমস্ত মেয়ে তাঁকে দেখার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। তিনি রূপবান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, বাক্‌পটু ও চমৎকার গাইয়ে গলার অধিকারী।

হেলোআইজের আত্মীয়রা তাদের এই প্রেমের কথা জেনে যায়। রূঢ় ও নিষ্ঠুরভাবে তারা আবেলার্দের সঙ্গে হেলোআইজের বিচ্ছেদ ঘটায়। আবেলার্দ একটি মঠে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং হেলোআইজকে সন্ন্যাসিনী হতে রাজী করান। হেলোআইজ আবেলার্দকে এতই ভালোবাসত যে তাঁর সঙ্গে শুধু মঠে কেন, নরকে যেতেও প্রস্তুত ছিল।

কিন্তু আবেলার্দ এমনকি মঠে গিয়েও বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। এই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষটি চাইতেন মননের মধ্যে দিয়ে তাঁর ধর্মবিশ্বাসকে উপলব্ধি করতে। সে-সময়ের পক্ষে এটা ছিল এক ভয়ংকর চিন্তা। তিনি জোর দিয়ে বলতেন, ঈশ্বরের পুত্র—আমাদের ত্রাতা হচ্ছে পূত অভিজ্ঞান। এ-বিষয়ে কথা বলার সময়ে লোকে ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নিত। এমনি ধরনের কথা বলার জন্যে কত লোককে যে খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এ-ধরনের বিধর্মী কথা উচ্চারণ করা শুধু নয়, শোনাও নিষিদ্ধ ছিল।

ভিড়ের মানুষরা নড়েচড়ে উঠল এবং সমস্ত চোখ গিয়ে পড়ল সেই জায়গাটার দিকে যেখানে খড়ো-ছাদওলা দুই সারি মাঝখানে পিষ্ট রাস্তাটি মোড় ঘুরে চলে গিয়েছে নগরের তোরণগুলির দিকে। জনসমুদ্রের মাথার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে একজন ঘোড়-সওয়ারের মূর্তি। ইনিই আবেলার্দ। বার্নার্দের মতো তিনি হেঁটে আসেননি, এসেছেন ঘোড়ার পিঠে। তাঁকে দেখাচ্ছে যতোটা-না সাধু তার চেয়ে বেশি যোদ্ধার মতো।

ক্রুসের চিহ্ন আঁকতে আঁকতে বৃদ্ধারা ফিরে এল। তবুও ভিড়ের মধ্যে থেকে শোনা যাচ্ছিল স্পষ্ট একটি গুঞ্জন—সেটা উঠছে হয় ভয় থেকে কিংবা তারিফ থেকে।

গির্জার ভিতরে দুই বিরোধী পক্ষ মুখোমুখি হলো।

পাথরের ছাদের নিচে আলো ছিল আবছা।

ঝকঝকে দিনের আলোর পরে ভিতরে এসে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরা বিশপদের এবং গাঢ় বাদামী পরিচ্ছদ পরা সাধুদের চেনা কষ্টকর হচ্ছিল।

একান্ত ও হিংস্র আক্রমণ চালালেন বার্নার্দ। আবেলার্দের মতো তিনিও এসেছেন যোদ্ধা পরিবার থেকে। ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যতোটা-না ধর্মীয় বিচার-সভা তার চেয়েও বেশি দ্বন্দ্বযুদ্ধ। আবেলার্দের দিকে আঙুল তুলে বার্নার্দ আবেলার্দকে বললেন অ-ধার্মিক, মিথ্যাবাদী ও বিধর্মী। বললেন, "আপনি পৌত্তলিক। পৌত্তলিক দার্শনিকদের বই আপনি পড়েন ও তাদের পছন্দ করেন!"

পার্চমেণ্টের একটা গুটলি খুলে বার্নার্দ পড়তে শুরু করলেন। সংকীর্ণ জানালা-গুলো দিয়ে যতোটুকু আলো আসছিল তা পড়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তারই মধ্যে পড়তে লাগলেন। কয়েকটি বাক্য পড়তেই সকলে বুঝতে পেরে গেল তিনি পড়ছেন আবেলার্দ রচিত 'সিক্ এৎ নন্' (হ্যাঁ এবং না) বই থেকে। প্রশ্নের উভয় দিক বিচার করে তিনি সমস্ত যুক্তি উপস্থিত করেছেন এবং তার জন্যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন গির্জার অধিপতিদের রচনা থেকে। বার্নার্দ পড়লেন, তারপরে জিজ্ঞেস করলেন "এসব কথায় কি ধর্ম-বিরোধিতার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না?"

গির্জার খিলানের দিকে হাত বাড়িয়ে বার্নার্দ প্রার্থনা জানাল ঈশ্বরের ক্রোধ যেন অবিশ্বাসীর মস্তকে বর্ষিত হয়। বার্নার্দের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ ছাদ থেকে প্রতি-ধ্বনিত হয়ে ফিরে এল।

দৃপ্ত ও অনুরণিত স্বরে তাঁর কথায় বাধা দিয়ে আবেলার্দ বলে উঠলেন, "আপনার বিচার-সভার অধিকার আমি অস্বীকার করছি। একমাত্র পোপ ছাড়া আর কারও বিচার-সভা আমি স্বীকার করি না।"

ঘুরে দাঁড়িয়ে, ঋজু ও প্রখর ভঙ্গিতে গির্জার দুয়ারের দিকে গর্বোদ্ধত পদক্ষেপ করলেন। তাঁকে বেরিয়ে যেতেই হবে—সূর্যালোকের মধ্যে, বাইরের তাজা বাতাসের মধ্যে—প্রাচীন মমির কাপড়ের মতো কটুগন্ধী এই সমস্ত পাথরের দেয়াল থেকে দূরে।

আসামীর বিনা-উপস্থিতিতেই বিচারসভায় রায় মঞ্জুর হয়ে গেল—আসামী ধর্ম-বিরোধিতার অপরাধে অপরাধী।

আবেলার্দকে মঠের মধ্যে আটক করে রাখা হলো। এই ক্ষমতাধর প্রাণবন্ত মানুষটি সংকীর্ণ কুঠুরির মধ্যে জীবন কাটাতে কাটাতে দুর্বল হয়ে পড়লেন—অনেকটা জীবন্ত কবর দেওয়া মানুষের মতো।

বহু দূর থেকে শুনতে পেতেন তাঁর দয়িতার কণ্ঠ। হেলোআইজ চিঠি লিখত চেষ্টা করত তাঁর মধ্যে সাহস সঞ্চারিত করতে তাঁর আত্মমর্যাদা-জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু তাঁর ঐকান্তিক আবেদনও কোনো সাড়া জাগাতে পারল না। আবেলার্দের জবাবী চিঠি-গুলোতে পাওয়া যেতো শুধু বশ্যতা ও আত্ম-সমর্পণ। তাঁর আত্মমর্যাদা-জ্ঞান লোপ পেয়েছে, তাঁর বিচারবুদ্ধি ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তাঁর ভালোবাসা নিহত হয়েছে।

এই অবস্থায় কাঁধের ওপরে জীবনের বোঝা বয়ে আর লাভ কী? আগেকার দিনের তাঁর সমস্ত শিক্ষাকে অস্বীকার করার পরে আবেলার্দ মারা গেলেন। নিজের শতাব্দীর বিরুদ্ধে একা দাঁড়ানো বড়োই কষ্টের।

বহু বছর পরে তাঁর দেহাবশেষ হেলোআইজের দেহাবশেষের সঙ্গে সমাধি দেওয়া হয়েছিল—যেমন হয়ে থাকে অসুখী প্রেমিক-প্রেমিকা সম্পর্কে প্রাচীন গাথায়। তাদের সমাধি-ফলকের ওপরে এই কথাগুলো খোদাই করা আছেঃ "তারা অবলুপ্ত হয়েছিল শোকার্ত শ্রম থেকে এবং ভালোবাসা থেকে..."

অতএব লড়াই চলতেই থাকে—একপক্ষে তারা যারা তাদের আত্মাকে বাতাসহীন কুঠুরিতে বন্ধ করে রেখেছে, অন্যপক্ষে তারা যারা চায় দেখতে, ভাবতে ও ভালোবাসতে।

এই দুই পক্ষ পরস্পরের শত্রু নয়, বরং দুই সময়-কাল—অতীত ও ভবিষ্যৎ—গির্জার মধ্যে মুখোমুখি হয়েছে। মৃত্যুর আগে আবেলার্দ যদিও কথা ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর কাজ করে গিয়েছিলেন।...

বছরের পর বছর চলে যায়। দ্বাদশ শতাব্দী শেষ, ইতিহাসের দিনপঞ্জিকায় এখন ত্রয়োদশ শতাব্দী অধিষ্ঠিত।

প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেকের মুখে শোনা যাচ্ছে নতুন একটি নাম—আল্‌বার্টাস ম্যাগ্‌নাস, অর্থাৎ, মহান আলবার্ট। মহান আলবার্ট যখন ভাষণ দেন তখন সবচেয়ে বড়ো প্রেক্ষাগৃহেও শ্রোতাদের স্থান-সংকুলান হয় না। "মহান" উপাধিটি সবসময়েই প্রযুক্ত হয়েছে সবচেয়ে বিখ্যাত শাসক ও সামরিক অধিনায়কদের নামের সঙ্গে। কিন্তু এবারে উপাধিটি দেওয়া হয়েছে একজন মনীষীকে।

"সর্ববিদ্যা বিশারদ" মহান আলবার্ট যাদুকর রূপে গণ্য হতেন। গবেষণাগারে তিনি পর্যবেক্ষণ করতেন ধাতুর প্রকৃতি। তিনি জানতেন কোন্ ধাতু নাইট্রিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয়, কোন্ ধাতু গন্ধকের সঙ্গে যুক্ত হয়। তিনি আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং আবিষ্কার করেছিলেন যে ছায়াপথ হচ্ছে অজস্র তারার সমষ্টি। তাঁর যন্ত্রপাতির মধ্যে একটি কম্পাস ছিল, সেটি এনেছিলেন পূব থেকে। তাঁর টেবিলের ওপরে আরব, হিব্রু ও গ্রীক পাণ্ডুলিপির স্তূপ ছড়ানো থাকত।

জীবজন্তু, গাছপালা ও নক্ষত্রের সম্পর্কে তিনি বই লিখেছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত বইয়ে নতুন জ্ঞানের কথা যতো-না থাকত তার চেয়ে বেশি থাকত প্রাচীন কাহিনী। তিনি আরিস্টটলের প্রশংসা করতেন, কিন্তু তাঁর আরিস্টটল হয়ে দাঁড়াত প্রায় একজন সাধু। এমনিভাবেই মধ্যযুগের শিল্পী ও লেখকরা যীশুখৃস্টের বহু আগেকার কালের মানুষদের সাধুসন্তের ছাঁচে এঁটে ধরতেন।

তবুও বলতে হবে, "সর্ববিদ্যাবিশারদ" মহান আলবার্ট এমনকি সেই সময়েই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে ধর্মের ক্ষেত্র থেকে পৃথক করার চেষ্টা করেছিলেন।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে আরিস্টটল অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর নাম টমাস আকুইনাস। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আরিস্টটল কতখানি পরাক্রান্ত এবং এই মহান দার্শনিককে গির্জার দিকে টেনে আনতে চেয়েছিলেন। এমন একজন মিত্রকে কেন ফেলে রাখা হবে অবিশ্বাসীদের হাতে, যারা অধার্মিক আভেরোয়েসের অনুগামী?

আরিস্টটল একসময়ে সকল প্রাচীন পৌত্তলিক বিজ্ঞানকে মিলিত করেছিলেন। আরিস্টটলের সাহায্য নিয়ে টমাস আকুইনাস চেষ্টা করলেন মধ্যযুগীয় প্রাচীন বিজ্ঞানের একটি সর্ব-গ্রহণক্ষম কাঠামো নির্মাণ করতে। বিশাল এক রচনা লিখলেন তিনি, যার উদ্দেশ্য ছিল সকল প্রশ্নের জবাব দেওয়া, সকল সন্দেহকে একেবারে মূলেই নিধন করা।

আত্মা কী এবং বস্তু কী? বোধি কী এবং অনুভূতি কী? ঈশ্বর কি-ভাবে এই জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন এবং কি-ভাবে তিনি এই জগৎ শাসন করেন? শয়তান কে? কোন্ কোন্ এলাকা শয়তানের অধীন? দেবদূতরা কি আহার করে? তারা কি ঘুমায়?

টমাস আকুইনাসের বইগুলিতে এ-ধরনের শত-শত প্রশ্ন ও উপ-প্রশ্ন আছে। আর আছে প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক ও যথাযথ জবাব। যদি কেউ অন্যরকম ভাবে তাহলে সে বিধর্মী।

একটা সময় ছিল যখন ঈশ্বরতত্ত্ববিদরা মানবিক প্রজ্ঞার নিয়মকে অস্বীকার করতেন। কিন্তু টমাস আকুইনাস সে-রকম ছিলেন না। দর্শনকে তিনি বর্জন করেন নি। তিনি চাইতেন গির্জাকে সাহায্য করতে এবং ধর্ম-বিরোধিতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে হাতিয়ার হতে।

সবাই তাঁকে বলত "দেবদূততুল্য প্রাজ্ঞ"।

কিন্তু এই "দেবদূততুল্য প্রাজ্ঞ" বিধর্মীদের মৃত্যু দাবি করেছিলেন। "জাগতিক শাসকরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই মৃত্যুদণ্ড দিয়ে থাকেন জালিয়াতদের ও তৎসহ অন্যান্য দুস্কৃতি-কারীদের। তাই যদি হয় তাহলে অভিযোগ প্রমাণ হওয়া মাত্রই বিধর্মীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া আরো বেশি ন্যায়সঙ্গত।"

অবিশ্বাসীদের মাথা উড়িয়ে দাও—এই ছিল টমাস আকুইনাসের পরামর্শ। কুঠারকেই যদি তিনি সবচেয়ে সুনিশ্চিত যুক্তি হিসেবে গণ্য করে থাকেন তাহলে স্বীকার করতেই হয়, সাক্ষ্যের শক্তিতে তাঁর খুব বেশি আস্থা ছিল না। তা সত্ত্বেও দেখা গেল, ইওরোপে প্রতি বছরেই আরো বেশি-বেশি লোক সাহসের সঙ্গে সন্দেহ করতে ও ভাবতে শুরু করেছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফ্রান্‌সিস্‌কান সাধু রোজার বেকন লিখলেন, "জ্ঞান-ই শক্তি"। বিজ্ঞানের চেয়ে শ্রদ্ধেয় আর কিছু নেই। তা দূর করল অজ্ঞানতার অন্ধকার এবং জগতকে চালিত করল সুখের দিকে।

বেকন শুধু বসে ধ্যান করেন নি। বিজ্ঞানের তিনি যাচাই করেছিলেন অভিজ্ঞতা দিয়ে। কেননা, অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে জ্ঞানলাভ অসম্ভব।

৩. এবার পাঠককে দেখতে হচ্ছে একজন যাদুকরের গম্বুজ

ইংলণ্ডে অক্‌স্‌ফোর্ডের উপকণ্ঠে রোজার বেকন সারারাত্রি কাটান তাঁর গম্বুজের মধ্যে। পথচারীরা ভয়ে ভয়ে গম্বুজের সরু সরু জানলার দিকে তাকায়। মাঝে মাঝে একটা লাল শিখা ঝলক দিয়ে বেরিয়ে আসে আর একটা বিস্ফোরণে চারদিকের মাটি কেঁপে ওঠে।

এই গম্বুজের মধ্যে কী পর্যবেক্ষণ করছেন তিনি? সমগ্র বিশ্ব।

তিনি চান বিষয়ের গভীরে ডুবে যেতে, আকাশে গিয়ে হাজির হতে এবং অনুসন্ধান করে দেখতে তারাগুলো আসলে কী এবং তাঁর চোখ থেকে কত দূরে রয়েছে। তখনো পর্যন্ত চশমা আবিষ্কৃত হয়নি, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কথা তো স্বপ্নেও ভাবা যায় না। কিন্তু তবুও বেকন তখনই জানেন কাঁচের কী অসাধারণ ক্ষমতা।

হাঁসের পালকের কলম দিয়ে পার্চমেন্ট কাগজের ওপরে তিনি লিখছেন, "যে কাঁচের মধ্যে দিয়ে আমরা তাকাচ্ছি সেটি সমতল না হয়ে অবতল বা উত্তল যাই হোক না কেন, ব্যাপারটা একেবারেই বদলে যায়। তার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আমরা তখন জিনিসকে দেখি আসলে যতোটা তার চেয়ে আরো বড়ো বা আরো ছোট। আমরা দূরের জিনিসকে করে তুলতে পারি নিকটের, অদৃশ্যকে দৃশ্যমান। আমরা এমনকি সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র-গুলিকেও আমাদের আরো কাছে নিয়ে আসতে পারি এবং এমনি আরো অনেক কিছু করতে পারি। এসব যে নিজের চোখে দেখেনি সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবে না।"

বেকন তখনই এসে দাঁড়িয়েছেন অদৃশ্য জগতের দ্বারদেশে। আর একটু অগ্রসর হলেই তিনি দেখতে পাবেন মানুষের চোখ যা কখনো অবলোকন করেনি।

চোখ আসলে কী, বেকন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেন। দৃষ্টিশক্তির রহস্যটা কী?

একটি ধারালো ছুরি দিয়ে রোজার বেকন একটি ষাঁড়ের চোখ ব্যবচ্ছেদ করেন। চোখের যে আশ্চর্য ক্ষুদ্র মণির মধ্যে জগৎ প্রতিফলিত হয় তার গড়ন পরীক্ষা করে দেখেন। তারপরে কলমটা তুলে নিয়ে পুনরায় তাঁর বইয়ে লেখেন, "দৃষ্টিশক্তি রয়েছে চোখে নয়, স্নায়ুতে।"

মস্তিষ্ক আসলে কী, সেটা বুঝতে মানুষের তখনো অনেক অনেক দিন বাকি। কিন্তু রোজার বেকন তখনই বুঝে নিয়েছেন, জীব দ্যাখে শুধু তার চোখ দিয়ে নয়, মস্তিষ্ক দিয়েও। এমনিভাবে শুরু হয় চোখ দিয়ে চোখের পরীক্ষাকার্য, মস্তিষ্ক দিয়ে মস্তিষ্কের পর্যবেক্ষণ।

আলো আসলে কী, যে আলো ব্যতিরেকে এমনকি চোখও থাকে না, যে আলো ব্যতিরেকে জগৎ হয়ে যায় অন্ধকার? ছোট একটি ফুটোর সামনে তিনি তিনটি মোমবাতি বসান এবং লক্ষ করেন, পরস্পরকে ব্যাহত না করেই কি-ভাবে আলোর কিরণ একই বিন্দুর মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে। আয়নায় প্রতিফলিত সূর্যের কিরণ ব্যবহার করে তিনি কাঠে আগুন ধরান।

আলোর কিরণের সঙ্গে তিনি খেলা করেন যাদুকরের মতো, আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন আলো কী, রামধনু কী, মরীচিকা কী। ভাবেন, মরীচিকা শয়তানের আবিষ্কার নয়, আলোর কিরণের পথ যদি পরীক্ষা করা হয় তাহলে যুক্তি দিয়েই মরীচিকার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

বেকন তাঁর জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আকাশের তারা দেখেন। নীল, লাল ও সাদা আগুন নিয়ে তারাগুলো ঝিকমিক করছে। তাঁর দৃষ্টি তারামণ্ডল থেকে তারামণ্ডলে ফিরতে থাকে, যেন তিনি একটি অতি-পরিচিত পথ ধরে চলেছেন। তিনি ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছেন বিশ্বের তুলনায় পৃথিবী কত ক্ষুদ্র। সূর্যের মাপ নিয়েছেন আর জেনেছেন পৃথিবীর তুলনায় সূর্য অনেক অনেক গুণ বড়ো। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ছায়াপথের দিকে তাকিয়ে ধরতে পেরেছেন, ছায়াপথে রয়েছে লক্ষ লক্ষ তারা।

এমনিভাবে এই মনীষীর চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে উজ্জ্বল, ঝকঝকে, সাত-রঙা বিশ্ব।

লোকে তাঁকে যাদুকর বলে, যেমন যাদুকর মহান আলবার্ট। কিন্তু যাদুর ইন্দ্রজালে তাঁর বিশ্বাস অন্যদের চেয়ে কম। এই বিশ্ব ভরে আছে যতো বিস্ময়, যাদুকরের সাধ্য কি তা সৃষ্টি করে! কী আশ্চর্য ব্যাপার আমাদের এই চোখ যা দিয়ে আমরা দেখি, আমাদের এই কান যা দিয়ে আমরা শুনি, আমাদের এই মুখের কথা যা দিয়ে আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাতে পারি।

বেকন তাঁর পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা ওলটান। প্রথম পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন 'ওপাস মাজুস' (মহান রচনা)। প্রকৃতই মহান রচনা—বিজ্ঞানের সবকিছুকে বিজড়িত করে। বিজ্ঞানের অজস্র দান মানুষ যদি গ্রহণ করতে চায় তাহলে অনেক বড়ো বড়ো রহস্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।

কিন্তু কোনো কোনো রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়া উচিত নয়। একটু থেমে বেকন তাঁর গ্রন্থের সাংকেতিক লিপির দিকে তাকান। এগুলো হচ্ছে কতকগুলো গোপন চিহ্ন যার সাহায্যে তিনি তাঁর একটি পরীক্ষাকার্যের বিবরণ লিখেছেন।

একদিন তিনি কতকগুলো পরীক্ষাকার্য করতে করতে গন্ধক শোরা ও কয়লা একসঙ্গে মিশিয়েছিলেন। সেই মিশ্রিত পদার্থে আগুন ধরে যায় এবং এমন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে যে স্টোভটি টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যায়। তিনি নিজে প্রাণে বেঁচে যান। পাতাল থেকে তিনি ডেকে এনেছেন বিস্ফোরণের শয়তানকে—তিনি ভীত হন। সাংকেতিক ভাষায় লিখে রাখেন এই আবিষ্কারের বিবরণ। কাউকে জানতে না দেওয়াটাই মঙ্গল।

কিন্তু প্রকাশিত হবার সময় যখন এসে যায় তখন কোনো সাংকেতিক লিপি বা কোনো গুপ্ত চিহ্ন কোনো কিছুকে গোপন করতে পারে না। এই ভয়ংকর আবিষ্কারের কথা যখন ভাবছিলেন তখনো কিন্তু বেকনের ধারণা ছিল না যে জগতের অন্যদিকের এক দেশে গোলাবারুদ আরো আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই দেশটি হচ্ছে চীন। আরবরা এই গোলাবারুদ নিয়ে যাবে পূব থেকে স্পেনে। এমন দিন খুব দূরে নয় যখন কামানের ডাক শোনা যেতে থাকবে।

ক্ষুদ্র জিনিসের জগতের গর্ভ থেকে মানুষ সন্ধান পেয়েছে এক বিধ্বংসী শক্তির। আর পরিণামে একদিন এই শক্তি তার প্রভুর দিকেই নিবদ্ধ হয়ে পড়বে।

৪. মানুষ তারার খবর জানতে চায়

রোজার বেকন তাঁর সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তিনি কল্পনা করেছিলেন উড়ন্ত যন্ত্রের, দাঁড়ীবিহীন জাহাজের, ঘোড়াবিহীন যানের।

তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন তাঁর শতাব্দীর সন্তান। তাঁর গম্বুজটি ছিল জ্যোতিষীর মানমন্দির ও আলকেমিস্টের গবেষণাগার। বিভিন্ন ধাতু তিনি একসঙ্গে মেশান এই আশায় যে পরশপাথর আবিষ্কার করবেন—যে পরশপাথর দিয়ে যে-কোনো হীন ধাতুকে সোনায় রূপান্তরিত করা যাবে। গ্রহদের অবস্থান তিনি পর্যবেক্ষণ করেন মানুষের ভাগ্য আগে থেকে বলে দেওয়ার জন্য।

বেকন ভাবেন, জগতের সব কিছু সম্পর্কিত, এই জগতের আছে এক বিরাট সমগ্রতা, অদৃশ্য সূত্রে আকাশের জ্যোতিষ্কের সঙ্গে পৃথিবীর যোগ। চন্দ্র কি পৃথিবীতে জোয়ার ঘটাচ্ছে না? সূর্য কি পৃথিবীর গাছে ও ঘাসে প্রাণসঞ্চার করছে না?

আজকের দিনেও আমরা তাই ভাবি। পৃথিবী এই বিশ্বের অংশ। সূর্য যদি

পৃথিবীতে আলো না দিত তাহলে পৃথিবীতে প্রাণ থাকত না। আমরা জানি, আকর্ষণ খাটায় শুধু পৃথিবী নয়, অন্যান্য সব গ্রহও। কিন্তু যেহেতু আমরা রয়েছি পৃথিবীর ওপরে, আমাদের পক্ষে পৃথিবীর আকর্ষণটাই বেশি। আলো ও মাধ্যাকর্ষণ বিশ্বের সবকিছুকে যুক্ত করেছে এক বিরাট সমগ্রতায়।

আজকের দিনে এই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন বেকন বেঁচে ছিলেন তখন মাধ্যাকর্ষণের সূত্র বা আলোর ধর্ম সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানত না। পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটা তারা অস্পষ্টভাবে আঁচ করত মাত্র। তাদের মনে হতো, কোনো না কোনোভাবে নক্ষত্রের ভাগ্যের সঙ্গে মানুষের ভাগ্য সম্পর্কিত হতেই হবে।

একটুকরো পার্চমেণ্ট কাগজের ওপরে বেকন একটি চতুর্ভুজ আঁকেন। তারপরে এই চতুর্ভুজের মধ্যে আঁকেন আরো ছোট একটি চতুর্ভুজ। দুই চতুর্ভুজের মাঝখানের জায়গাকে ভাগ করেন বারোটি ত্রিভুজে, বারোটি ঘরে। প্রত্যেকটি ঘরে আঁকেন একটি তারামণ্ডল বা রাশির চিহ্ন। কোনো ঘরে একজোড়া দাঁড়িপাল্লা, কোনো ঘরে দুটি মাছ, কোনো ঘরে তীরধনুক। এইভাবেই নির্দেশিত হয় তুলারাশি, মীনরাশি, ধনুরাশি। রাশিচক্রের প্রত্যেকটি চিহ্নের জন্য একটি ঘর রাখা হয়। চতুর্ভুজের মাঝখানের জায়গাটি তিনি খালি রেখে দেন যার ভাগ্য বলা হচ্ছে তার নাম লেখার জন্য। নামের নিচে লিখে রাখেন এই ব্যক্তির জন্মের সাল, মাস ও দিন। কোনো ব্যক্তির ভাগ্য জানতে হলে হিসেব করতে হবে তার জন্মের সময়ে আকাশের কোন্ জ্যোতিষ্কের আলো নবজাত শিশুর দোলনার ওপরে এসে পড়েছিল।

কেননা, দেখাই যাচ্ছে, চন্দ্র ও গ্রহগুলি একই জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না। তারা অবিরাম আকাশের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় এবং রাশিচক্রের এক চিহ্ন থেকে অপর চিহ্নে পরিক্রমা করে। লোকে বিশ্বাস করত, প্রত্যেকটি জ্যোতিষ্কের নিজস্ব লক্ষণ আছে। চন্দ্র হচ্ছে শীতল ও বিষণ্ণ—মানুষের পক্ষে খারাপ লক্ষণ। নীল শুক্র ও উজ্জ্বল বৃহস্পতি সুখ আনে। রক্তবর্ণ মঙ্গল ও বিবর্ণ শনি শোকের পূর্বাভাস। গ্রহগুলির পথ কখনো পরস্পরকে ছেদ করে, কখনো পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। সবচেয়ে বড়ো ও সবচেয়ে জোরালো গ্রহগুলি যখন একই ঘরে মিলিত হয়, সেটা হয়ে ওঠে বিরাট ও অসাধারণ ঘটনাবলীর লক্ষণ—যেমন, রাজার রাজ্যনাশ, মহাপুরুষের আবির্ভাব, মহামারীর প্রাদুর্ভাব।

মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ করে জ্যোতিষ্কের গতিবিধি। রোগীর চিকিৎসা শুরু করার আগে চিকিৎসক গ্রহনক্ষত্রের হদিস নিয়ে থাকেন। কেননা, ধারণা করা হয় যে শরীরের এক-একটি অংশ রাশিচক্রের এক-একটি চিহ্নের প্রভাবাধীন। মিথুনরাশি নির্দেশ করে বাহু, মেষরাশি মস্তক, মীনরাশি পদ। চন্দ্র যদি মিথুনরাশিতে থাকে তাহলে চিকিৎসক কখনোই ভাঙা হাত জোড়া লাগাবার কাজে হাত দেবেন না। আরো অনুকূল লক্ষণের জন্যে তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে।

কাজ শুরু করার আগে আলকেমিস্টরা গ্রহনক্ষত্রের হদিস নিতেন। বুধ ছিল পারদের প্রতীক, চন্দ্র রুপোর, সূর্য সোনার, শনি সীসার। সূর্য যদি "পীড়িত" হয়, সূর্য যদি থাকে বিরোধী কোনো গ্রহের ঘরে, তাহলে কাজটি সফল হতে পারে না। উপরন্তু, সূর্যের চলন যদি হয় বিষণ্ণ শনির একেবারে মধ্যে, তাহলে বুঝতে হবে আরো বড়ো দুর্দশা অপেক্ষা করে আছে। তবে ধারেকাছে যদি বৃহস্পতি থেকে থাকে তাহলে যে-কোনো পরিস্থিতিতে বৃহস্পতি হয়ে উঠতে পারে ত্রাতা। বৃহস্পতি "অবরোধ তুলে নেয়" এবং সূর্যকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেয়।

রাজা, সামরিক অধিনায়ক, নাবিক—সকলেই জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হয়ে থাকে।

প্রত্যেকটি দেশের আছে নিজস্ব গ্রহ। ভারতবর্ষ শনির শাসনাধীন, বাবিলন বৃহস্পতির, মিশর বুধের।

আজ রাতে কার ভাগ্য অন্বেষণ করছেন বেকন?

তারাদের কাছে তিনি জানতে চাইছেন কোনো মানুষের ভাগ্য নয়, কোনো দেশের ভাগ্য নয়, ধর্মের ভাগ্য। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, জ্যোতিষ্করা ধর্মের ভাগ্য সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। ইহুদীরা শনির শাসনাধীন, সুরাসেনরা শুক্রের, খৃস্টানরা বুধের। বৃহস্পতি যখন বুধের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তখন খৃস্টধর্মের জন্ম। কেননা, বৃহস্পতি আনে সুখ ও শান্তি।

ভোর না হওয়া পর্যন্ত বেকন গ্রন্থগুলির পথ হিসাব করে চলেন। তাঁর হাত এঁকে চলছিল বৃত্ত ও সংকেতচিহ্ন, কিন্তু তাঁর চিন্তা ছিল স্বদেশ থেকে দূরে। তিনি ভাবছিলেন সমগ্র বিশ্বের কথা, সকল জাতির কথা। সর্বত্রই তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন অরাজকতা, নিষ্ঠুরতা ও ন্যায়হীনতা।

প্রিন্স, ব্যারন ও নাইটরা পরস্পরকে নির্যাতন ও লুণ্ঠন করত। বিরামহীন যুদ্ধ চাপিয়ে ও জবরদস্তি আদায় চালিয়ে তারা প্রজাদের সর্বনাশ করত। তারা পছন্দ করত অন্যের সম্পত্তি দখলে আনতে—গোটা জমিদারিই হোক বা রাজ্যই হোক।

লোকে প্রিন্সদের ঘৃণা করত, আর যেখানেই পারত প্রিন্সদের কাছ থেকে পালিয়ে যেত।

বণিকদের প্রত্যেকটি কথা ছিল মিথ্যা ও প্রতারণা। যাজকবৃত্তির মধ্যে পুরোপুরি ভরে ছিল দম্ভ, বিলাসপ্রিয়তা ও লালসা। প্যারিস ও অক্সফোর্ডের পণ্ডিত যাজকদের মারামারি ও গুণ্ডামি দেখে সাধারণ মানুষ বিব্রত বোধ করত। বিশপরা লোভীর মতো ধনসম্পদ আহরণ করে চলত, যে-সব আত্মার ভার তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে তাদের দিকে কোনো মনোযোগ দিত না। শঠ ধর্মপ্রচারকরা কুৎসা গেয়ে সাধারণ মানুষদের সর্বনাশ করত। পোপের দরবারে চূড়ান্ত আধিপত্য করত ঔদ্ধত্য লোভ ও হিংসা, সেখানকার কলঙ্কস্বরূপ ছিল বিলাসিতা। এমনকি পুণ্য বেদী পর্যন্ত হয়ে উঠেছিল প্রতারণা ও মিথ্যার শিকার।

মোমবাতির কাঁপা-কাঁপা আলোয় বেকনের মুখের গভীর বলিরেখা প্রকাশ পাচ্ছিল, তাঁর কপালের ভ্রূকুটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ফ্রান্সিস্কান সাধুর আলখাল্লা পরিহিত এই মানুষটি অনেকবারই নিজের ক্রোধ চেপে রাখতে না পেরে কোনো এক অনিচ্ছুক শ্রোতার কাছে সত্যকথাটি বলেছেন। ফ্রান্সিস্কান সম্প্রদায়ের যিনি প্রধান, জন বোনাভেনটুরা, তিনি যে এই মানুষটিকে পছন্দ করেন না তাতে অবাক হবার কিছু নেই। লোকে তাঁকে বলত যাদুকর, মাদারী। তাঁকেই, যিনি কিনা রোজার বেকন!

তাঁর গণনা প্রায় শেষ হয়ে আসছিল এবং গণনার ফল নির্দেশ করছিল ভয়ংকর এক সিদ্ধান্ত। ত্রিকোণ ঘরগুলিতে গ্রহের চিহ্নগুলি লিখে রাখলেন বেকন। চন্দ্র ও বৃহস্পতি একই ঘরে এসে গিয়েছে—কন্যারাশির ঘর, বুধের ঘর। কন্যারাশির আধিপত্য হৃদয়ের ওপরে, বুধের খৃস্টীয় ধর্মবিশ্বাসের ওপরে। দুটি বিরাট গ্রহের এই মিলন, বুধের ঘরে বিষণ্ণ চন্দ্র ও পরাক্রান্ত বৃহস্পতির উপস্থিতি—তার অর্থ, মানুষের হৃদয়ে ধর্মবিশ্বাসের অনিবার্য মৃত্যু। না হবেই বা কেন, ভাবলেন বেকন, যখন সময়টাই এমন যে চারদিকে শুধু দুর্নীতি ও নৈতিক অধঃপতন!

তারপরে যখন ঘুমোতে গেলেন তখন বেকনের মনে এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে পরের দিনটি হবে অতি অন্ধকার দিন।...

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে তিনি জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। একজন রাখাল তার ভেড়ার পাল গম্বুজের পাশ দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে শিশিরভেজা ঘাসের ওপরে তার হাতের ছপ্‌টি দিয়ে শপাং শপাং বাড়ি মারছে। ভোরের কুয়াশার মধ্যে ফুটে থাকা যাদুকরের গম্বুজের দিকে সে কৌতূহলের সঙ্গে তাকাল। সে যদি জানত গম্বুজের মালিক রাত্রিবেলা গ্রহতারার সঙ্গে কী আলোচনা করছিলেন তাহলে সে কী বলত কে জানে।

৫. একজন ধর্মপ্রচারকের অনুগামীর সঙ্গে পাঠকের সাক্ষাৎ হচ্ছে

বেকন কেবলমাত্র জ্যোতিষী ছিলেন না। উপরন্তু তিনি ছিলেন আলকেমিস্ট। অন্য অনেকের মতো তিনিও সন্ধান করছিলেন বকযন্ত্রের তলায় সোনার সম্পদ।

পরশপাথরের সন্ধান যিনি পাবেন, যিনি আবিষ্কার করবেন কিভাবে তামা বা সীসাকে সোনায় রূপান্তরিত করা যায়, তিনিই হবেন জগতের অধীশ্বর। কিন্তু বেকন যে কাজ করে চলেছেন সেটা এজন্যে নয় যে তিনি লোভী বা পার্থিব সম্পদ লাভ করার জন্যে আগ্রহী। বিস্ময়কর রূপান্তরণের সন্ধান করতে গিয়ে তিনি আসলে ক্ষুদ্র বস্তুর জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চাইছেন। অন্যরা সোনার সন্ধান করছে নিছক সোনারই জন্যে। তখনো পর্যন্ত জগতকে চালনা করছিল তলোয়ার ও ক্রুশ, আর তাদের ওপরে প্রভুত্ব করবার জন্যে সোনা সংগ্রাম করছিল।

রাজা ও পোপ বিনীতভাবে যাচ্ছিল মহাজনদের কাছে এবং তাদের শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করার জন্য মুকুট ও পাগড়ি বন্ধক রাখছিল। প্রত্যেক রাজার কর্মে নিযুক্ত ছিল নিজস্ব বিশেষ আলকেমিস্ট। সেনাপতিকে রাজা বলতেন, "আর একটু ধৈর্য ধর, আমার আলকেমিস্ট পরশপাথর আবিষ্কার প্রায় করে ফেলেছে। আর তখন দেখো, আমি কথা দিচ্ছি, প্রত্যেক সাধারণ সৈনিক আর প্রত্যেক অফিসার মাইনে পাবে এখন যা পাচ্ছে তার দ্বিগুণ। আর সেই মাইনে দেওয়া হবে আলকেমিস্টের ঝনঝন-করা সোনা দিয়ে।"

আলকেমিস্টের গবেষণাগারের ভেতরটা তাকিয়ে দেখেছে এমন লোক খুবই কম ছিল। আসল কথা, আলকেমিস্টের গবেষণাগারের চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভিতরে পা দেবার সাহসও বেশি লোকের ছিল না।

ভিতরে কী চলছে তা আমরা কখনোই জানতে পারতাম না যদি-না একজন ধর্ম-প্রচারকের অনুগামীর সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। এই অনুগামীটি আলকেমি নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। নিজের মন্দভাগ্য নিয়ে তাঁকে বিলাপ করতে শুনেছিলেন ইংরেজ কবি চসার এবং সেটি তিনি একটি বইয়ে লিখেছেন। বইটির নাম তিনি দিয়েছেন 'দ ক্যাণ্টারবেরি টেল্‌স'।

এই যে মানুষগুলো, যারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কখনো গলাচ্ছে কখনো ফোটাচ্ছে, কখনো মেশাচ্ছে, কখনো ধুয়ে ফেলছে, কখনো মাপ নিচ্ছে, কখনো ওজন নিচ্ছে—এদের সঙ্গে নিজের মিল দেখতে পাবে না এমন রসায়নবিজ্ঞানী আমাদের কালেই বা কে আছে।

বাতাসে নিশ্বাস নেওয়াটাও কষ্টকর। কেননা, সমস্ত রকমের নিঃসরণ-নল থাকা সত্ত্বেও বাতাস প্রায়ই ভরে থাকে বিষাক্ত গ্যাসে। আগুনে আর ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে ও জলে ভরে যায়। হাত পোড়ে আর ক্ষয়কারী অ্যাসিডের কামড়ে পরনের পোশাক

ফুটোয় ভরে ওঠে। তবুও কিন্তু কেউ গবেষণাগারের বাইরে তাজা বাতাসের মধ্যে ছুটে যায় না।

আজকের দিনের রসায়নবিজ্ঞানীদের জীবনেও অসাফল্য আছে। তাদের বেলাতেও পরীক্ষাগারের মুচি ও বকযন্ত্র কোনো কোনো সময়ে টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যায়। কখনো কখনো এমন বিস্ফোরণ ঘটে যে বহু দিনের বা মাসের কাজ মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়। ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে একজন মানুষ বাড়ি আসে। কিন্তু পরদিন সকালেই আবার ফিরে যায় তার জায়গায়, স্বচ্ছ বকযন্ত্র ছড়ানো তার কালো কাজের টেবিলে।

একজন রসায়নবিদকে তার গবেষণাগারে যে টানে—তার কারণ কী? অনুসন্ধান করার জন্যে উন্মাদনা। সেটা যেমন আছে একজন আলকেমিস্টের তেমনি একজন রসায়নবিদের। একথা সত্যি যে আলকেমিস্টরা মরীচিকার পিছনে ছুটেছিল। এই মরীচিকা আলেয়ার মতো তাদের চালিত করেছিল পরমাণুর গোপন জগতে। সেখানে লুক্কায়িত ছিল সেই অদৃশ্য শক্তি যা পাথরের দেয়াল চূর্ণ করতে পারত।

এই জগতে এসে আলকেমিস্ট না-জেনেই একের পর এক আবিষ্কার করে চলেছিল। আলকেমির সমস্তটাই ছিল ভ্রান্তি। কিন্তু এমন এক ভ্রান্তি যা সত্যের পথ তৈরি করেছিল। আলকেমি থেকে জন্ম নিয়েছিল রসায়নবিজ্ঞান।

বিজ্ঞানী যখন বুঝতে পারল পরশপাথর বলে কিছু নেই, বকযন্ত্রের তামা কখনোই সোনা হতে পারে না, তখন সে কিন্তু তার মুচি ও বকযন্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিল না। সে তখন জেনে গিয়েছিল কী আশ্চর্য এই বস্তুর জগতটি এবং এই জগতকে ছেড়ে যাবার কোনো ইচ্ছা তার ছিল না।...

৬. বিপদের আশঙ্কায় মনুষ্যজাতি

পশ্চিমে যখন প্রথম ছাত্ররা প্রথম অধ্যাপকের কাছে পাঠ নিচ্ছিল এবং প্রথম আলকেমিস্টরা প্রথম গবেষণাগারগুলির ধোঁয়ার মধ্যে কাজ করছিল, পূবে তখন চলছিল বিরাট বিরাট লড়াই, যার ফলে মনুষ্যজাতির ভাগ্য নির্ধারিত হতে যাচ্ছিল।

প্যারিসে উঁচু উঁচু গম্বুজ উঠেছিল কাঠের তৈরি বায়ুপ্রবাহ নির্দেশক ডানা ও চুড়োওলা ছাদের ওপারে। রুশদেশে মহিমামণ্ডিত গির্জার গায়ে সুপটু হাতে খোদাই করা পাথরের কারিকুরি দেখে দর্শকরা অবাক হয়ে যেত। কিন্তু অনেক দূরে, পূবে, মধ্য-এশিয়ার মরুভূমিতে ও প্রান্তরে লোকে তখনো বাস করত পশমের তাঁবুতে। তারা ফসল চাষ করত না, তাদের ঘরবাড়ি ছিল না, তারা সারাটা জীবন কাটাতো মাঠে-প্রান্তরে, তাদের বাসায় চাকা লাগানো থাকত।

যখন একদল মানুষ একটি প্রান্তর পার হবার জন্য রওনা হতো, সঙ্গে তাড়িয়ে নিয়ে যেত একদল গবাদি পশু, তখন হাজার-হাজার চাকা থেকে যে কিঁচ-কিঁচ ও খট-খট আওয়াজ উঠত তাতে প্রায় চাপা পড়ে যেত চালকদের চিৎকার। খুরের দাপানি ও ঘোড়ার ডাক শোনা যেত চারদিকে মাইলের পর মাইল দূর থেকেও। মনে হতো গোটা একটি দেশ সমস্ত পাট তুলে নিয়ে অন্য কোনো জায়গায় চলে যাচ্ছে।

পিছনে পড়ে থাকত শুধু পোড়া জমি ও পোড়া ধ্বংসাবশেষ। গবাদি পশু ও ঘোড়ার পাল সমস্ত ঘাস খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল। যাযাবররা নিজেরাই গ্রাম ও

নগরের সবকিছু নষ্ট করে গিয়েছিল। বহু বছর ধরে মানুষ যা-কিছু জমিয়েছিল সবই তারা তুলে নিয়েছিল তাদের তাঁবুতে। আগেকার মালিকরা কেউ আর বাকি থাকেনি। কাউকে কাউকে হত্যা করা হয়েছিল, অন্যদের দাস করা হয়েছিল। প্রবল এক বন্যার মতো যাযাবর সমুদ্র জগতকে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

যাযাবররা সীমান্ত ভেঙে চীনে ঢুকে পড়েছিল। মধ্য-এশিয়ার নগর ও মরূদ্যানগুলি প্লাবিত করেছিল। ককেসাসের তুষারঢাকা পর্বতে পৌঁছে গিয়েছিল। জর্জিয়ার উপত্যকা ও গিরিখাদে ভরিয়ে তুলেছিল। কৃষ্ণসাগরের তীর-বরাবর স্তেপভূমিতে বেগে ধাবিত হয়েছিল। হাঙ্গেরি ও আদ্রিয়াতিকের তীরে পৌঁছে গিয়েছিল।

এটা কেমন করে হলো যে একসময়ে যে উপজাতিরা মঙ্গোল প্রান্তরে ঘুরে বেড়াত তারাই এখন চারদিকের কৃষিকার্যরত গ্রামগুলিকে অধিকার করতে শুরু করেছে? এটা ঘটেছিল যখন মঙ্গোল উপজাতিগুলিকে একটি শক্তিশালী তাতার সাম্রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ করেছিল একজন প্রতিভাবান ও সাহসী নেতা—চেঙ্গিস খান।

চেঙ্গিস খান ও তার সেনাপতিরা জয় করতে পেরেছিল উত্তর চীন, পূর্ব তুর্কিস্তান ও মধ্য-এশিয়া, এবং আক্রমণ করেছিল ট্রান্‌স্‌ককেসাস ও পূর্ব ইওরোপ। ১৯২৭ সালে যখন চেঙ্গিস খানের মৃত্যু হয় তখন তার উত্তরাধিকারীরা তার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গোটা বিশ্ব তাতার বাহিনীর অগ্রগতির দিকে চোখ রেখেছিল। রোমান পোপ স্থির করলেন মহান খানের দরবারে কয়েকজন দূত পাঠিয়ে তার সঙ্গে একটি শান্তি ও বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করবেন।

দীর্ঘ পথে যাত্রা শুরু করলেন তিনজন সাধু—ইতালি থেকে গিওভানি কারপিনি, চেজিয়া থেকে স্তেফান, পোল্যান্ড থেকে বেনেডিক্‌ট। ঘোড়ার পিঠে চেপে, মাঠ ও প্রান্তর পেরিয়ে, একশো-ছয় দিন ধরে তাঁদের যাত্রা চলল। তাঁরা পার হলেন নীপার, ডন ও ভল্‌গা এবং অবশেষে মধ্য-এশিয়ার মরুভূমিতে পৌঁছলেন। মাঝে মাঝে তাতারদের দ্বারা বিধ্বস্ত দেশ পার হয়েছিলেন। চারদিকে ঘাসের ওপরে ছড়িয়ে ছিল শুধু খুলি ও হাড়। এমনকি বড়ো বড়ো নগরেও আশ্রয় খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একসময়ে যেখানে শত-শত ঘরবাড়ি ছিল, এখন সেখানে পড়ে আছে গুটিকতক মাত্র। অবশেষে তাঁরা খানের সদরদপ্তরে পৌঁছলেন।

মহান খানের কাছে আনুগত্যের শপথ নেবার জন্যে এশিয়ার সমস্ত এলাকা থেকে চারহাজার রাষ্ট্রদূত ও সেনানায়ক তখন সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন রোমান পোপের তিন রাষ্ট্রদূত। খানের সদরদপ্তরের একেবারে ঠিক মাঝখানটিতে প্রকাণ্ড একটি তাঁবু খাড়া করা হয়েছিল। এই তাঁবুতে প্রতিদিন সকালে দু-হাজার মানুষের সমাবেশ ঘটত।

প্রথম দিন সকালে তারা সকলে পরত সাদা পোশাক, দ্বিতীয় দিন লাল, আর তৃতীয় দিন নীল। মহান খানের আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করতে করতে রাষ্ট্রদূতরা কার্পেটের ওপরে বসে থাকতেন ও ঘোটকীর দুধ পান করতেন। সবার চোখ নিবদ্ধ হয়ে থাকত সেই দরজার ওপরে যার মধ্যে দিয়ে একমাত্র তিনিই প্রবেশের অধিকারী। অবশেষে পারিষদ-পরিবৃত হয়ে তিনি আবির্ভূত হলেন। পারিষদরা সুন্দর সুন্দর পাখা দিয়ে তাঁকে হাওয়া করতে লাগল। হাজার হাজার মানুষ তাঁর সামনে নতজানু হলো।

দেখে মনে হচ্ছিল মহান খানের সামনে গোটা বিশ্বজগৎ নতজানু হতে প্রস্তুত।

পোপের রাষ্ট্রদূতদের তিনি দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করিয়ে রাখলেন এবং অবশেষে

তাঁদের হাতে তুলে দিলেন আরব, লাতিন ও মঙ্গোলীয় ভাষায় লেখা একটি লিপি। এ থেকে মনে হতে পারে, তাঁর বন্দীদের মধ্যে সকল জাতির প্রচুরসংখ্যক শিক্ষিত মানুষ ছিল। চিঠিতে রোমান পোপের কাছে তিনি লিখেছিলেন:

"সকল রাজার প্রধান হয়ে আপনাকে অবশ্যই সশরীরে উপস্থিত হতে হবে এবং আমাকে সেবা করার ও সম্মান করার শপথ নিতে হবে। এ-কাজ যদি আপনি করেন তাহলে আপনার আনুগত্য আমরা গ্রহণ করতে পারি। যদি না করেন তাহলে জানব আপনি আমাদের শত্রু।"

এই ছিল জবাব যা নিয়ে সেই তিনজন সাধু সাতহাজার মাইল পথ ধরে ফিরে গেলেন।...

বিশ্বের ওপরে ভয়ংকর একটা আশঙ্কা ঘনিয়ে এল। বর্তমানের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে রত হলো অতীত—অর্থাৎ, স্থায়ীভাবে বসবাসকারী কৃষিকার্যরত মানুষদের সঙ্গে যাযাবর উপজাতিরা।

সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার, এই বর্বররা মধ্য-এশিয়ার জাতিগুলির কাছ থেকে সামরিক কায়দা-কানুন শিখে নিয়েছিল। সেটা তারা আগে জানত না। কোনো নগরের প্রাচীরের সামনে এসে যখন হাজির হতো তখন তারা সামনে বাড়িয়ে দিত তাদের দখলকারী যন্ত্র। সেই যন্ত্র থেকে অবরুদ্ধদের মাথার ওপরে বর্ষিত হতো বিশাল বিশাল পাথরের গোলা—গুলতি থেকে উৎক্ষিপ্ত নুড়ির মতো। প্রাচীরের ওপর দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হতো জ্বলন্ত আলকাতরা ভরা পাত্র এবং তা থেকে ঘরবাড়িতে আগুন ধরে যেত। নগরের তোরণের লোহার পাত ভাঙবার জন্যে ভারী ভারী কাঠের লগুড় দিয়ে ঘা মারা হতো।

তাতাররা নগরের পর নগর অধিকার করে নিল এবং অধিকার করে চলল।

কী হতো তাহলে যদি ইওরোপের সমস্তটাই তারা দখল করে নিত?

তাহলে দীর্ঘকালের জন্যে এই জগতকে পিছনদিকে ঠেলে দেওয়া হতো। তাতাররা ধ্বংস করে ফেলত সবচেয়ে বিখ্যাত সব নগর। পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হতো এমন সমস্ত কিছু যা নিয়ে মানুষের গর্ব—পুস্তক, চিত্র, মূর্তি। চূর্ণ-বিচূর্ণ হতো সুন্দর সুন্দর রঙ করা কাঁচের জানলাগুলি। আর প্যারিসের গির্জাগুলিকে তাতাররা বানিয়ে তুলত তাদের ঘোড়া রাখার আস্তাবল।

কিন্তু আগুয়ান তাতারদের পথ রুদ্ধ করেছিল একটি বাঁধ।

রুশ নগরগুলির প্রাচীরের গায়ে বিশাল বিশাল ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়েছিল তাতারদের ওক-কাঠের লগুড়। পাথরের প্রাচীর ধসে পড়ল, কিন্তু তার পিছনে রাতারাতি তৈরি হয়ে গেল কাঠের গুঁড়ির তৈরি নতুন প্রাচীর। প্রত্যেকটি নগর হয়ে দাঁড়াল তাতারদের সামনে বাধাস্বরূপ। ছুটে-আসা তাতার সমুদ্রের পথে সমগ্র রুশদেশ যেন একটি বাঁধ।

যদি একটি ফাটল না থাকত তাহলে এই বাঁধই আক্রমণ রুখে দিতে পারত। দুর্ভাগ্যের কথা, রুশরা তখনো পর্যন্ত একটি দৃঢ়-ঐক্যবদ্ধ জাতিতে আঁটো হতে পারেনি। ১২২৪ সালে যখন একজন প্রিন্স কাল্কা নদীর তীরে শত্রুর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তখন অন্যারা বিন্দুমাত্র গা না নড়িয়ে একটা পাহাড়ের চুড়ো থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। ওদিকে তখন তাতার ঘোড়সওয়ার বাহিনী রুশ সৈনিকদের শরীর মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে।...

পুব থেকে যে কটু ধোঁয়া আসছে তার ভয়ে গোটা পশ্চিম কম্পমান। এই ধোঁয়া উঠছে কোনো একটি জ্বলন্ত বাড়ি থেকে নয়, কোনো একটি নগর থেকে নয়—কুড়ি কুড়ি

নগর থেকে। তাতার সমুদ্র বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে এসেছে এবং ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে রুশ পোল ও চেকদের দেশ।

চেকরা তাদের দেশ রক্ষা করতে পেরেছিল, কারণ পর্বতময় দেশটি প্রতিরক্ষার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। তাতার ঘোড়সওয়ার বাহিনী খোলা মাঠে অভ্যস্ত, পার্বত্য এলাকায় কি-ভাবে লড়াই চালাতে হয় তা তারা জানত না। তাছাড়া রুশদেশে যুদ্ধ করতে গিয়ে তারা গুরুতর রকমের দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

আর তখন পশ্চিম থেকে সুইডেনবাসী ও জার্মানরা ঝাঁপিয়ে পড়ল রুশদের ওপরে। রুশরা তাদের বুক দিয়ে ইওরোপকে তাতারদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। আর এখন কিনা তাদের পশ্চিমী প্রতিবেশীরাই তাদের বুকে ছুরি বসিয়ে দিল।

সুইডেনবাসীদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে নেভা নদী পর্যন্ত ছুটে গেল রুশরা, আর জার্মান যোদ্ধাদের পরাজিত করার জন্যে লেক পাইপাস পর্যন্ত।

রুশরা তাতারদের আবার এশিয়ায় তাড়িয়ে দিতে পারেনি, কিন্তু তারা তাদের কাজ করেছিল। তাতারদের থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিমের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার মতো শক্তি তাতারদের ছিল না। বিদ্রোহী অনধিকৃত রাশিয়াকে পিছনে রাখতে তাতাররা ভয় পেয়েছিল। তাতাররা আর অগ্রসর হয়নি, কিন্তু রুশদের জীবনে দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছিল। তাদের বহু নগর হয়ে গিয়েছিল ধ্বংসস্তূপ মাত্র। অধিবাসীদের মধ্যে যারা পালিয়ে যেতে পেরেছিল তারা লুকিয়ে ছিল জঙ্গলে। যে জঙ্গল একদিন মানুষই পরিষ্কার করেছিল, সেই জঙ্গলই আবার গ্রাস করতে শুরু করেছিল আবাদী জমি। গ্রামের পথঘাট নতুন ঝোপে ভরে গিয়েছিল। অল্প কিছুকাল আগেও যে-সব গ্রামে মানুষ বাস করত সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল বন্য জন্তুজানোয়ার।

মনে হতে লাগল, ইতিহাসের বিরাট ঘড়িটির কাঁটা আবার পিছনদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, একজন কাহিনীকার লিখেছিলেন, "পুস্তক হচ্ছে নদীর মতো যা পৃথিবীকে জল দেয়; পুস্তক জ্ঞানের উৎস। পুস্তকের মধ্যে আছে অপরিমেয় গভীরতা। দুঃখের সময়ে আমরা পুস্তক থেকে সান্ত্বনা লাভ করি।"

রুশদের জীবনে এই ভয়ংকর দিনগুলি যখন এসে পড়ল তখন তারা চেষ্টা করল শত্রুর হাত থেকে তাদের সান্ত্বনাস্থল পুস্তকগুলি বাঁচাতে। যখনই কোনো নগরের দিকে শত্রু এগিয়ে আসত তারা তাদের পুস্তকগুলি নিয়ে লুকিয়ে রাখত আশেপাশের গ্রামের পাথরের গির্জার মধ্যে।

সেইসব পাণ্ডুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা ঝকঝক করত সোনায়, জ্বলজ্বল করত রক্তিমতায়—কি-ভাবেই না লোকে সেগুলি রক্ষা করত। সামান্য একটুও যেন না ছেঁড়ে সেজন্যে সযত্নে ব্যবস্থা নিত। চামড়া দিয়ে মোড়া নিরেট বাঁধাইয়ে শক্তভাবে বেঁধে রাখত, তামার পাত ও চাকতি দিয়ে অলংকৃত করত, কব্‌জা ও তালা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখত। এই মূল্যবান পুস্তকগুলি স্তূপ হয়ে জমে ছিল গির্জার পাথরের মেঝের ওপরে। কিন্তু এমনকি সেখানেও আগুন থেকে বাঁচতে পারেনি। বহু বছর ধরে ধৈর্যের সঙ্গে করা কাজ এক লহমার মধ্যে হিংস্র আগুনে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

লিপিকররা ধৈর্যের সঙ্গে ও মমতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিল যে-সব উজ্জ্বল পৃষ্ঠা তা চোখের পলকে নখের আকার ধারণ করেছিল এবং ঘোর রক্তিম শিখায় ফেটে পড়েছিল।

"বিদ্যার নদী ওরা শুকিয়ে ফেলেছিল, জ্ঞানের উৎস ওরা শূন্য করেছিল।" একজন কবি বলেছিলেন।

কিন্তু রুশদেশের মানুষ অতীতকে ভোলেনি। আর তাদের ছিল ভবিষ্যতে আস্থা।

উত্তরের অরণ্যের কোনো এক স্থানে আমাদের অজানা এক কবি তাঁর মাতৃভূমির উদ্দেশে একটি গান রচনা করেছিলেন। গানটির নাম 'রুশভূমি ধ্বংস হওয়ার উপাখ্যান'। রুশভূমিতে যে দুর্দিন শুরু হয়েছিল—এটি তারই গান।

এই গানের প্রথম দিকের মাত্র কয়েকটি লাইন আমাদের হাতে এসেছে। এই লাইনগুলিতে পাওয়া যায় রুশদেশের প্রতি পূর্ণ ভালোবাসা এবং রুশদেশের শক্তিতে সগর্ব আস্থা।

রুশদেশের মানুষ মনোবল হারায়নি।

৭. বড়ো মানুষের জয়যাত্রা

কিন্তু বড়ো মানুষকে জয় করা সহজ ছিল না।

যারা বেঁচে ছিল তারা একটু একটু করে অন্ধকার অরণ্য থেকে শহরের দিকে ফিরে আসতে শুরু করেছিল। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, তারা ভাবত তাদের জীবনে সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছে। তাদের ঘরবাড়ি বলতে কিছু নেই এবং তাদের অনেকেরই নিকটতম আত্মীয়রা বেঁচে নেই। চারদিকে শুধু শূন্যতা। তাদের জন্মভূমি নগরগুলিকে চেনা যায় না। এমনকি তাদের নিজেদেরও সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখাচ্ছে। তাদের চুল অকালে পেকে গিয়েছে, তাদের কপালে গভীর বলিরেখার চিহ্ন পড়েছে।

পুরনো জীবন চিরকালের মতো চলে গিয়েছে। তাদের আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।

আবার শোনা যেতে লাগল কুড়ুলের ঘা পড়ার শব্দ। গুঁড়ি চিরে চিরে তৈরি হতে লাগল তক্তা। তক্তায় তক্তায় জোড় লাগল। গুঁড়িগুলোতে তখনো টাটকা পিচের গন্ধ, সেই অবস্থাতেই তাদের একের পর এক জায়গামতো বসানো হলো। যে-সব ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তাদের জায়গায় দেখা দিল নতুন ঘরবাড়ি। নতুন গ্রামকে ঘিরে তৈরি হলো নতুন দেয়াল। আঁকাবাঁকা নদীর ওপরে গড়ে উঠল মস্কোর নগর, ক্রেমলিনের চারদিকে, চক্রাকারে—বড়ো গাছের মতো। আর মস্কোর চারদিকে গড়ে উঠল ও ছড়িয়ে পড়ল রুশ রাজ্য। মস্কোর লোভী প্রিন্সরা গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর দখল করে নিল। মস্কো রাজ্য বড়ো হয়ে উঠল এবং লক্ষ-লক্ষ মানুষকে ঐক্যবন্ধ করল।

শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে গেল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর জায়গায় এল চতুর্দশ শতাব্দী। মস্কো রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং তাতারদের সঙ্গে সংগ্রামে শক্তি-পরীক্ষায় প্রস্তুত হলো।

একসময়ে রুশ প্রিন্সরা এক-একজনে তাতারদের সঙ্গে মাঠে-ময়দানে লড়াই করেছিল। এবারে তারা একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। তাদের নেতৃত্বে ছিল মস্কোর প্রিন্স দ্মিত্রি ইভানোভিচ, তাঁর পরিচালনায় ছিল বিশাল এক সুসজ্জিত বাহিনী।

এবারে আর তাতাররা রুশ সৈন্যদের মাড়িয়ে যেতে পারেনি। রুশরা ডনের স্তেপভূমির ওপর দিয়ে তাতারদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল।

মস্কো ছড়িয়ে পড়ল ও আরো শক্তিশালী হলো। ক্রেমলিনকে ঘিরে এখন আর ওক্‌কাঠের দেয়াল নয়, পাথরের দেয়াল উঠেছে। সুদক্ষ কারিগররা তৈরি করছে গির্জা ও মঠ এবং মস্কোয় ও অন্যান্য রুশ নগরে রাজকীয় কামরা।

রুশ চিত্রকরদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বিখ্যাত সেই আন্দ্রেই রুবলেভ বড়ো দরবারের প্রিন্সদের জন্যে এঁকেছেন "যীশুর জন্মবার্তা জ্ঞাপন উৎসবের প্রস্তর গির্জা"। কিন্তু রুবলেভের যেটি সেরা চিত্র তার নাম 'ট্রিনিটি'* এটি তিনি এঁকেছেন সেণ্ট মারগিয়াস-এর ট্রিনিটি মঠে।

একটি টেবিলের ধারে তিনজন দেবদূত বসে আছেন। টেবিলের ওপর রয়েছে এক-বাটি ফল। দেবদূতরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন না; কোনো কিছু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছেন। তাঁদের নোয়ানো মাথা, তাঁদের পোশাকের আলগা ভাঁজ—এসব প্রাচীন গ্রীসের মূর্তি থেকে ভিন্ন নয়। কিন্তু গ্রীক শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা মূর্ত করেছেন কেবলমাত্র সুন্দর সুন্দর দেহ, আর রুশ শ্রেষ্ঠশিল্পী প্রকাশ করেছেন একই সঙ্গে সুন্দর সুন্দর আত্মাও।

রুবলেভের আঁকা দেবদূতদের দিকে তাকালে মনে হবে বিষণ্ণ এক রুশ সঙ্গীত যেন শোনা যাচ্ছে। মাঝখানটিতে যে দেবদূত বসে আছেন তার পিছনে রয়েছে একটি গাছ। ঝড়ে গাছটি বেঁকে গিয়েছে, কিন্তু ভেঙে যায়নি। গাছের পিছনে একটি পাহাড়। এই গাছ ও এই পাহাড় অনেকটা ধুয়োর মতো—দেবদূতের বিষণ্ণভাবে নোয়ানো মাথার বক্রতাকে দু-বার নতুন করে প্রকাশ করছে।

'প্রিন্স ইগরের গাথাতে'ও ঠিক একইভাবে মানুষের আত্মার সঙ্গে প্রকৃতির বৈপরীত্য দেখানো হয়েছে। "ব্যস্ততায় ঘাস ঝুঁকে পড়েছে, বিষণ্ণতায় গাছ মাটিতে নুয়ে গেছে।"

রুবলেভ তাঁর চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন দুঃখ ও শান্তি। শান্তি মুক্তির ও আসন্ন স্বর্ণ-যুগের। দুঃখ সেই সময়ের যখন—সেই গানের কথায় যা বলা হয়েছে—রুশেরা "বন্দিদশায় তাতার মন্দভাগ্যের অংশভাগী হয়েছিল"।

তাতার খান পুনরায় তার বাহিনী মস্কোর বিরুদ্ধে চালিত করল। কিন্তু সেই বাহিনী এখন আর আগের মতো নেই। আর রুশরাও বদলে গিয়েছে। রুশরা যেখানে যুদ্ধরত প্রিন্সদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে একটি রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ করছিল, তাতার সোনালী বাহিনী সেখানে যুদ্ধরত খানদের মধ্যে ভেঙে পড়ছিল। এবারে দেখা গেল, রুশ প্রিন্সরা নয়, তাতার খানরাই নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে। ইতিহাসের মহা-রাজপথে রুশ আরো এক পা অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতাররা থেকে গিয়েছিল আগের মতোই পশ্চাদপদ। মাত্র সম্প্রতিকালেই তারা দীর্ঘকাল আগেকার সেই রুশদের সমকক্ষ হতে পেরেছে।

অনাহূত অতিথিরা মস্কোর তোরণের কাছে উপস্থিত হলো। রুশেরা বেরিয়ে এল তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। কিন্তু এবারে সব কিছু অন্যরকমের হয়ে দাঁড়াল। অতিথিরা ভোজনের জন্যে অপেক্ষা করল না। রুশদের সঙ্গে লড়াই করার সাহসই তাদের ছিল না। তারা কিছুক্ষণ পাঁয়তারা করল, তারপরে ঘুরে দাঁড়িয়ে যেখান থেকে তারা এসেছিল সেখানেই ফিরে গেল।

দুই শতাব্দী ধরে ইওরোপের বাকি অংশের সঙ্গে রুশদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু এখন সেই জগৎ, তাতাররা যে-জগতকে টুকরো-টুকরো ও ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল, আবার একসঙ্গে জোড়া লাগতে শুরু করল।

একটা সময় ছিল যখন একজন রুশ রাজকুমারী ছিলেন ফ্রান্সের রানী, যখন অন্য

---

* ট্রিনিটি—পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা: খৃস্টানদের মতে ঈশ্বরের এই তিন রূপ বা বিভূতি—অ

একজন রাজকুমারী নরওয়ের রাজা হ্যারল্ডকে বিয়ে করেছিলেন। একটা সময় ছিল যখন ইওরোপের অন্যান্য রাজধানীর সঙ্গে কিয়েভ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল, যখন কিয়েভের প্রিন্সরা কথা বলতেন যেমন রুশ ভাষায় লাতিন, গ্রীক ও জার্মান ভাষায়।

কিন্তু এখন, দুই শতাব্দী ধরে, পশ্চিমীরা রুশদের কথা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ভুলে গিয়েছে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের কিছু কিছু লোক বলত, পোল্যান্ড লাতভিয়া ছাড়িয়ে রয়েছে বিরাট এক দেশ, "যে দেশ শাসন করে—না তাতাররা, না পোল্যান্ডের রাজা।" রুশদের সঙ্গে ভালো পরিচয় ছিল ল্যুবেক ও ব্রেমেনের জার্মান বণিকদের। বণিকদের হান্‌সিয়াটিক লীগের দপ্তর ও গুদাম ছিল নভ্‌গোরদ। কিন্তু তাদের বাণিজ্যের এলাকায় অন্য কোনো বিদেশীর অনধিকার প্রবেশ ঘটুক, এটা তারা চাইত না।

তাতারদের সোনালী বাহিনী বহু টুকরোয় ভাগ হয়ে গেল। রুশ প্রিন্সদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একটি রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ হলো। মস্কো এখন আর ৎভের বা রিয়াজানের সঙ্গে যুদ্ধরত নয়। তারা অবশেষে খুঁজে পেয়েছে সেই "একীভূত অন্তঃকরণ", ভ্লাদিমির মোনোমাকের সময়ে কাহিনীকার যার স্বপ্ন দেখেছিলেন। মস্কোয় এখন আর মস্কোর প্রিন্সরা নেই, আছেন সমগ্র রাশিয়ার প্রভুরা।

প্রথম দলের রাষ্ট্রদূতরা মস্কো থেকে পশ্চিমে গেল। পাওলো গিওভিও নামে একজন লেখক একটি বই লিখলেন—'মস্কো দূতাবাস সম্পর্কে'। বইটি প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি করল। পাঠকরা চিঠি লিখে গিওভিওকে জানাল যে তিনি "এক নতুন জগৎ আবিষ্কার করেছেন।" আর একজন দর্শন-প্রেমিক উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জানাল, "গিওভিও, মস্কোভি সম্পর্কে তোমার লেখা যখন পড়ি, আমার কি মনে হয় জান? ডিমোক্রিটাস অন্য যে জগতের কথা বলেছেন সেই জগতে আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি।"

রাশিয়া থেকে রাষ্ট্রদূতরা গেল ভেনিস ও রোমে। তাদের বলা হলো বিদেশে গিয়ে তারা যেন খোঁজ করে এমন কারিগর পাওয়া যায় কিনা যারা মাটি থেকে আকরিককে পৃথক করতে পারে, যারা জানে নগর কি-ভাবে সাজাতে হয়, যারা কামান দাগতে পারে, যারা পাথরের অট্টালিকা নির্মাণ করতে পারে, যারা রুপোর সিন্দুক ঢালাই করতে জানে।

মস্কোতে পুরো দমে কাজ হচ্ছিল। স্থানীয় কারিগরদের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না, তাই বিদেশীদের ডেকে আনতে হচ্ছিল। ক্রেমলিনে ধুলো জমে উঠেছিল স্তম্ভের সমান উঁচু হয়ে। পুরনো আধভাঙা অট্টালিকা ও গির্জাগুলি ভেঙে ফেলে দিয়ে সে-জায়গায় তারা নতুন করে তুলছিল।

রুশ ও বিদেশী কারিগররা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছিল। এরমোলিন নামে একজন কারিগর ও পাথরের কাজে পটু তার রাজমিস্ত্রীদের ওপরে শক্ত একটা কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল। তা হচ্ছে খৃস্টের স্বর্গারোহণের গির্জাটি পুনরায় নির্মাণ করা। এই গির্জাটি পড়ে গিয়েছিল এবং তার খিলানগুলো সঠিক বিন্যাস থেকে সরে গিয়েছিল।

এরমোলিন স্থির করেছিল খিলানগুলো ভেঙে না ফেলে মেরামত করবে, যাতে যা-কিছু ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে তা যেন বজায় থাকে। কাজটা সহজ ছিল না। রাজমিস্ত্রীদের প্রথমে টেনে নামাতে হয়েছিল পড়ে-যাওয়া ভাঙা ইটগুলো তারপরে খিলানগুলোকে চৌকোণা করে তুলতে হয়েছিল। খিলানগুলো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার আশংকা ছিল প্রতি মুহূর্তে। এজন্যে দরকার ছিল শুধু নৈপুণ্য ও সাহস নয়, জ্ঞানও।

এরমোলিন ও তার সংগীরা পদার্থবিদ্যার পাঠ নিয়ে কাজ করতে এসেছে, এমন ভাবার

কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু অভিজ্ঞতার পুস্তকে তারা একাধিক বার দৃষ্টিপাত করেছিল। কাজ করতে করতে, ভারী পাথর নিয়ে হিমসিম খেতে খেতে তারা জেনে গিয়েছিল ভারসাম্যের নিয়ম।

পাথর সরাতে হলে তারা ব্যবহার করত লিভার। পাথর তুলতে হলে তারা ব্যবহার করত 'কাঠবেড়াল'—সে-যুগে পুলির এই নাম ছিল।

কারিগররা যে-কাজের ভার নিয়েছিল তা তারা শেষ করল। গির্জাটি আবার উঠে দাঁড়াল অখণ্ড রূপ ও অক্ষত অবয়ব নিয়ে। দেখে মনে হচ্ছিল, গির্জাটিকে কখনো আগুন স্পর্শ করেনি। একজন কাহিনীকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তার মধ্যে এই ঘটনারও বিবরণ দিয়েছেন: "সম্পূর্ণ গির্জাটি তারা ভাঙেনি, ভেঙে নামিয়েছিল অট্টালিকার বাইরের দিকের সমস্ত পোড়া পাথর আর খিলানগুলিকে এবং একত্রিত করে সম্পূর্ণ করেছিল। আর এই অসাধারণ কাজ দেখে সকলেই চমৎকৃত হয়েছিল।..."

ইতালীয় স্থপতি আরিস্ততল ফিওরাভেন্তি প্রাচীন রুশ মডেল দেখে ক্রেমলিনের উসপেন্‌স্কি গির্জাটি নির্মাণ করেছিল। রুশ ও বিদেশীরা একসঙ্গে হাত লাগিয়ে কাজ করেছিল যাতে আস্তরের মিশ্রণ আরো "আঠালো" করা যায়। মস্কোর মানুষ অবাক হয়ে দেখেছিল ভারী ভারী পাথর টেনে তোলার জন্য কী প্রকাণ্ড এক চাকা ব্যবহার করা হচ্ছে।

এটির পরে আরো গির্জা তৈরি হয়েছিল। আর মহান প্রিন্সের জন্যে নির্মিত হয়েছিল একটি প্রাসাদ। যে প্রকোষ্ঠে বসে প্রিন্স রাষ্ট্রদূতদের অভ্যর্থনা জানাতেন সেই প্রকোষ্ঠ রাজমিস্ত্রীরা তৈরি করেছিল মাজাঘষা ও পলকাটা পাথর দিয়ে।

ক্রেমলিনকে ঘিরে ছিল চওড়া উঁচু পাথরের দেয়াল। তার আকারটি ছিল ত্রিভুজের মতো, ত্রিভুজের প্রত্যেকটি কোণে ছিল একটি করে গম্বুজ, প্রত্যেক পাশে সাতটি করে গম্বুজ। চারদিকে ছড়িয়ে পড়া রাস্তা ও গাছপালা নিয়ে যে মস্কো তার ওপরে ক্রেমলিন মাথা তুলেছিল প্রবল এক দুর্গের মতো। এখানে-ওখানে রাস্তাগুলো ইতিমধ্যেই পাটাতন দিয়ে মোড়া হয়ে গিয়েছিল। মস্কো বেড়ে উঠছিল যেমন বাইরের দিকে তেমনি ওপরের দিকে।

উত্তরের এই রাজ্য সম্পর্কে ক্রমেই বেশি-বেশি গুজব পশ্চিমের দেশগুলিতে পৌঁছে গিয়েছিল। এই নতুন শক্তিশালী রাজ্যটি কেমন তা জানার জন্যে পশ্চিম থেকে দলে দলে লোক পাঠানো হলো।

পোপেল নামে একজন জার্মান যোদ্ধা মস্কোয় হাজির হলো। কিন্তু মস্কোর লোকেরা তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিল। অতিমাত্রায় কৌতূহলী এই বিদেশীকে তারা বিশ্বাস করতে পারেনি। দেশে ফিরে গিয়ে পোপেল তার দেশবাসীদের এই ভ্রমণের কথা জানাল। বলল যে মুসকোভি রুশ পোল্যান্ড ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত হয়েছে: কারও অধীন সে নয়—না পোল্যান্ডের, না তাতারদের: তার শাসক পোল্যান্ডের রাজার চেয়েও ধনী।

সম্রাট তৃতীয় ফ্রীডরিখ পোপেলকে আবার মস্কোয় পাঠালেন তৃতীয় ইভানের কাছে দৌত্য করার জন্য। রুশ শাসককে বললেন, তিনি যেন বাডেনের সামরিক শাসকের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেন। আর এই কাজের জন্যে তিনি লাভ করবেন রাজোচিত একটি পদবী।

ইভান রাজদূতের কাছে এই বার্তা পাঠালেন, "আপনি আমাদের কাছে রাজত্বের কথা বলেছেন। তাহলে শুনে রাখুন, ঈশ্বরের কৃপায় আমরা নিজেদের দেশে শাসক হয়েই আছি—সেই একেবারে গোড়া থেকেই, সেই আমাদের প্রথম পূর্বপুরুষদের সময় থেকেই।...

আগেকার কালে যেমন ছিল, এখনো তেমনি কারও কাছ থেকে হুকুম শুনতে আমরা রাজী নই।..."

"সারা রুশ"-এর শাসক রাজা হিসেবে "প্রতিষ্ঠিত" হতে চাননি। রুশী মানুষ বিশ্বের অঙ্গনে নতুন করে প্রবেশ করেছে। জানতে পারছে নিজেদের সামর্থ্য।

মস্কোর প্রিন্সরা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিল মোনোমাকের টুপি। কোমল ছিল এই টুপি এটি সেই রাজমুকুট যা বাইজানটিয়ামের সম্রাট ভ্লাদিমির মোনোমাকের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তার সঙ্গে ছিল একটি স্ফটিকের পাত্র যা থেকে, শোনা যায়, রোমান অগাস্টাস "ফূর্তি করেছিলেন"।

তৃতীয় ইভান সম্পর্কে এই কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি সাড়েতিনশো বছর আগে রুশ মানুষের চিন্তাধারা কেমন ছিল। এই মানুষরা বিশ্বাস করত যে রুশদেশের ভবিতব্য হচ্ছে বিশ্ব-জ্ঞানালোকের এমনই এক দুর্গ হয়ে ওঠা যেমনটি একসময়ে ছিল রোম ও বাইজানটিয়াম।

তৃতীয় ইভান সম্পর্কে এই কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি সাড়ে তিনশো বছর আগেকার কালের মতো গ্রাম আর ছিল না। হয়ে উঠেছিল কোলাহলমুখর রাজধানী নগর।

ক্রেমলিন বাজারের বিপণিগুলোতে বণিকরা একই সঙ্গে খুলে দেখাত চীনা সিল্ক ও ভেনিসীয় ভেলভেট। বাতির দোকান ও লতাপাতার দোকানের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে নিশ্বাসে পাওয়া যেত মস্কোর হিমশীতল বাতাসের সঙ্গে সুদূর ভারতবর্ষ থেকে আসা বীজ ও গুল্মের ঝাঁঝালো গন্ধ।

ইতালীয় বণিকরা কৃষ্ণসাগরের পথ ধরে মস্কোতে আসত। পথে স্বদেশবাসীদের সঙ্গে বিশ্রাম নিত ক্রিমিয়ার ইতালীয় ঘাঁটিতে। তখন রুশরা তাদের মাল বহন করে নিয়ে যেত তুর্কী ও পারসিক বাজারে। আর ৎভের-এর বণিক আফনাসি নিকিতিন তিনটি সাগর পেরিয়ে ভারতে গিয়েছিলেন, যেখানে ইওরোপ থেকে মাত্র অল্প কয়েকজনই কখনো যেতে পেরেছেন।...

বিশ্ব পুনরায় একসূত্রে গ্রথিত হচ্ছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১. গ্রহ পর্যবেক্ষণে মানুষ

সারা গ্রহের ওপরে মানুষ ঘুরে বেড়িয়েছে। সাতহাজার মাইলের ছোট একটি অভিযান এখন তার কাছে খুব একটা কিছু নয়। সে গিয়েছে পামিরে, বিশ্বের ছাদে। সেখানে এতই ঠান্ডা যে "আগুন পর্যন্ত অন্যান্য জায়গায় যেমন উজ্জ্বলভাবে জ্বলে তেমনভাবে জ্বলে না, আগুনের রঙ অন্যান্য জায়গায় যেমন তা থেকে ভিন্ন"। মধ্য-এশিয়ার স্তেপ-ভূমি সে পার হয়েছে। সেখানে এমনই বাতাস যে ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারের পিছনদিকে সরিয়ে নিয়ে যায়, এমনই ধুলোর ঘূর্ণি যে কোনো কিছুই দেখা যায় না।

গোবি মরুভূমির মধ্যে দিয়ে সে গিয়েছে। সেটি "এত বড়ো যে পুরো একটি বছর লাগে সেটি পার হতে। সেখানে আছে পর্বত আর বালি আর উপত্যকা, কোথাও কোনোরকম খাদ্য নেই। জলের কাছে যেতে হলে দিনের পর দিন ও রাতের পর রাত চলতে হয়। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, সে-জল এতই তেতো যে সেখানে কোনো পশু বা পাখি থাকে না। কেননা সেখানে তারা না পায় জল, না খাদ্য।" কোনো পশু বা পাখি এই মরুভূমি পার হতে পারেনি, কিন্তু মানুষ পেরেছে। মানুষ তার নিজের এই গ্রহের ওপরে ঘুরে বেড়িয়েছে, এখানে আসা দর্শকদের মতো। আর যা-কিছু আশ্চর্য জিনিস দেখেছে তাতেই অবাক হয়েছে।

মানুষ দেখেছে কয়লা, এক "কালো পাথর", যা কাঠের মতো জ্বলে। দেখেছে স্থলে গন্ডার, সমুদ্রে তিমি, সুমাত্রায় গ্রীষ্মমন্ডলীয় অরণ্য আর মাদাগাস্কারে বিশাল এক লুপ্ত পাখির হাড়। সেই পাখির মাপ এক ডানার ডগা থেকে অপর ডানার ডগা পর্যন্ত ষোল হাত। অবাক হয়ে সে দেখেছে চীনের সুবর্ণমণ্ডিত প্রাসাদ ও ভারতের বিশাল বিশাল দেবমূর্তি।

দেশে ফিরে এসে সবাইকে পৃথিবীর এই সমস্ত আশ্চর্য জিনিসের বিষয়ে বলেছে। কিন্তু লোকে তার কথা বিশ্বাস করেনি, যেমন একসময়ে বিশ্বাস করেনি ফিনিসীয় ও গ্রীক নাবিকদের কথা।

তেরো শতকের শেষদিকে মার্কো পোলো নামে একজন ভিনিসীয় বণিক পৃথিবীকে প্রায় পুরো একটি চক্কর দিয়ে ঘুরে এল। স্থলভাগের ওপর দিয়ে সে চীনা উপকূলের সমুদ্র পর্যন্ত, সেখান থেকে জাহাজে চেপে ভারতবর্ষ ঘুরে ফিরে এসেছিল। দেশে ফিরে আসার পরে সে একটি বই লিখেছিল. বইতে ছিল যা-কিছু আশ্চর্য জিনিস সে দেখেছে তারই সত্য বিবরণ। কিন্তু লোকে বলেছিল সে মিথ্যাবাদী। যখন সে মৃত্যুশয্যায় তখন একজন পুরোহিত মিনতি করে তাকে বলেছিল, "অন্তত মরবার আগে অনুতাপ প্রকাশ করে যাও। তোমার বইয়ে যে-সব মিথ্যা কথা লিখেছ সেগুলো অস্বীকার করো।" কিন্তু সেই বৃদ্ধ জবাব দিয়েছিল, "আমি যা জানি তার অর্ধেকও বলিনি।"

কয়েক দশক পরে ফ্লোরেন্স-এর একটি ব্যাঙ্কের এজেন্ট একটি নির্দেশিকা সংকলন করেছিল। তাতে ছিল মার্কো পোলো যে-সব স্থান দর্শন করে এসেছে তার পথ-নির্দেশ।

মাত্র অল্প কিছুকাল আগে ইওরোপের প্রথম মানুষ এইসব স্থানে পদার্পণ করেছিল। বণিকদের ভ্রাম্যমাণ দলগুলি ইতিমধ্যেই সফর করছিল আস্ত্রাখান ও উরগেঞ্জ-এর মধ্যে দিয়ে বহু যাতায়াতে পরিচিত পথ ধরে—লেক ইসিক্-কুল পেরিয়ে, আরো দূরে গোবি মরুভূমির প্রান্ত বরাবর।

২. তিন সাগর পেরিয়ে একটি পথ

মস্কো থেকে ভল্‌গা বরাবর আরো একটি পথ গিয়েছিল পূবের দিকে—ভল্‌গা থেকে কাস্‌পিয়ান সাগর পর্যন্ত, কাস্‌পিয়ান থেকে ডারবেণ্ট ও বাকুর মধ্যে দিয়ে পারস্য থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত।

ৎভের-এর বণিক আফানাসি নিকিতিন এই দীর্ঘ পথ ধরে ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন। দুটি জাহাজ বোঝাই করে ফার নিয়েছিলেন পারস্যে বিক্রি করার জন্যে। সেই জাহাজ ছিল অনেকটা পালতোলা ছোট নৌকার মতো—এমনি জাহাজে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়াটা খুবই সাহসের ব্যাপার। প্রত্যেকটি জাহাজে ছিল একটি করে মাস্তুল, তার সঙ্গে ক্যানভাসের পাল, ষোলটি দাঁড়, ঢাকার বদলে হাল ঘোরানোর হাতল, এবং চওড়া পাটাতনের নিচে মাল রাখার গুদাম।

নিজ্‌নি-নভগোরোদ-এ এসে নিকিতন একজন পথের সংগী পেয়ে গেলেন। তিনি শেমাখার রাষ্ট্রদূত—মস্কো থেকে স্বদেশে ফিরছিলেন। সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন শেমাখার খানের কাছে মস্কোর প্রিন্সের একটি জীবন্ত উপহার—নব্বইটি বৃহদাকার বাজপাখি।

ভল্‌গানদীর মুখের কাছে তাতাররা তাদের আক্রমণ করল এবং নিকিতিনের জাহাজে যা-কিছু ছিল সবই লুটপাট করে নিয়ে গেল। জাহাজের সমস্ত মাল খোয়া গেল। রাশিয়ায় ফিরিয়ে নেবার মতো কিছুই থাকল না। অতএব তিনি রাষ্ট্রদূতের জাহাজে ডারবেণ্টের দিকে এগিয়ে চললেন, সেখান থেকে স্থলপথে যাত্রা করলেন পারস্য ও ভারতের দিকে।

তখন তিনি আর পশুলোম নিয়ে ব্যবসা করছিলেন না, করছিলেন ঘোড়া নিয়ে। তিনি শুনেছিলেন ভারতে ঘোড়ার দাম খুব চড়া। তাই নিজের শেষ অর্থ দিয়ে ঘোড়া কিনেছিলেন। কিন্তু এখানেও দুর্ভাগ্য তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে ছিল। আশা করেছিলেন ভারতে তিনি এমন কিছু কিনতে পারবেন যা দেশে ফিরে গিয়ে বিক্রি করা যাবে। কিন্তু উপযুক্ত কোনো কিছুই দেখতে পেলেন না। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে নিকিতিন ভৎসনা করতে লাগলেন, "ওই বাসুরমান কুত্তাগুলো (তাতার কর-আদায়কারীরা) আমাকে বলেছিল দেশে ফিরে গিয়ে বিক্রি করতে পারব এমন সব জিনিসও আমি পেয়ে যাব—ডাহা মিথ্যে বলেছিল। গোলমরিচ ও রঙের দাম সস্তা, তবে ওগুলো নিয়ে শুল্কের হাত থেকে পার পাওয়া যাবে না।...সমুদ্রপথে যারা যায় তারা কর দেয় না। কিন্তু সমুদ্রপথ জল-দস্যুতে ভরে আছে, এই জলদস্যুরা লুটপাট করে ও জাহাজ ধ্বংস করে দেয়।..."

নিকিতিন এক নগর থেকে অন্য নগরে যেতে থাকলেন, কিন্তু ভাগ্য তাঁর প্রতি প্রসন্ন হলো না। বিদেশ তাঁর ভালো লাগত না। বিদেশের সবকিছুই দেশ থেকে কত আলাদা। মানুষগুলোর চেহারা কেমন অদ্ভুত আর তারা সবাই প্রায় উলঙ্গ হয়ে হাঁটাচলা করে।

খাদ্য খারাপ। ছুরি-চামচ কেমনভাবে ব্যবহার করতে হয় তারা জানে না। পানাহার তারা করে একসঙ্গে নয়, প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে। ভারতে থাকাটা শীতকালের বাষ্প-স্নানের মতো—উষ্ণ ও শ্বাসরোধকারী।

চারটি বছর কেটে গেল, কিন্তু নিকিতিন তখনো ভারতে। অবশেষে অসহ্য মনে হওয়াতে তিনি স্বদেশের উদ্দেশে রওনা হলেন।

কী দীর্ঘ পথ—শেষ নেই যেন। হাজার হাজার মাইল ধরে সেই পথ গিয়েছে ভারত থেকে ত্রেবিজোন্দ-এ, ত্রেবিজোন্দ থেকে কৃষ্ণসাগর বরাবর জেনোয়ার একটি গড়ে, সেখান থেকে ৎভের-এ। কিন্তু স্বদেশের নগরে—যেখানে রয়েছে পরিত্রাতা যীশুর সোনালী ছাদওলা গির্জা—পৌঁছবার আগেই মৃত্যু তাকে গ্রাস করল। স্মোলেন্স্ক-এ পৌঁছবার আগে পথেই তিনি মারা গেলেন। মৃত্যুশয্যায় নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন যে তাঁর পুরো জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেল। সম্পদের সন্ধানে তিনটি সাগর পার হয়েছেন, কিন্তু দেশে ফিরে আসছেন শূন্য হাতে।

কিন্তু সত্যিই কি ব্যর্থ হয়েছিল?

সত্যি কথা, স্বদেশে বিক্রি করার জন্যে তিনি না এনেছেন সোনা, না বিদেশী সামগ্রী। মালপত্র যা তাঁর সঙ্গে ছিল তা অতি হাল্কা। সম্ভবত কাঁধের ঝোলাতেই তাঁর সমস্ত মালপত্র ধরে যেত। তবুও বলতে হয়, এই মালপত্র ছিল সম্পদে ভরা, যা সোনার চেয়েও দামী।

নিকিতিনের মৃত্যুর পরে এই সম্পদ—তাঁর ডায়েরি—পাওয়া গেল, এবং সেটি নিয়ে যাওয়া হল মস্কোয় প্রিন্সের কাছে।

সোনা যদি হতো তাহলে তা ছড়িয়ে পড়ত হাত থেকে হাতে, সিন্দুক থেকে সিন্দুকে। কিন্তু নিকিতিনের এই সম্পদ ছিল এমন এক মুদ্রা যা বিনিময় করা যায় না। যার হাতেই এই সম্পদ পড়ুক, এ থেকে জানতে পারবে আশ্চর্য এক কাহিনী। কেননা নিকিতিন এই ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন এমন সমস্ত বিষয় যা তাঁকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছে। বলেছেন বিদেশের পশু ও পাখি সম্পর্কে, প্রাসাদ ও মন্দির সম্পর্কে।

"সুলতানের প্রাসাদে তোরণ আছে সাতটি। প্রত্যেক তোরণে প্রহরীর সংখ্যা একশো।...প্রাসাদটি ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও মনোমুগ্ধকর, সবকিছু সোনায় খোদাই করা ও মোড়া। প্রত্যেক পাথরের ওপরে সোনার পাতের কারিকুরি।...মালমশলার ব্যাপারে সুলতানের কোনো কৃপণতা নেই, যেমন নেই পত্নীর ব্যাপারে। তাঁর আছে দশহাজার অশ্বারোহী সৈন্য, পঞ্চাশহাজার পদাতিক সৈন্য, সোনার হাওদা দেওয়া দু-শো হাতি। একশো ভেরীবাদক তাঁর আগে চলে, আর দু-শো নাচিয়ে ও সোনার লাগাম পরানো তিনশো ঘোড়া ও একশো বানর..."

কি নাচিয়ে, কি বানর, কি হাতি—নিকিতিন যা-কিছু দেখতেন তাতেই মুগ্ধ ও অবাক হতেন।

"বিশাল বিশাল তরবারি, যার প্রত্যেকটি ফলার ওজন দুই পুড (বাহাত্তর পাউণ্ড), তারা হাতির শুঁড় ও দাঁতের সঙ্গে লাগিয়ে রাখে। হাতির পিঠের ওপরে তারা এমন মঞ্চ বানায় যার ওপরে দু-শো যোদ্ধার স্থান হতে পারে—তাদের তার এবং সকল প্রকারের গোলা-উদ্‌গারী কামান সমেত।...

"বানররা বনে বাস করে। তাদের আছে নিজস্ব রাজা ও তার আছে নিজস্ব সৈন্যদল। যদি কেউ তাদের বিরক্ত করে তারা রাজার কাছে নালিশ জানায় আর রাজা তাদের রক্ষা

করার জন্যে সৈন্যদল পাঠায়। সৈন্যদল নগরে আসে, দরবার তছনছ করে দেয়, মানুষজন খুন করে। শোনা যায় ওদের অনেক সৈন্যদল আছে আর আছে নিজস্ব ভাষা।"

কিন্তু সবকিছুর ওপরে নিকিতিনকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছিল পবিত্র নগরে বুদ্ধের মহান মন্দির।

"বুদ্ধের মন্দিরটি বিশাল, ৎভের যতোটা তার প্রায় অর্ধেক। সমস্তটাই পাথরে তৈরি, তার ওপরে খোদাই করা রয়েছে বুদ্ধের সমস্ত কীর্তিকাহিনী।...যেমন, কেমন করে তিনি অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতেন, কেমন করে নানা বেশে উপস্থিত হতেন, কখনো-বা মানুষের আকারে, কখনো-বা হাতির নাক বিশিষ্ট স্বাভাবিক মানুষের আকারে, কখনো-বা বানরের মুখ নিয়ে, কখনো-বা পাথরে খোদাই করা হিংস্র বন্য জন্তুর মুখ নিয়ে ও সাতফুট লম্বা লেজ নিয়ে। সারা ভারতের মানুষ বুদ্ধের মন্দিরে যায় অলৌকিক কাণ্ড ঘটাবার জন্যে।...খোদ বুদ্ধকে পাথর থেকে খোদাই করা হয়েছে, যতোটা পারা যায় বৃহৎ আকারে, আর তার পুচ্ছ তাকে বেষ্টন করেছে, তার ডানহাতটি উঁচুতে তোলা।...আর তার মুখ বানরের মতো।...আর বুদ্ধের সামনে রয়েছে কালো পাথর থেকে খোদাই করা বিশাল এক বলীবর্দ, সোনায় মোড়া, আর মানুষরা আসে ও তার খুর চুম্বন করে আর তাকে ও বুদ্ধকে ফুলে ঢেকে দেয়।"

ভারত সম্পর্কে এই ছিল নিকিতিনের বক্তব্য। সারা ইওরোপে কেউ কখনো এমন বিস্ময়ের কথা আগে শোনেনি। তখনো পর্যন্ত এমনকি সেই জাহাজও তৈরি হয়নি যাতে করে ভাস্কো দা গামা সারাটা পথ সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে ভারতে পৌঁছেছিল।

৩. সম্পদ কি-ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল

জগতের প্রসার হয়ে চলল।

রিগার বন্দর-নগরে ছেলেমেয়েদের দল রোজই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত একটি বণিক কোম্পানির ভবনের ছাদে বসানো বায়ুপ্রবাহের দিক্-নির্ণয়কটি। সমুদ্র থেকে নগরের দিকে বায়ু প্রবাহিত হলে বাঁ থেকে ডান দিকে ঘুরে যেত খাড়া ছাদের ওপরে বসানো জাহাজ ও মোরগ ও অশ্বারোহী যোদ্ধার মূর্তিগুলো। খেলনাগুলোকে এইভাবে নড়াচড়া করতে দেখে বাচ্চারা মুগ্ধ হতো।

একমাত্র সামনের দিক থেকে দেখলেই বণিক কোম্পানির ভবনটিকে প্রাসাদের মতো মনে হতো। পিছন থেকে দেখাত অনেকটা গুদামের মতো। খাড়া ছাদের নিচে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত শোনা যেত কপিকলের সাঁই-সাঁই আওয়াজ। পিপের পর পিপে উঠে যেত আকাশে, এদিক-ওদিক দুলত, তিনতলার খোলা প্রকাণ্ড জানলাটা দিয়ে ভিতরে ঢুকে যেত, সেখানে অনেকগুলো পাকা হাত সেটাকে ধরে নিত এবং অন্ধকার ভিতরের দিকে চালান করে দিত। সম্পদগুলো মজুদ করার এই ছিল জায়গা, উত্তরের দিকে যাবার পথে ভারতের আমদানি এখানে বিশ্রাম নিত, যেমন বিশ্রাম নেয় অতিথিরা সরাইখানায়। পাশেই পড়ে থাকত নভ্‌গোরদ থেকে আনা পশুলোমের স্তূপ—এগুলো রপ্তানি হবার কথা দক্ষিণের দিকে।

ভারত থেকে ইতালি, ইতালি থেকে হান্‌সিয়াটিক লীগের উত্তর জার্মান নগরগুলো, সেখান থেকে নভ্‌গোরদ—পথ অতি দীর্ঘ। বিভিন্ন নগরে ও বিভিন্ন দেশে তৈরি হওয়া সামগ্রীগুলো হাতে হাতে ঘুরত।

নভ্‌গোরদ বণিকদের পাথরের প্রকোষ্ঠগুলোতে পশুলোম ঝুলত শেকলে, কাপড়ের গাঁইট থাকত কুলুঙ্গির তাকে, গোলমরিচের পিপে থাকত ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

বাড়ি ছিল দুর্গের মতো। চারদিক ঘিরে ছিল গভীর পরিখা, তার ওপরে টানাপুল। দেয়াল সাতফুট পুরু। চোর ও দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে কিছু জিনিস ছিল। খিলানবিশিষ্ট পাতালঘরে ছিল গুদাম, দোতলায় দোকান, তার ওপরে সুসজ্জিত কামরায় সপরিবারে থাকত মালিক।

খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে খরিদ্দাররা দোকানে যেত। দোকানে ঢোকার সময়ে মাথা নিচু করত যাতে দরজার চৌকাঠে মাথা না ঠুকে যায়। ভিতরে ঢুকত একটা নিচু দরজার মধ্যে দিয়ে। এখানে মেঝেগুলোর তল ভিন্ন। কামরা থেকে কামরায় যেতে হলে সাবধানে যাওয়া দরকার, যাতে হোঁচট খেতে না হয়।

পুরু দেয়ালের মধ্যে অলিন্দ ও সিঁড়ি ছিল। খুদে খুদে জানলার মধ্যে দিয়ে এসে পড়ত সামান্য পরিমাণ কৃপণ আলো। দোকানের মধ্যে পাওয়া যেত চেলাকাঠ, পশুলোম, চামড়া, আমদানি করা মশলা ও লতাগুল্মের গন্ধ।

এমনিভাবে নগর থেকে নগরে, শকট থেকে গুদামে, গুদাম থেকে বণিকের থলেতে চলাচল করেছিল হাজার হাজার মানুষের হাতে তৈরি সেই সামগ্রীগুলো।

সামগ্রীর এই নদীর উৎস কী?

কারিগরের কারখানা ও চাষীর কুঁড়েঘর!

প্রতি বছর এই নদী হয়ে উঠেছিল আরো চওড়া ও আরো প্রবল। গ্রাম দিয়েছিল আরো বেশি বেশি গম, তিসি, পশম, চামড়া; আর নগরে উৎপন্ন হচ্ছিল আরো বেশি বেশি কাপড়, জুতো, ছুরি, কুড়ুল!

একবছরে মানুষের জীবনে সামান্যই পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু আমরা যদি একবছর না ধরে একশো-বছর বা একহাজার-বছর ধরি, আমরা যদি তুলনা করি মধ্যযুগীয় একটি নগরের সঙ্গে এথেন্সের বা রোমের, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাব মানুষের দক্ষতা কতদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছে।

প্রাচীন কালের কারিগররা গর্ববোধ করত তাদের হস্তচালিত কুঁদযন্ত্র নিয়ে, তাদের ধাতু-বিগলনের চুল্লি নিয়ে, তাদের জল-চালিত কল নিয়ে। কিন্তু ষোড়শ শতকের কারিগরকে যদি নিজের কথা বলতে হয় তাহলে সে দেখাতে পারে নিমজ্জিত চাকা, সুতাকাটা যন্ত্র ও ব্লাস্ট ফারনেস।

প্রাচীন কালের কারিগররা জলকে দিয়ে নিজেদের কাজ করিয়ে নিত। নদীর মধ্যে তারা চাকা বসিয়ে দিত যাতে স্রোতে সেই চাকা ঘুরতে থাকে। নতুন কারিগররা নদীকেই চালনা করেছিল কারখানার মধ্যে। এজন্য তারা একটি কাঠের রাস্তা বানিয়েছিল— রেকাব ও বারকোষ দিয়ে তৈরি একটা রাস্তা। নদীকে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল বাঁধ তুলে। এমনিভাবে উঁচুতে ওঠানো জল নিচে নেমে এসেছিল রেকাবের ওপরে এবং ওপর থেকে চাকার ওপরে গড়িয়ে পড়েছিল। চাকার মাধ্যমে ঢেউয়ের শক্তিকে নিয়ে আসা হয়েছিল কাজের ঘরে। তখন তাকে দিয়ে যেমনটি চাওয়া হতো তাই করানো যেত। তার সাহায্যে নাড়ানো হতো ছেঁড়া ন্যাকড়ার কাঠামো যা থেকে কাগজ তৈরি হতো, বাতাস দিয়ে উস্‌কে তোলা হতো পেটাইঘরের আগুন, তুলে ধরা হতো কামারঘরের বিশাল হাতুড়ি।

এমনিভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছিল কাগজ-কল ও সুতি-কল। নামেও যদিও কল কিন্তু এখানে কোনো কিছু পেষাই হতো না। লোকে পুরনো নামে নতুন জিনিসকে

ডাকতে শুরু করেছিল, যা প্রায়ই হয়ে থাকে। এখনো পর্যন্ত যে-কোনো ধরনের কারখানাকে বলা হয় কল।

ওপরে বসানো চাকা জলের তোড়ে ঘুরে চলত আর তারই সাহায্যে লোকে আকরিক থেকে লোহা গলানোর পুরনো সমস্যার নতুনভাবে সমাধান করেছিল।

আগেকার কালে লোকে আকরিক থেকে লোহা নিষ্কাশন করত নিচু চুল্লিতে ও উনুনে। উনুনে বোঝাই করা হতো আকরিক ও কয়লা তারপরে হস্তচালিত হাপর দিয়ে বাতাসের ঝাপ্‌টা দেওয়া হতো। এ-ধরনের উনুনে খুব বেশি আঁচ ওঠানো যেত না। লোহা গলত না, কেবল বারে বারে ঝলসে যেত। ফলে পাওয়া যেত ধাতুমল মিশ্রিত তুলতুলে লোহা। উনুনে যে-কাজ করা যায়নি সেটি করত কামার তার হাতুড়ি দিয়ে। লোহা থেকে ধাতুমলকে পৃথক করত। তাছাড়া, এই পদ্ধতিতে লোহা পাওয়া যেত সামান্য মাত্র।

তারা চেষ্টা করেছিল উনুনকে আরো উঁচুতে তুলতে। তখন দেখা গেল, উনুনে যথেষ্ট হাওয়া ঢুকছে না। হস্তচালিত হাপর দিয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বাতাসের ঝাপ্‌টা দেওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

তারপরে চালু হলো এই ওপরে বসানো চাকা। এই চাকার সাহায্যে সম্পন্ন হলো কামারের জোরালো হাপর চালাবার কাজ। উনুনে যথেষ্ট বাতাস পাওয়া গেল। উনুন হয়ে উঠল অধিক থেকে অধিকতর উত্তপ্ত। লোহা গেল গলে, কয়লা তার মধ্যে দ্রবীভূত হলো, ফলে পাওয়া গেল পিণ্ড-লোহা।

আগুন আর জল সবসময়েই ছিল শত্রু। কিন্তু এখানে তারা একসঙ্গে কাজ করতে শুরু করল। বাতাসের ঝাপ্‌টা দিয়ে আগুন উস্‌কে তুলতে লাগল জল।

কারিগররা প্রথম প্রথম দেখতে পেল, স্বাভাবিক চটচটে লোহার বদলে পাওয়া যাচ্ছে পিণ্ডগুলোর গনগনে তরল প্রবাহ, তখন তারা সিদ্ধান্ত করল যে আকরিককে তারা পণ্ড করেছে, এ দিয়ে আর কোনো কাজ হবে না।

তরল লোহা! তাদের কাছে সৃষ্টিছাড়া মনে হলো।

তারা হাতে পেয়েছিল একটি সম্পদ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেটা বুঝতে পারেনি। পিণ্ডলোহা বাস্তবিকই সম্পদ। পিণ্ডলোহাকে ঢালাই করা যায়। পিণ্ডলোহা দিয়ে সবরকমের জিনিসপত্র ঢালাই করা যেতে পারে। হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে এইসব জিনিসপত্র তৈরি করা কোনো কামারের সাধ্য নয়।

এমনিভাবে জলচালিত চাকার সাহায্যে ধাতু গলাবার চুল্লি হয়ে উঠেছিল ব্লাস্ট ফারনেস। আর এখান থেকেই সরাসরি পথ চলে গিয়েছিল ষোল ও সতেরো শতকের লোহা-কারখানাগুলোর দিকে।

কৃত্রিম একটি নদী প্রবাহিত হতো লোহা-কারখানার মাঝখানে কাঠের তৈরি নালার মধ্যে দিয়ে। নালা থেকে শাখা ছড়িয়ে পড়ত জল-চাকার দিকে, কামারের বিশাল হাপর ও হাতুড়ির দিকে। গোড়ার দিককার ওইসব কারখানায় কী প্রচণ্ড আওয়াজ আর শব্দই না হতো! কারিগরের ছোট্ট কর্মশালার মতো আদৌ নয়!

ব্লাস্ট-ফারনেস আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যেতে লাগল আরো বেশি লোহা। আর লোহার প্রয়োজন ছিল লাঙলের জন্য, কামানের জন্য, নোঙরের জন্য, চাকার স্পোকের জন্য ও রিমের জন্য।

একটি সূত্রের টানে আরো একটি এসে গেল। ওপরে ওঠানো চাকা যেই-না দেখা দিল অমনি দেখা দিল ব্লাস্ট-ফারনেস। ব্লাস্ট-ফারনেস দেখা দিতেই পাওয়া যেতে লাগল আরো

বেশি লোহা। আরো বেশি লোহা হাতে আসতেই লোকে চাকা বানাতে লাগল লোহার রিম ও স্পোক দিয়ে। আর এই সমস্ত চাকার জন্য প্রয়োজন ছিল বাঁধানো রাস্তার। তখন তারা রাস্তা বানাতে শুরু করে দিল।

পুরনো কাঠের লাঙলের তুলনায় লোহার লাঙল দিয়ে কর্ষণ হতে লাগল আরো তাড়াতাড়ি ও আরো গভীর।

লোহার কারখানায় এমন প্রকাণ্ড একটা হাতুড়ি ওঠানো-নামানো হতে লাগল যা তোলার ক্ষমতা এমনকি দশজন সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষেরও হতো না। কারিগরকে শক্তি জুগিয়েছিল হাতের শক্তি নয়, মনের শক্তি।

সবকিছু দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল আমাদের আধুনিক যন্ত্রপাতির দিকে, ভবিষ্যতের কলকারখানার দিকে। সেই যে জল-বল, তাকে যদি যন্ত্র বলতে হয় তাহলে তার যা যা থাকা দরকার—মোটর, গীয়ার, চালনাকারী কলকব্জা—সবই কি তার ছিল না?

হাজার বছর ধরে জল-চাকা সব সময়েই যুক্ত ছিল পেষাই করার যাতার সঙ্গে। তারপরে জল-চাকাকে নতুন কাজে লাগানো হলো। তাকে দিয়ে শুধু যে গম পেষাই করা হতো তাই নয়, পেষাই কল থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো ঢালাই ঘরে, কাপড়ের কারখানায়, কাগজ তৈরির কর্মশালায়, আর খনিতে—যেখানে আকরিককে চূর্ণ করতে হয়, জল পাম্প করে বার করতে হয়।

পেষাই করার যাতা এখন আর চাকা থেকে ঝুলছিল না, মানুষের গলা থেকে পাথর ঝুলে থাকার মতো। চাকা এখন মুক্ত। চাকা এখন কাজ করছিল যেখানে কাজ করা প্রয়োজন।

কয়েক-শো বছর পরে, আঠারো শতকে, রুশী বাঁধ-নির্মাণকারী কুজ্‌মা ফ্রলোভ একটি কারখানা তৈরি করবেন যেখানে জল-চাকা দিয়ে চালানো হবে শুধু পাম্প ও আকরিক তোলার যন্ত্র নয়, আকরিক বয়ে নিয়ে যাবার গাড়িও। আর রুশী কারিগর পোলজুনভ আবিষ্কার করবেন এমন এমন একটি ইঞ্জিন যেটি চালিত হবে জল দিয়ে নয়, বাষ্প দিয়ে। সময় আসবে যখন ইঞ্জিনের সঙ্গে জোড়া হবে চাকা আর সেটি হয়ে উঠবে রেল-ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিন নিয়ে যাওয়া হবে জাহাজের ভেতরে। নিয়ে যাওয়া হবে খেতে জমি চাষ করবার জন্যে। পৃথিবীর ওপরে আকাশ দিয়ে মানুষ বয়ে নিয়ে যাবে।

মানুষের শ্রম বিজ্ঞানকে অগ্রসর করবে এবং বিজ্ঞান সাহায্য করবে শ্রমকে। গণিত-বিদ ও পদার্থবিদরা হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবেন কারিগরদের সঙ্গে, যাতে নতুন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তৈরি করা যায়—যে ধরনের যন্ত্র সম্পর্কে একসময়ে আরিস্ততল স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর পুরনো কথাগুলো ইঞ্জিনিয়ারদের স্মরণ করিয়ে দেবে সেই সময়ের কথা যখন জীবন্ত ইঞ্জিন ছাড়া কোনো ইঞ্জিন ছিল না, যখন প্রত্যেকটি ইঞ্জিন চালু করতে হতো মানুষের হাতের জোরে কিংবা ঘোড়ার পায়ের জোরে।

ইঞ্জিনিয়ার ও পদার্থবিদরা মুখে বলবেন 'মনুষ্যশক্তি', 'অশ্বশক্তি', কিন্তু তাঁরা ভাববেন ঘোড়ার কথা নয়, রেল-ইঞ্জিনের কথা; মানুষের শক্তির কথা নয়, জলস্রোতের শক্তির কথা—যে শক্তিতে টারবাইন চালু হয়।

আমরা কিন্তু বহুদূর এগিয়ে চলে এসেছি।

পনেরো শতকে ফিরে যাওয়া যাক। ফিরে যাওয়া যাক সেই ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে যাঁরা কোনো কারিগরী ইস্কুলে পাঠ নেননি, যাঁরা তাঁদের বিদ্যা শিখেছিলেন বাপ-পিতামহের কর্মশালায় দাঁড়িয়ে।

হাজার বছর ধরে ছিল শুধু একধরনের কুঁদযন্ত্র বা লেদ্। বাপ ছেলেকে শিখিয়ে

যেত কি ভাবে এই যন্ত্রে কাজ করতে হয়। দেখিয়ে দিত কি ভাবে একহাতে ধরতে হয় কাটারি আর অন্য হাতে সামনে-পেছনে ঠেলাঠেলি করতে হয় করাতের ফ্রেম। আর ছেলে অবাক হয়ে দেখত করাতের সঙ্গে লাগানো ধনুকের ছিলার মতো সুতোটি একটা ফাঁসের মধ্যে টেকোকে জড়িয়ে ধরে আর প্রত্যেক টানের সঙ্গে সঙ্গে একটি বস্তুকে ঘোরাতে থাকে।

ছেলে তার বাপের হাতের প্রত্যেকটি সঞ্চালন সযত্নে অনুকরণ করত। তারপরে নিজেও যখন কারিগর হয়ে উঠত তখন নিজের ছেলেদের সেই বিদ্যা শিখিয়ে যেত।

তারপরে একটা সময় এল যখন এই ছেলেদের কাজের ধরন হয়ে গেল তাদের বাপ-পিতামহদের থেকে আলাদা। নতুন নতুন সমস্যা সমাধান করার জন্যে তাদের কাজ শিখতে হতো।

পুরনো দিনের কুঁদযন্ত্রে ইস্‌ক্রুপ বা হাব্‌ বা যন্ত্রের পাম্পের অংশ তৈরি করা শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু এসবের প্রয়োজন বাড়ছিল। এজন্যে প্রয়োজন হতো বৃহৎ আকারের একটি লেদ্‌ ও ভারী একটি কাটার। কিন্তু এমনি একটি কাটার শুধু ডান-হাতে খুব বেশিক্ষণ ধরে থাকা যেত না। তখন লোককে ভাবতে হলো কি করে কারিগরের বাঁ-হাতটিও মুক্ত করা যায়, যাতে সে কাটারটি দু-হাতে ধরতে পারে। তখন আরো একবার হাতকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল মাথা।

বাপ যেভাবে কাজ করছিল তা থেকে ভিন্নভাবে কাজ করতে শুরু করে কারিগরের ছেলে। একটা পাটাতনের ওপরে সে উঠে দাঁড়ায়, ফলে সেই পাটাতন একটা দড়িতে টান মারে। দড়িটা একটা ফাঁসের মধ্যে টেকোকে ধরে নিয়ে সেটাকে ঘুরিয়ে দেয়। দড়ির অন্য প্রান্ত বাঁধা থাকে সিলিং-এর একটা আলগা বাঁশের সঙ্গে। পা দিয়ে পাটাতনটা মেঝের দিকে চেপে ধরলেই বাঁশটা একটা স্প্রিং-এর মতো দড়ি টেনে ধরে। এইভাবে খানিকটা কাজ পা দিয়েই সারা হয়ে যায়। ফলে দুটি হাতই মুক্ত। তখন সে দু-হাত দিয়ে কাটার ধরতে পারে।

পা-চালিত লেদ্‌এর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল পা-চালিত তাঁত। টেকোর বদলে দেখা দিল বুনন-চাকা।

আর এইসব নতুন যন্ত্র মানুষকে বাধ্য করল নতুনভাবে কাজ করতে। এখন আর সুতো-কাটা, কাপড়-বোনা ও রঙ-করার কাজ একই লোক একসঙ্গে করে চলবে তার উপায় থাকল না। আলাদা আলাদা মানুষ আলাদা আলাদা করলেই কাজ অনেক তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হতে লাগল। একজন যদি পশম ধোলাই করে, আরেকজন যদি বাছাই করে, তৃতীয় আরেকজন যদি কাটে, চতুর্থ আরেকজন যদি বোনে, তাহলে কাজ অনেক তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়।

কাজ হয়ে চলল তাড়াতাড়ি, আরো তাড়াতাড়ি। গুদামে জড়ো হতে লাগল আরো বেশি বেশি মাল, রাস্তা জুড়ে চলতে লাগল আরো বেশি বেশি মালবোঝাই গাড়ি, সমুদ্রে ভেসে চলল আরো বেশি বেশি পণ্যাবাহী জাহাজ।

বণিকরা ও গিল্‌ড কারিগররা আরো ধনী হয়ে উঠল।

ফ্লোরেন্সের ধনী কারিগরের তখন আর নিজের হাতে কাজ করার কোনো প্রয়োজন থাকল না। গণ্ডায় গণ্ডায় ভাড়া-করা লোক তার কর্মশালায় কাজ করতে লাগল। ফ্লোরেন্সে এই শ্রমিকদের বলা হতো 'চিওম্পি'। কথাটার মানে, ভিখিরি, ভবঘুরে। কারিগর পেত মুনাফা। তার কর্মশালায় যে-সব দামী নতুন লেদ্‌ রয়েছে তার মালিক সে ছাড়া আর কে?

চিওম্পি ভুখা হয়ে থাকত। তারা বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বিদ্রোহ সফল হয়নি। শহরের ক্ষমতা শক্তভাবে ধরা ছিল ধনী বণিক ও কারিগরদের হাতে।

ফ্লোরেন্সে সামন্ত প্রভুরা বহু আগেই ক্ষমতা থেকে উৎখাত হয়েছিল। এখন প্রিন্সের মতো বাস করে প্রিন্সরা নয়, বণিকরা ও ব্যাঙ্ক-মালিকরা। ধনী বণিকের গৃহ হতো প্রাসাদের মতো। গৃহে আসবাব বিশেষ কিছু থাকত না—দেয়ালে ঠেকানো গোটাকতক আর্ম চেয়ার, অসাধারণ কারুকার্য করা একটি টেবিল, সুগন্ধী কাঠের একটি সিন্দুক। কিন্তু দেয়ালে ও সিলিং-এ আঁকা থাকত অজস্র জীবের ছবি—একদল মানুষ যাদের মুখ মানুষের মতো, শরীর পাখির মতো, লেজ মাছের মতো; মদন ও দিব্যাঙ্গনারা, নৃত্যরতা কুমারীরা, বংশীবাদনরত বনদেবতারা। অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত এই দেয়ালের পটভূমিকায় স্থাপিত থাকত রোমান দেবদেবীদের ঝকঝকে সাদা মূর্তি। দেখে মনে হবে এই দেবদেবীরা অবশেষে তাদের গৃহে পৌঁছেছেন।

৪. প্রাচীন এক রোমান তাঁর এক বংশধরের অতিথি

এই মূর্তিগুলো বর্বরদের হস্তক্ষেপে তাদের বেদী থেকে চ্যুত হয়েছিল। তারপরে হাজার হাজার বছর ধরে মাটির নিচে সমাধিস্থ ছিল। একদিন কি হয়, চাষীর লাঙলের ফলায় এক চাঙড়া মাটি উল্টে যেতেই দিনের আলোয় বেরিয়ে পড়ে সুন্দর একখানি হাত। ভোরের আলোয় হাতখানিকে মনে হয় উষ্ণ। কিংবা হয় কি, কেউ একজন কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছিল, হঠাৎ দেখতে পায় একটি স্তম্ভের চূড়ায় ফুটিয়ে তোলা বাসক পাতা। পাতাল থেকে উঠে আসা প্যাগান মূর্তিটি দেখে চাষী আঁতকে ওঠে। খনক সেই পাথরকে অভিসম্পাত দেয়, কেননা তার কোদালের নতুন-ধার-দেওয়া ফলাটি এই পাথরে ঘা খেয়ে ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। অতীত ছিল মাটির গভীরে দীর্ঘকাল সমাধিস্থ হয়ে, সেখান থেকে উঠে এসেছে মানুষের কাছে—কিন্তু মানুষ তাকে চিনতে পারেনি।

প্রাচীন সৌন্দর্য উঠে আসে তার সমাধি থেকে। লোকে যত্নের সঙ্গে মার্বেল পাথরের প্রত্যেকটি টুকরো পরিষ্কার করে। একজন ইতালীয় ব্যাঙ্ক-মালিক তাঁর প্রাসাদে অতিথিদের আমন্ত্রণ জানায় এবং তাদের আপ্যায়ন করে শুধু পুরনো সুরা দিয়ে নয়, পুরনো সৌন্দর্য ও পুরনো জ্ঞান দিয়ে-ও। ভোজসভায় পাঠ করা হয় প্লেটোর 'সিম্‌পোজিয়াম'। চিকন সোনালী পানপাত্রের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে মার্বেল পাথরে তৈরি রোমান বাগ্মীর মস্তক। এটি তুস্‌কানির এক আঙুরক্ষেতে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। পাথরের ঠোঁটে অস্ফুট হাসি নিয়ে রোমান বাগ্মী তাকিয়ে থাকে তার বংশধরদের দিকে, যারা সম্প্রতি বুঝতে শিখেছে এই সমস্ত উৎকৃষ্ট জিনিসের মূল্য।

যদি সে দেখতে ও শুনতে পারত তাহলে কী দেখত ও শুনত সে? দেখতে পেত কুটিরের উন্মুক্ত খোলা জানলার বাইরে ফুল-ফোটা সাইপ্রেস ও ফলগাছ। শুনতে পেত তার দেশের ভাষা এবং কথাবার্তায় পুরনো পরিচিত সব নাম—হোরেস, ওভিদ, ভার্জিল। যখন শুনত যে এই লোকগুলো শপথ নিচ্ছে শুধু খৃস্টের নামে নয়, অলিম্পাসের প্রাচীন দেবতাদের নামেও, তখন ব্যাপারটা তার কাছে অদ্ভুত ঠেকত। যখন শুনত যে তারা প্লেটোর 'সিম্‌পোজিয়াম' পড়ছে তখন তাদের জ্ঞানের বহর দেখে হয়তো অবাক হতো।

এও কি সম্ভব যে অতীত ফিরে এসেছে? না, অতীত কখনো ফিরে আসতে পারে না।

এই কুটিরের সাজসজ্জা বড়ো বেশি চোখ ধাঁধানো ও অলংকার-বহুল। দেয়ালের প্রতি

ইঙ্গিতে, দরজার প্রত্যেকটি হাতলে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বড়ো বেশি লতাপাতা, ফলফুল ও মূর্তির অলংকরণ। গ্রীক ও লাতিন ভাষায় মার্জিত কথার সঙ্গে মেশানো থাকছে কর্কশ বর্বরোচিত ঠাট্টাতামাশা। অতিথিদের পরিবেশন করা হচ্ছে চিত্তহারী আহার্যের সঙ্গে অদ্ভুত রান্নার খাবার। আর এই খাবার নেবার জন্যে অতিথিদের বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করা হচ্ছে। অতিথিরা সেই খাবার খাচ্ছে, তারপরে যেমন প্রশংসা করছে রান্নার, তেমনি গৃহকর্তার চমৎকার রুচির।

শেষপর্যন্ত গৃহকর্তা নিজেকে আর সংযত রাখতে পারে না, হো-হো করে হেসে উঠে বলে, 'আপনারা খাচ্ছেন রান্না-করা কাকের ঝোল!'

কথাটা শুনে অতিথিরা অসুস্থ বোধ করতে থাকে। তারা নিজেরাই বুঝে উঠতে পারে না ব্যাপারটা কি-ভাবে নেবে—গৃহকর্তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসবে, না, অপমানিত বোধ করবে? বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করে কেউ কেউ বলে ওঠে, 'কী বিশ্রী ব্যাপার!' আর গৃহকর্তা ঠিক এটাই চাইছিল।

প্রাচীন রোমান সেনেটর ও প্রোকন্সালদের ভোজের আসরে এ-ধরনের জংলী তামাশা করার কোনো রেওয়াজ ছিল না। তাদের কোনো ভোজের আসরে কেউ কখনো একবারের খাওয়ায় তিরিশটা মুরগি ও চল্লিশটা ডিম খায়নি।

প্রাচীন কোনো রোমান অন্য আরেকটি তামাশার রসিকতাকেও তারিফ করতে পারত না। অথচ ফ্লোরেন্সের লোকরা বেশ তারিফ করেই এই তামাশার উল্লেখ করে। দিন কয়েক আগে কুটিরের কর্তা তার একজন অতিথিকে এত মদ্যপান করিয়েছিলেন যে সেই অতিথি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তারপরে তাঁর হুকুমে সেই বেচারাকে কবরখানায় নিয়ে গিয়ে সেখানে ফেলে আসা হয়েছিল। তার আত্মীয়দের কাছে খবর পাঠানো হয়েছিল যে সে মরে গিয়েছে। জ্ঞান ফিরে আসার পরে লোকটি যখন দেখল সে কবরখানায় শুয়ে আছে তখন কী মজাই না হয়েছিল! আর তার আত্মীয়রা যখন দেখল মরা মানুষ আচমকা তার ঘরের দরজায় হাজির হয়ে টোকা দিচ্ছে তখন তারা কী ভয়ই না পেয়েছিল!

না, কোনো সন্দেহ নেই যে লোকগুলো তখনো ছিল বর্বর, যদিও তারা আরিস্টটল ও প্লেটো নিয়ে আলোচনা করত।

এই কুটিরের মালিক কে?

তিনি অভিজাত বা প্যাট্রিশ্যান নন। তিনি ছিলেন বণিক। বহু জায়গিরের মালিক তিনি ছিলেন না। তার বদলে তাঁর ছিল প্রচুর পরিমাণ সোনা। আর সেটাই তাঁকে ক্ষমতা দিয়েছিল। রাজারা নিজেদের গরজে তাঁর কাছে আসত আর যতোক্ষণ তিনি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন ততোক্ষণ মাথার টুপি খুলে তারা তাঁর সঙ্গে কথা বলত।

"মহামহিম" বলে তারা তাঁকে সম্বোধন করত না। তারা তাঁর জন্যে একটা নতুন নাম ঠিক করেছিল—"মহিমময়"। এই নামটির মহিমা বড়ো কম ছিল না।

"মহিমময়" এই মোদ্দা—তিনি ছিলেন অতি নম্র। সকালবেলা বাগানে কাজ করতেন এবং তাঁর মালির সঙ্গে খুব সহজভাবে কথা বলতেন। রাস্তায় কোনো কারখানার ফোরম্যানের সঙ্গে দেখা হলে অন্তরঙ্গভাবে তার পিঠ চাপড়ে দিতেন। লর্ড ও গভর্নমেণ্টের ব্যাপারে কখনো নাক গলাতেন না। তাঁর যা অর্থ ছিল তাই দিয়ে তিনি যা খুশি করতে পারতেন।

সিংহের মূর্তি আঁকা ঢাল সমেত কুলমর্যাদার কোনো প্রতীক, মস্তকে রাজোচিত মুকুট, লম্বা রিবনে প্রলম্বিত মর্যাদাসূচক কোনো চিহ্ন তিনি ধারণ করতেন না। তা

সত্ত্বেও লাভ করতেন রাজোচিত সম্মান। শত্রুদের গর্দান নিতেন না বা কারাগারে আটক করতেন না। তাদের শুধু পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেন, সেটা করতেন শিষ্টতার সংগেও কিছুমাত্র সাড়া না জাগিয়ে। তাদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতেন তাদের নেওয়া ঋণের ওপরে মোটা অংকের সুদ দাবি করে, কিংবা চরম প্রয়োজনের সময়ে তারা যখন তাঁর কাছে আসত তাদের ঋণ না দিয়ে। নগরে তিনি ছিলেন সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। সকলের টাকার থলি থাকত তাঁর হাতের মুঠোয়।

তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা যদি তাঁকে দিতে হয় তবে বলতেই হবে, ছবি বা মূর্তি বা বই কেনার ব্যাপার হলে তিনি দরাজ হাতে খরচ করতেন। সম্প্রতি আবিষ্কৃত প্রাচীন পাণ্ডুলিপি কপি করার জন্যে তাঁর গ্রন্থাগারে ছেচল্লিশজন লিপিকরকে তিনি সবসময়ে ব্যস্ত রাখতেন। তাঁর ছিল প্রাচীন মূর্তির সেরা সংগ্রহ। পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাঁর কাছে নানা অনুরোধ নিয়ে যেতেন এবং সসম্ভ্রমে ও সবিনয়ে চিঠি লিখতেন। শিল্পীরা তাঁর কাছে হাত পেতেছিল এবং বহুমূল্য অতি আসমানী রঙের জন্যে তাঁর কাছ থেকে পঞ্চাশহাজার ফ্লোরিন পেয়েছিল।

তিনি কাউকে ফিরিয়ে দিতেন না। যে অর্থ দিতেন তার শেষ ফ্লোরিন পর্যন্ত হিসেব রাখতেন। যোদ্ধাদের মধ্যে যে বেহিসেবী উদারতা দেখা যেত তা তাঁর বণিকী কানুনে আমল পেত না।

সোনালী বৃষ্টির মতো ফ্লোরিন ঝরে পড়ত, বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেতে হতো জলসেচন, তারপরে যে ফসল ফলত তাতে বোঝা যেত যে বিনিয়োগ সার্থক হয়েছিল।

কোনো রাজার প্রাসাদ প্রজাতন্ত্রের—ফ্লোরেন্স প্রজাতন্ত্র তো বটেই—এই নম্র নাগরিকের দরবারের চেয়ে বেশি ঐশ্বর্যমণ্ডিত ছিল না। দীর্ঘকাল ধরে তুস্কান দেশে কোনো দাস নেই। অভিজাতবর্গ ধীরে ধীরে তাদের মর্যাদা হারিয়েছিল। হাটবাজার ও দুর্গের মধ্যে লড়াইয়ে জয়লাভ করেছিল হাটবাজার—যেমন করেছিল প্রাচীন মাইলেটাসে ও এথেন্সে। আগেকার কালের বড়ো বড়ো নামের স্থান নিয়েছিল টাকার থলি।

জনগণ শাসন করত, কিন্তু সেটা শুধু নামেই। ধনী মহাজনরা ও বণিকরা নিজেদের আলাদা করে রেখেছিল। অভিজাতদের ওপরে আধিপত্য কায়েম করতে কারিগররা তাদের সাহায্য করেছিল ও নিজেরাই নগরের প্রভু হয়ে বসেছিল। বণিকরা তাদের বলত ভবঘুরে...

৫. একজন বিধর্মীর কাহিনী

ফ্লোরেন্সের মহাজন লোরেন্‌জো দ্য মেদিচির ভোজসভায় উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে এমন একজন ছিলেন যিনি সংগে সংগে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারতেন। তিনি তরুণ ও সুদর্শন। লরার উদ্দেশে পেত্রার্কের সনেটগুলি তাঁর মুখস্থ ছিল এবং নিজেও সনেট লিখতেন। ভোজসভা ও আনন্দ-মেলা ভালোবাসতেন। তিনি—গেয়োভানি পিকো দেলা মিরানদোলা—সবসময়ই থাকতেন মিছিলের পুরোভাগে—যখন রাত্রিবেলা বাঁশির সুরের তালে তালে আনন্দ-মেলা ফ্লোরেন্সের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরত আর মশালের আলো গিয়ে পড়ল রুপোর কিংখাবের পিরানের ওপরে, ভেলভেটের জালিকার ওপরে, ঘোড়ার খুরের সোনালী গিল্‌টির ওপরে।

কিন্তু তাই বলে তিনি অলস ও নিরেট ফুলবাবুটি ছিলেন না। আমোদআহ্লাদ ভালোবাসতেন বটে কিন্তু পিকো দেলা মিরানদোলা ছাত্র হিসেবেও একনিষ্ঠ ছিলেন।

তাঁর গ্রন্থাগারের তাকে সাজানো ছিল গ্রীক দার্শনিকদের ও ইহুদী গূঢ়-অর্থসন্ধানীদের রচনা। প্রতিটি বিতর্ক-সভায় তিনি বিজয়ী হতেন, যেমন বিজয়ী হতেন প্রতিটি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে তাঁর পূর্বপুরুষরা।

তাঁর শত্রুরা তাঁর সম্পর্কে বলত, "শয়তানের সঙ্গে আঁতাত থাকলে তবেই এত অল্প বয়সে এমন বিরাট ও গভীর জ্ঞানলাভ করা যায়।"

ঠিকুজি-বিচারকারীরা বলত, ১৪৬৩ সালে যখন মিরানদোলার জন্ম হয় তখন আচমকা সারা নগরের ওপরে উজ্জ্বল আলো ফুটে উঠেছিল। তার মানে, নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু এই আলো আচমকা নিভে গিয়েছিল। তার মানে, নবজাত শিশুর আয়ু স্বল্প।

অদ্ভুত মানুষ ছিলেন এই পিকো দেলা মিরানদোলা। কখনো কখনো সারারাত কাটিয়ে দিতেন ভোজসভায় কিংবা পেগ্যান দার্শনিকদের রচনা অধ্যয়নে। আবার কখনো কখনো সারারাত হাঁটু মুড়ে বসে থাকতেন ঈশ্বর-জননী মেরির বেদীর সামনে।

তাঁর মধ্যে সংঘাত চলছিল দুই প্রকৃতির—একটি প্রকৃতি মঠবাসী ঋষির, অপরটি প্রচলিত ধর্মে অবিশ্বাসী পন্ডিতের। একটি মানুষের মধ্যেই এই দুটি প্রকৃতি ঠাসাঠাসি হয়ে ছিল। একটি চাইত অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে, কোনো যুক্তিতর্ক না তুলে, শিশুর মতো। কিন্তু অপরটি সবসময়ে সন্দেহপ্রকাশ করত আর বলত, "মন যা চায় তাই বিশ্বাস করাটা তোমার সাজে না।"

নিজেকে তিনি বারবার প্রশ্ন করতেন, মানুষ তাহলে কী? ঈশ্বরের করুণায় অশ্রু ও বিষাদের যে উপত্যকা তার জন্য নির্দিষ্ট সেই উপত্যকায় একজন যাত্রী, না, নিজের ভাগ্য জয় করার ক্ষমতাসম্পন্ন প্রভু? সে কি এমনই এক দরিদ্র দাস যে ধূলি থেকে এসেছে ও ধূলিতেই মিলিয়ে যাবে, নাকি, নিজের সৃষ্টিকর্তা ও ভাস্কর?

মিরানদোলা আপ্লুত হতেন যখন তিনি দেখতেন পাথর রঙ আর কাপড় দিয়ে সৃষ্ট মহান সব শিল্পকর্ম, যা মানুষেরই হাতে তৈরি! ভাস্বর হতেন যুক্তির ক্ষমতায়, যা বিশ্বকে বদলে দিতে পারে।

কিন্তু এই সমস্ত সুখের মুহূর্ত বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। মানুষের কষ্ট যেন হাজার হাজার তিরস্কারভরা চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত। তিনি যে এতখানি গর্বিত ও এতখানি সুখী, তার জন্যে সেই চোখগুলো তাঁকে ভর্ৎসনা করত।

রাস্তায় বেরোলে লোকে তাঁর দিকে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে ধরত, ঘায়ে ভরা সেই সমস্ত হাত। বিনীতভাবে তারা অভিযোগ শোনাত ও মিনতি করত, তিনি শুনতেন। এমন জাঁকজমকের শহর ফ্লোরেন্স, সেখানে কতজন আছে এমনি সব ভিখারী ও ভুখা মানুষ!

নিজের টাকার থলি উজাড় করে তিনি তাদের হাতে ঢেলে দিতেন। কিন্তু চারদিকের অতল দুঃখদুর্দশার কতটুকু তিনি পূরণ করতে পারতেন নিজের সামান্য অর্থ দিয়ে? তিনি ঘুরে দাঁড়াতেন, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ি ফিরতেন, দরজা বন্ধ করে দিতেন, বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর যে দেখা করার কথা ছিল সে-কথা ভুলে যেতেন, প্রভুর মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে বসতেন।

কিন্তু যতোই প্রার্থনা করুন, বিশেষ ফল হতো না। জোরে জোরে প্রার্থনা-বাণী উচ্চারণ করতেন, কিন্তু তখনো তাঁর মনের চিন্তা সম্পূর্ণ অন্য পথে ধাবিত হতো। তারপরে প্রার্থনা শেষ না করেই উঠে দাঁড়াতেন, ছুটে যেতেন তাঁর প্রকৃত বন্ধুদের কাছে—প্রাচীন জগতের জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে। এই জ্ঞানী ব্যক্তিরা হলো তাঁর গ্রন্থাগার, তার জ্ঞানের অমূল্য সম্পদ থেকে তাঁকে ভাগ দেবার জন্যে সবসময়েই প্রস্তুত হয়ে থাকত।

গ্রন্থগুলির পৃষ্ঠা উলটিয়ে যেতেন, গ্রন্থগুলি পাঠ করতেন। তখন আবার ফিরে পেতেন যুক্তির শক্তিতে বিশ্বাস, মানবতায় ও তার ভবিষ্যতে আস্থা।

তিনি একটি পান্ডুলিপি মেলে ধরলেন। পান্ডুলিপিটির শিরোনাম: 'তাবৎ জ্ঞেয় বিষয় সম্পর্কে'।

"ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন সৃষ্টির শেষ দিনে—বিশ্বের নিয়ম অনুধাবন করার জন্যে, বিশ্বের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্যে, বিশ্বের বিরাটত্বে মুগ্ধ হবার জন্যে। ঈশ্বর চাননি যে একটি বিশেষ কর্তব্যের প্রয়োজনে আবদ্ধ হয়ে মানুষ একই জায়গায় স্থাণু হয়ে থাকুক, ঈশ্বর তাকে দিয়েছিলেন চলার স্বাধীনতা, ইচ্ছার স্বাধীনতা।

আদমকে তিনি বলেছিলেন, "আমি তোমাকে বিশ্বের কেন্দ্রে স্থাপন করেছি—যাতে তুমি চারদিকে তাকিয়ে এই বিশ্বে যা-কিছু আছে সবই দেখতে পাও। তুমি নশ্বর নও, তুমি অবিনশ্বরও নও। তুমি পার্থিব জীব নও, স্বর্গীয় নও। কিন্তু আমি তোমাকে এমন উপকরণ দিয়ে সৃষ্টি করেছি যে তুমি হয়ে উঠতে পারো নিজের স্রষ্টা ও ভাস্বর। হয় তুমি নিচে নামতে নামতে জন্তুর স্তরে যেতে পারো, কিংবা নিজেকে করে তুলতে পারো দেবতার মতো। জন্তুরা আসে তাদের মায়ের গর্ভ থেকে—তারা হয় ঠিক যেমনটি তাদের হওয়া উচিত। তাদের আত্মা গোড়ায় যা পরেও তাই, সবসময়েই তাই হবে। তোমার ক্ষমতা আছে বড়ো হয়ে ওঠার, উন্নত হয়ে ওঠার, তোমার স্বাধীন ইচ্ছা থেকে যা তুমি হতে চাও।...একমাত্র তুমিই পারো তোমার ভাগ্যকে গড়ে তুলতে।"

কলমটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে মিরানদোলা আবার পড়তে লাগলেন যা তিনি লিখেছেন। একটি বিতর্ক-সভার জন্য তিনি একটি ভাষণ তৈরি করছিলেন, এই কথাগুলো সেই মহান ভাষণের শেষাংশ। এই বিতর্ক-সভায় তিনি বিশ্বের সমস্ত পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহবান করতে চেয়েছিলেন তাদের প্রত্যেককে যারা মানুষকে হেয় করে, যারা ঈশ্বরের নাম নিয়ে ঘোষণা করে যে সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে মানুষ কিছুই নয় এবং ঈশ্বর নিজেই মানুষকে তৈরি করেছেন দাস হবার জন্যে। সৃষ্টিকর্তা নিজেই এসে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে রক্ষা করুন।

এই চ্যালেঞ্জের কী জবাব দিয়েছিল তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা? পিকো দেলা মিরানদোলার সিদ্ধান্তগুলি খণ্ডন করার জন্যে কোনো জবাব কি তাদের ছিল? জবাবে একটি কথাও তারা বলেনি। তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াতে তারা ভয় পেয়েছিল। সম্ভাব্য সকল প্রকারে তারা চক্রান্ত করেছিল যাতে পোপ এই বিতর্ক-সভা নিষিদ্ধ করেন।

কোনো শত্রুর কাছে পিকো দেলা মিরানদোলা নতিস্বীকার করেননি। তাঁর সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি পেয়েছিলেন নিজেরই আত্মার মধ্যে, যে তাঁকে শোনাত কঠোর ভর্ৎসনার বাণী। সারাটি দিন যখন তিনি অন্য মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, এবং সারাটি রাত্রি যখন তিনি একা থাকতেন ও নিজের সঙ্গে বার্তা-বিনিময় করতেন, সংগ্রাম চলতে থাকত—পুরনো সংস্কার ও নতুন ধ্যানধারণার মধ্যে সংগ্রাম।

জয় হলো পুরনো সংস্কারের। প্রত্যেকেই ছিল পুরনো সংস্কারের পক্ষে। তাঁর ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল মেরীমাতার বিষন্ন মুখখানি, যে মুখখানি শিশুকাল থেকে তাঁর প্রিয়। কুড়ি কুড়ি পিতলের রসনা নিয়ে ঘণ্টাগুলি তাঁকে ডাকতে লাগল তিনি যেন পূর্বপুরুষের ধর্মবিশ্বাসে ফিরে আসেন। গির্জার দেয়ালে তিনি দেখতে পেলেন হাজার হাজার পাপীর চিত্র আঁকা রয়েছে আর তাতে দেখানো হয়েছে শেষ বিচারের দিন তাদের ভাগ্য কী ভয়ংকর হয়ে উঠবে। বেদী থেকে ধর্মপ্রচারকদের জ্বলন্ত বাণীগুলো তাঁর আত্মার মধ্যে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল, মশালের আগুনের মতো।

কী জবাব দিতে পারেন তিনি? নিজের পথ অনুসরণ করতে থাকা নতুন মানুষের দুর্মর সাহস? কিন্তু নতুন তো এখনো পুরনো থেকে আলাদা হয়ে বেরিয়ে আসেনি। মিরানদোলার শক্তি ফুরিয়ে আসছিল। তাঁর বুকে যে ভয় চেপে বসেছে তার সঙ্গে তর্ক করা তাঁর পক্ষে ক্রমেই আরো বেশি বেশি শক্ত হয়ে উঠছিল। ইতিমধ্যেই মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, যদিও তাঁর বয়স মাত্র বত্রিশ। পুরনো সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়ে উঠছে। সারা জীবন যা-কিছুর পক্ষে তিনি ছিলেন, মৃত্যু-শয্যায় সমস্তই অস্বীকার করে গেলেন।

যাযাবর এক মানবকে ক্যাথলিক গির্জার বুকে ফিরিয়ে আনা—এটা ডোমিনিক্যান ধর্মগুরুদের পক্ষে একটি জয়লাভ। পিকো দেলা মিরানদোলা জীবিতকালে ছিলেন অবিশ্বাসী, মৃত্যুকালে ডোমিনিক্যান। ভাগ্য তাঁকে নিয়ে নির্মম পরিহাস করে গেল। মৃত্যুর আগে অবিশ্বাসী ধরা দিয়ে বসল সেই ধর্মীয় অনুশাসনের কাছে যা অবিশ্বাসীকে মশালের আগুনে পুড়িয়ে মারত।

৬. একজন প্রকৃত বড়োমানুষের সঙ্গে পাঠকের পরিচয়

প্রাচীন গ্রীসে দু-দল মানুষের মধ্যে সংগ্রাম চলছিল। একদল প্রাচীন ও সংকীর্ণ জগতকে মেনে নিয়েছিল। অন্যদল চেষ্টা করছিল সেই জগতকে প্রসারিত করতে ও অগ্রসর করে নিয়ে যেতে। তারপর থেকে কুড়িটি শতাব্দী পার হয়েছে।

পুরনো ও নতুন জগতের মধ্যে সংগ্রাম এখন আবার জ্বলে উঠেছে—এখন যতোটা প্রচণ্ডভাবে তেমন আর কোনো সময়েই নয়। আগেকার কালে টিকে থাকবার চেষ্টা করছিল সংকীর্ণ প্রাচীন গোষ্ঠীব্যবস্থা। এখন ভাঙনের অবস্থায় এসেছে প্রভু ও দাসের সামন্তব্যবস্থা।

মানুষ এখন পিতামহদের থেকে ভিন্নভাবে চিন্তা করতে শিখেছে। জগৎ বদলাচ্ছে। তারা এখন নিজেদের চোখে যা দেখছে তার সঙ্গে পুরনো বইগুলোতে যা লেখা আছে তার কোনো মিল থাকছে না। কিন্তু পুরনো ব্যবস্থা বিনা সংগ্রামে সরে যায়নি। মনে হতে পারে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। কিন্তু ইতিহাসের কখনো পুনরাবৃত্তি হয় না।

যখন কোনো পর্বতে উঠতে হয় সেই পর্বতে ওঠার পথ ঘুরতে ঘুরতে যায় এবং বাঁক নিয়ে নিয়ে আবার আগের দিকেই ফিরে আসে। যখন মনে হয় পর্বতের চুড়োয় বুঝি পৌঁছনো গিয়েছে তখন কিন্তু সামনের দিকে তাকিয়ে দেখা যায় তুষারঢাকা পর্বতের চুড়ো রয়েছে আরো ওপরে। রাস্তা ঘুরতে থাকে. তবুও কিন্তু পুরনো রাস্তায় ফিরতে হয় না, কেননা রাস্তা ওপরের দিকে উঠে চলে। এখন নিচের দিকে তাকালে দেখা যায়, যে রাস্তা দিয়ে ওপরে ওঠা হয়েছে সেটি রয়েছে নিচে।

যে বড়োমানুষের কথা বলা হচ্ছে, তার পথও ছিল এইরকম।

একটা সময় ছিল যখন গ্রীক দার্শনিকরা পুরনো দেবতাদের বাতিল করে দিয়ে নতুনভাবে জগতকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। এখন আবার নতুন করে যুক্তি তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে। বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা জগতকে জরিপ করছে নতুনভাবে—বিদ্যালয়ে তাঁদের যা শেখনো হয়েছিল তা থেকে ভিন্নভাবে।

পথ এখন চুড়োর আরো কাছাকাছি। মানুষ এখন সত্যের আরো কাছাকাছি।

নতুনের যাঁরা ধারক ও বাহক তাঁদের ক্ষেত্রে পুনরায় মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দিল—যেমন দেখা দিয়েছিল আনাক্সাগোরাসের ক্ষেত্রে। কেননা, সংগ্রাম চালানো হচ্ছিল শুধু

বিতর্ক-সভাগুলিতে নয়, ধর্মাধিকরণের বিচার-সভাতেও। পথ-বাছাই করার কথা যারা ভাবত তাদের অন্তঃকরণে ধর্মাধিকারের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি পড়ত। প্রায়ই এমন হতো যে ভিতরকার সংগ্রামের ভার বহন করার শক্তি মানুষের থাকত না। পিকো দেলা মিরানদোলা হার মেনেছিলেন।

কিন্তু ঠিক এই সময়েই এই একই ফ্লোরেন্সে আবির্ভূত হয়েছিলেন এমন এক শক্তিশালী মানুষ যিনি নিজের সঙ্গে সংগ্রামে নিজের শক্তির অপচয় করেননি। তাঁর আত্মা দুই যুযুধান শিবিরে বিভক্ত হয়নি। পিকো দেলা মিরানদোলা পুরনো ও নতুন এই দুই যুগের সীমানায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করেছিলেন। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি সীমানা পার হয়ে এসেছিলেন।

আমরা যখন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির কথা ভাবি আমাদের মনে পড়ে প্রাচীন গ্রীসের মনীষী ও শিল্পীদের কথা। মনে পড়ে ফিডিয়াস কথা, যিনি ছিলেন দ্য ভিঞ্চির মতোই শিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি ও সঙ্গীতজ্ঞ। মনে পড়ে মাইলেটাসের থালেস-এর কথা। তিনি ছিলেন দ্য ভিঞ্চির মতো বিজ্ঞানী, যন্ত্রবিদ, দার্শনিক ও আবিষ্কারক। তিনিও দাঁড়িয়ে ছিলেন দুই যুগের সীমানায়, যখন মানুষ জগতের বিপুল প্রসার অনুভব করতে শুরু করেছিল। আর তাঁর আত্মা জগতের মতোই সবকিছুকে গ্রহণ করতে পারত। থালেস পর্যবেক্ষণ করেছিলেন নক্ষত্র, নির্মাণ করেছিলেন সেতু, পূর্বাভাস দিয়েছিলেন ঝড়ের। তিনি চেয়েছিলেন সমগ্র বিশ্বের পরিমাপ নিতে—ভূগর্ভের অন্ধকার গুহা থেকে আকাশের উজ্জ্বল গভীরতা পর্যন্ত, ভবিষ্যৎ থেকে ফিরে সবকিছুর শুরু পর্যন্ত।

কিন্তু তখনো তাঁর চোখে ফ্লোরেন্টাইন অনেক বড়ো হয়েছিল। তাঁর মধ্যে বিজ্ঞানীর প্রজ্ঞা ও শিল্পীর দক্ষতা সমন্বিত হয়েছিল যন্ত্রবিদ ও আবিষ্কারকের সাহসিকতার সঙ্গে।

আর 'মোনালিসা' ও 'শেষ নৈশভোজ'-এর শিল্পী জীবন শুরু করেছিলেন ফ্লোরেন্টাইন গিল্ড আর্টিজানদের সঙ্গে। তাঁর শিক্ষানবিশীর বছরগুলি কেটেছিল একজন ভাস্কর ও একজন স্বর্ণকারের কর্মশালায়।

দ্য ভিঞ্চির লেখা কাগজপত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, তার মধ্যে শিল্পীর আঁকা রেখাচিত্র মিশে গিয়েছে যন্ত্রবিদের পরিকল্পনার সঙ্গে। যেমন বলা যায়, এই এখানে আঁকা হয়েছে একটি অত্যন্ত সুন্দরী নারীর চিন্তাশীল মুখ আর দুর্বোধ্য হাসি, আর ঠিক তার পাশেই রয়েছে সেই একই হাতে আঁকা লেদ্‌যন্ত্রের রেখাচিত্র। অল্প কয়েকটি রেখায় ফুটে উঠেছে একটি ছোট দাঁতওলা চাকা, আর এই চাকা বড়ো একটি চাকা ঘোরাচ্ছে। এমন একটি ব্যবস্থার কথা আগে কেউ চিন্তা করেনি। এমন একটি ব্যবস্থা আগে কোনো যন্ত্রে দেখা যায়নি।

আমাদের কথাবার্তার বিষয় যাই হোক—কুঁদযন্ত্রচালকের লেদ, বাক্‌স ক্যামেরা, চোখের গড়ন বা অব্যাহত গতি, দুর্গ অবরোধ বা বাতির চিম্‌নি, মানুষের দ্বারা প্রজ্বলিত মোমবাতির দহন বা আকাশে জাজ্বল্যমান রহস্যময় নক্ষত্র—লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির কথা ভাবতেই হবে। তাঁর ওপরে সকলেরই দাবি। শিল্পীরা বলে তিনি একজন শিল্পী। যন্ত্রবিদরা মনে করে তিনি তাদের সতীর্থ। সঙ্গীতজ্ঞরা গর্ববোধ করে যে তিনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ। কবিরা তাঁকে কবি হিসাবে স্মরণ করে।

শত শত বছর ধরে পর্বতগুলির মধ্যে রাস্তা পাক খেয়েছে, অবশেষে পথের শেষে দেখা যাচ্ছে নতুন চুড়ো। থালেস অনেক দূর পর্যন্ত দেখেছিলেন। কিন্তু লিওনার্দোর সামনে উন্মুক্ত হয়েছে আরো ব্যাপক দৃশ্য।

থালেস ভাবতেন জগৎ হচ্ছে একটি বৃত্তাকার দ্বীপ যাকে পুরোপুরি ঘিরে আছে মহাসাগর। আর এই দ্বীপের কিনারের দিকে কোনো এক জায়গায় বাস করে অজানা সব মানুষ—ইণ্ডিয়ানরা, বামনরা। অজানা ছিল শুধু আমেরিকা নয়, এমনকি বৃটেনও। ইওরোপ শেষ হয়েছিল আল্‌প্‌স-এ। দিগন্তের কাছে কাস্‌পিয়ান সাগরকে মনে হতো চারদিকে ঘিরে থাকা মহাসাগরের একটি উপসাগর। কেননা কাস্‌পিয়ানের অন্যদিকের তীর আবছায়ায় হারিয়ে গিয়েছিল।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির সময়ে আরো অনেক উঁচু পর্যন্ত পেঁছনো গিয়েছিল। আর সেই উচ্চতা থেকে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি আরো অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেয়েছিলেন। ভারত ও চীনকে তিনি খুব ভালোভাবে জানতেন। কলম্বাসের পাল-তোলা জাহাজ যখন মহাসাগর পার হয়েছিল, তিনি সংগে সংগে ছিলেন। কুজ্‌ঝটিকার ভিতর থেকে দৃশ্যমান হয়েছিল আমেরিকার তীর। লিওনার্দোর সামনে প্রসারিত ছিল বিপুল মহাসাগরের বিস্তৃতি, যা প্রাচীনদের কাছে অজানা ছিল। তিনি এখন দেখতে পাচ্ছিলেন, এই জগৎ চ্যাপ্‌টা চক্রের মতো নয়—একটি গোলক।

দ্য ভিঞ্চির সময়ের মানুষেরা তখনো মনে করত, বিশ্বের কেন্দ্রে এই গোলকটি অনড়। কিন্তু অন্যদের চেয়ে লিওনার্দো আরো বেশিদূর পর্যন্ত দেখতে পেতেন। তিনি ভাবতেন, এই পৃথিবী অন্য অনেক নক্ষত্রের মতো একটি নক্ষত্র। ঊষার আবছায়ায় থালেসকে তখনো পর্যন্ত অনেক কিছু অনুমান করতে হতো। যখন তিনি দেখতে পেতেন না, তখন কল্পনার সাহায্য নিতেন। লিওনার্দোকে কোনো কিছু অনুমান করতে হতো না। অনুমান করার ওপরে তাঁর বিশ্বাসও ছিল না। "প্রকৃত শিক্ষক, যথার্থতার—পরীক্ষাকার্যের—জনক যখন কথা বলেন তখন অন্যরা যেন চুপ করে থাকে।"

প্রাচীন চিন্তাশীলরা প্রকৃতির স্বর শুনতেন, কিন্তু কদাচ সেটি পরীক্ষাকার্যে যাচাই করে নিতেন। আরিস্টটল তখনো বিশ্বাস করতেন, মুরগির ছানার চোখ যদি কেটে নেওয়া হয় তাহলে সেখানে নতুন চোখ জন্মায়। কথাটা সত্যি কিনা তা যাচাই করার কথা তাঁর কখনো মনে হয়নি। তবুও আরিস্টটলের অন্ততপক্ষে দেখার চোখ ছিল। এমন অনেক দার্শনিক ছিলেন যাঁরা জগৎ সম্পর্কে ভাবতেন, কিন্তু জগতের দিকে কখনো তাকিয়ে থাকতেন না।

এ-ধরনের মানুষ লিওনার্দো ছিলেন না। শিল্পীর আগ্রহ নিয়ে তিনি নিজের চারদিকের সবকিছু দেখতেন। চোখ দিয়ে যাচাই করতেন তাঁর চিন্তাকে, হাত দিয়ে যাচাই করতেন তাঁর চোখকে। আগুন সম্পর্কে শুধু তত্ত্বকথা বলেননি, আগুনের শিখার ওপরে কাঁচ ধরে পরীক্ষা করেছিলেন, তারপরে লিখেছিলেন, "যেখানেই আগুনের শিখা রয়েছে সেখানেই তাকে ঘিরে বাতাসের একটি প্রবাহ ওপরের দিকে উঠতে থাকে।"

তিনি সযত্নে সেইসব প্রাচীন মনীষীদের লেখা পাঠ করেছিলেন যাঁরা তখনই বুঝতে পেরেছিলেন পরীক্ষাকার্যের গুরুত্ব কতখানি। তাঁর টেবিলে ছিল হিরো-র লেখা বই। হিরো ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার কারিগর, যিনি আবিষ্কার করেছিলেন এমন এক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা যার সাহায্যে মন্দিরের দরজা খোলা যায়, এমন এক চাকা যা বাষ্পীয় শক্তিতে চলে। বহু বছর ধরে হিরোর লেখা বইয়ের কথা আরও মনে থাকেনি। কিন্তু তারপরে লিওনার্দো তাঁর নিপুণ হাত দিয়ে এমন সব নিপুণ জিনিস তৈরি করেছিলেন, যেগুলো দেখে জীবন্ত মনে হতো। যেমন, এমনি জিনিস ছিল একটি কৃত্রিম পাখি, যার ভিতরটা উত্তপ্ত বাতাসে ভরা। ফলে সেই পাখি সিলিং পর্যন্ত উঠে যেত। জিনিসটা একেবারেই খেলনা, কিন্তু এমন এক খেলনা যা থেকে সরাসরি এসেছে বেলুন।

আরো একটি উড়ন্ত যন্ত্র নির্মাণ করার চেষ্টা করেছিলেন লিওনার্দো। বায়ু-পেঁচকল সমন্বিত একটি যন্ত্রের ধারণা ও পরিকল্পনা খাড়া করেছিলেন। পেঁচকল আঁটলেই যন্ত্রটি মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে পড়ত। লিওনার্দো তাঁর জানলার সামনে একনাগাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতেন ও পায়রাদের ওড়া লক্ষ্য করতেন। দেখতেন, একটা পায়রা তার সরু সরু পা চালিয়ে হেলেদুলে কার্নিশের কিনারের দিকে আসছে। হেঁটে চলার চেয়ে উড়ে চলতে পায়রা ভালো পারে। বারকয়েক ডানা ঝাপটালেই পায়রা ভারমুক্ত হয়ে যায় ও উড়তে শুরু করে। দাঁড় যেমন দাঁড়ের সাহায্যে পিছনের দিকে জল ঠেলে, তেমনি ডানার সাহায্যে পিছনের দিকে বাতাস ঠেলতে ঠেলতে পায়রা ছাদের ওপর দিয়ে উড়তে থাকে। বাতাসের একটা প্রবাহ তাকে গ্রাস করে আর সে নিশ্চল ও ছড়ানো ডানার ওপরে ভর দিয়ে পৃথিবীর আকাশে ভাসতে থাকে।

দু-বার উড়ে যায় পার্কের ওপর দিয়ে, বায়ুনির্দেশকের ওপর দিয়ে, শিকের ওপর দিয়ে, গম্বুজের ওপর দিয়ে, পুলের ওপর দিয়ে, আর এবারে বাতাসে গা ভাসিয়ে বিনা আয়াসে নামছে—পাহাড়ের ঢালু দিয়ে যেমন নেমে আসে মানুষ। মাটির কাছাকাছি এসে সে ডানাদুটো বড়ো করে ছড়িয়ে দেয় অবতরণে যতি আনবার জন্যে। মাটিতে নামে হাল্‌কাভাবে, শেষবারের মতো একবার ডানা ঝাপ্‌টায় যাতে ঝাঁকুনি না লাগে।

এই নির্বোধ পাখি কত সুন্দরভাবেই-না আকাশে ওড়ার বিদ্যা আয়ত্ত করেছে, আর মানুষ কিনা এত চালাকচতুর হয়েও এখনো পর্যন্ত মাটির সঙ্গেই শৃঙ্খলাবদ্ধ!

লিওনার্দো তাঁর চোখের দেখায় একটা মাপ নিলেন তাঁর জানলা থেকে রাস্তার বাঁধানো ফুটপাথ পর্যন্ত দূরত্ব কতখানি। তিনি যদি জানলা থেকে লাফিয়ে পড়েন তাহলে শক্ত ফুটপাথে পড়ে তাঁর শরীরের হাড় চুরমার হয়ে যাবে। এমন কি কোনো উপায় আছে যার সাহায্যে তিনি নিজেকে আকাশেই ধরে রাখতে পারবেন, কিংবা, অন্ততপক্ষে নিজের অবতরণকে ধীরগতি করতে পারবেন? দীর্ঘকাল ধরে এই নিয়ে ভেবে ভেবে শেষপর্যন্ত একটি মডেল তৈরি করলেন। মডেলটির নাম দিলেন, "উঁচু থেকে পৃথিবীতে অবতরণের একটি উপায়"।

এমনিভাবে, প্যারাসুট যখন আবিষ্কৃত হয়, তারও তিনশো বছর আগে প্যারাসুটের ধারণা দেখা দিয়েছিল।

মনুষ্যজাতির বাকি অংশ থেকে লিওনার্দো এগিয়ে ছিলেন। শত শত বছর ধরে তাঁর পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে বারোটি পড়ে ছিল মিলানের একটি লাইব্রেরির ধুলোর গাদা এবং ভুলে-যাওয়া পাণ্ডুলিপি ও পুস্তকের মধ্যে। লিওনার্দো ১৫১৯ সালে মারা গিয়েছিলেন, আর তাঁর নোটবইগুলো পাওয়া গিয়েছিল সেই আঠারো শতকের শেষদিকে।...

কলম দিয়ে আঁকা অসংখ্য রেখা ও তল থেকে বেরিয়ে আসে একটি মানুষের মুখের জীবন্ত লক্ষণ। বহু রাস্তা—তারা চলেছে একসঙ্গে ও পৃথক পৃথকভাবে, একপাশে সরে যাচ্ছে কিংবা বেগে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—সমস্ত রাস্তা থেকে বেরিয়ে আসে একটি মানবিক পথ এবং সামনের দিকে এগিয়ে যেতেই থাকে। শতাব্দীর পর শতাব্দীর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে জীবন্ত বড়োমানুষ। কল্পনায় ছাড়া বাস্তবে আমরা কি প্রকৃতই তাকে দেখেছি?

আমরা তাকে দেখতে পেতাম লিওনার্দো দা ভিঞ্চির কর্মশালায়, যখন সেই শ্রেষ্ঠশিল্পী একেবারেই একা সংগ্রাম করতেন রেখা রঙ ও আলোছায়ার নিরবয়বের সঙ্গে, মূর্তি ধারণা ও দৃশ্যের সমাগত বাত্যার সঙ্গে। তারা ঘূর্ণির মতো ঘুরত, আর দাবি করত যে তিনি

তাদের একটি দৃশ্যমান আকার দিন, জগতের বস্তুসকলের মধ্যে স্থান দিন, এবং তাদের নিয়ে আসুন সুসমন্বিত ও অসাধারণ রকমের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার মধ্যে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে শ্রেষ্ঠশিল্পীকে প্রথমে জয় করতে হয়েছিল নিজেকে, তাঁর সৃজনশীল ইচ্ছার কাছে বশ করতে হয়েছিল যাকে বশে আনা সবচেয়ে শক্ত—অনুপ্রেরণার আবেগ।

শিল্পীর হাত যেন কখনো না কাঁপে। তাঁর ধারণা হওয়া চাই যথাযথ ও সুস্পষ্ট। আর তাই তিনি নিজের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর সকল শক্তির প্রভু। তাঁর মুখে পরিপূর্ণ শান্তি। তাঁর ঠোঁট দৃঢ়ভাবে চাপা, তাকে ঘিরে আছে দাড়ি ও গোঁফের সাদা কাঠামো—সেখানে প্রকাশ পেয়েছে বৃহত্তর ইচ্ছা। তাঁর পাঁশুটে ভুরু কোঁচকানো—রাগে নয়, মনঃসংযোগে। উঁচু কপালের নিচে তাঁর চোখের দৃষ্টি সোজা সামনের দিকে। এগুলো ছিল স্বচ্ছ জানলা যার মধ্যে দিয়ে মন তার সীমানা বাইরের দিকে ঠেলে দিয়েছিল আর অসীম জগতে নিবিষ্ট হয়েছিল।

সপ্তম অধ্যায়

১. মানুষ মহাসাগরের সীমানা পার হয়।

লিওনার্দো যখন ভাবতে শুরু করেছিলেন বায়ুর মহাসাগর কি-ভাবে জয় করবেন, তাঁর সময়ের মানুষরা তখনো জলের মহাসাগর জয় করার জন্য ব্যস্ত ছিল।

পৃথিবীর ওপরে মানুষ অনেক কিছু দেখেছে, যা নতুন ও রমনীয়। ঘুরেছে অনেক দেশে—হিমশীতল উত্তর সাগর থেকে মাদাগাস্কার পর্যন্ত, জিব্রাল্টার থেকে সুমাত্রা পর্যন্ত।

কিন্তু তার সামনে থেকে গিয়েছে মহাসাগর। বহুকাল ধরে মহাসাগরকে মনে হয়েছে জগতের প্রান্ত—জগতকে ঘিরে থাকা জলের প্রাচীর।

আরব নাবিকদের মুখে বিরাটপুরুষ হারকিউলিস সম্পর্কে গল্প শোনা যেত। তিনি নাকি মহাসাগরের মুখে শিলার স্তম্ভ খাড়া করে রেখেছেন। এই শিলার ওপরে লেখা রয়েছে—'আর দূরে নয়!' এটি এক প্রাচীন উপকথা, যা গ্রীক নাবিকরা শুনেছে ফিনিশীয় নাবিকদের মুখে, আর আরবরা শুনেছে গ্রীকদের কাছে। উপকথাটির একটি ভাষ্যে বলা হয়েছে, স্তম্ভ নয়, সেখানে পাহারা দিচ্ছেন পাথরে খোদাই করা হারকিউলিস স্বয়ং। তাঁর ডানহাতের তালু বাইরের দিকে ঘোরানো আর সেই হাতটি ছড়ানো রয়েছে ভূমধ্য-সাগরের দিকে। মনে হয়, সামনে এগিয়ে আসা প্রত্যেকটি জাহাজের লোককে তিনি বলছেন, 'থাম! আর এক কদম সামনে নয়!' সেই বিরাটপুরুষের অন্য হাতে রয়েছে মস্ত একটা চাবি, সেই চাবি দিয়ে মহাসাগরে যাবার তোরণ বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

এমনিভাবেই তখনকার মানচিত্রে জিব্রাল্টার প্রণালীকে দেখানো হতো। পাথরের তৈরি এক বিরাটপুরুষ জীবন্ত মানুষের সমুদ্রযাত্রা থামিয়ে দিতেন। মানুষ তখনো পর্যন্ত তার নিজের ক্ষমতা জানেনি, নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস করেনি।

চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইতালীয় কবি দান্তে 'দি ডিভাইন কমেডি' নামে একটি মহান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে জগতকে দেখানো হয়েছে বৃহৎ একটি পর্বত হিসেবে, যেটি উঠেছে ছোট-ছোট পর্বত থেকে, যেটি চলে গিয়েছে মুনিঋষি ও দেবদূতরা যেখানে বাস করে সেই স্বর্গের গোলকে। গোলার্ধের বিপরীত দিকে রয়েছে একই রকমের গভীর একটি কালো গহ্বর, যেটি চলে গিয়েছে ভূগর্ভের গভীরে পাতাল-রাজ্যে—যার নাম নরক।

যেখানে পাপীরা তাদের ভাগ্য নিয়ে বিলাপ করছে। এক মুহূর্তের জন্যেও তাদের শান্তি নেই। বিরাট এক পবন তাদের কয়েকজনকে ঝরাপাতার মতো ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে। অন্যরা নরকের আগুনে নিরন্তর পুড়েই চলেছে, অথচ পুড়ে শেষ হচ্ছে না। অপরাধ অনুযায়ী তাদের ভিন্ন ভিন্ন চক্রে সাজানো হয়েছে। তলার দিকে সবচেয়ে নিচে যারা রয়েছে—বিশ্বাসঘাতক ও বেইমানরা—তাদের আটক করা হয়েছে বরফের মধ্যে, পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রে। চক্র যতো বেশি গভীরে, কষ্টভোগ ততো বেশি তীব্র।

দান্তে অডিসিউসকে রেখেছিলেন নরকের একেবারে প্রথম চক্রটিতেই। চতুর ইউলিসিসকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে মহাসাগরের সীমান্ত পার হবার ধৃষ্টতা দেখাবার জন্যে, যখন নাকি—

সেই সংকীর্ণ প্রণালীতে পেঁাছেছে
যেখানে রয়েছে হারকিউলিসের সীমানা।

মানুষের আত্মাকে দান্তে জানতেন। তিনি বুঝেছিলেন, মানুষ যেমন শ্রেষ্ঠতম মহত্ত্বের চুড়োয় উত্থিত হতে পারে, তেমনি বিশ্বাসঘাতকতার গহ্বরে পতিত হতে পারে। তিনি জানতেন আবেগের শক্তি কতখানি, যা মানুষকে টেনে নেয় জানার সীমানা পেরিয়ে অজানার দিকে। কিন্তু দান্তে ছিলেন তাঁর সময়ের সন্তান। তিনি তখনো তাঁর গর্বিত, সম্মান-ভূষিত মাথা নত করতেন অ-দেখা শক্তির কাছে। তিনি তখনো বিশ্বাস করতেন, মানুষের আকাঙ্ক্ষার একটা সীমা আছে, হারকিউলিসের হাতে যে তোরণের চাবি রয়েছে সেই তোরণটি খোলার সাধ্য মানুষের কোনোকালেই হবে না।

বিশ্বাস না করেই বা উপায় কী?

আটলান্টিক মহাসাগরকে নাবিকরা বলত অন্ধকারের সাগর। বলা হতো, জলের ওপরে বাষ্পের মেঘ ওঠে আর ঘন কুয়াশায় সূর্য আড়াল পড়ে যায়। আর তারপরে যখন ঘূর্ণিবাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেই ঘূর্ণিবাতাস মেঘগুলোকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একটা স্তম্ভ তৈরি করে। সেই স্তম্ভ জলের ওপর দিয়ে জলস্তম্ভের মতো চলতে থাকে। আর মহাসাগরের জল এতই আঠা-আঠা যে জাহাজগুলো আলকাতরায় পড়ার মতো তার মধ্যে আটকে যায়, একটুও নড়তে পারে না।

এমন কোনো দেয়াল আছে কি যার মধ্যে দিয়ে বড়োমানুষটি জোর করে পথ করে নিতে পারে না?

একসময়ে নাবিকরা এক সাগর থেকে অন্য সাগরে যেতে ভয় পেত। লোহিত সাগর থেকে আরব সাগর পর্যন্ত যে উপসাগরটি গিয়েছে তাকে আরবরা বলত বাব্-এল্-মান্দেব—তার মানে, জাহাজ-ভাঙার তোরণ। তা সত্ত্বেও, এমন কিছু কিছু সাহসী আরব ছিল যারা এই সমস্ত তোরণ পেরিয়ে চলে যেত; তাদের পিছনে পিছনে যেত অল্প-সাহসীরা। তারপরে এমন সময়ও এল যখন কেউ কেউ সাহসী হয়ে আটলান্টিকের প্রবেশ-পথ পেরিয়ে গেল।

কিসের আকর্ষণে তারা আটলান্টিকের ভিতরে গিয়েছিল? তারা খোঁজ করছিল ভারতে যাবার নতুন পথ।

কথাটা এই নয় যে আরো কম দূরত্বের পুরনো রাস্তা ছিল না। স্থলপথের রাস্তা ছিল বাগদাদের মধ্যে দিয়ে, পারস্য উপসাগর পর্যন্ত। অন্য পথটি অপেক্ষাকৃত সহজ—প্রথমে সমুদ্রপথে আলেক্‌জান্দ্রিয়া পর্যন্ত, তারপরে লোহিত সাগর বরাবর ভারত মহাসাগর পর্যন্ত। এই সমুদ্র-পথটি জাহাজে জাহাজে এতই ঠাসা থাকত যে সেই সমস্ত জাহাজ চলার কোনো চিহ্ন যদি পিছনে পড়ে থাকত তাহলে পাওয়া যেত হাজার হাজার ফেনশীর্ষ তরঙ্গভঙ্গ।

কিন্তু এই সমস্ত পুরনো পথ ভাগে চলে গিয়েছিল। কে পেরেছিল সাগরকে ভাগ করতে?

২. সাগরকে যারা ভাগ করেছিল তাদের সম্পর্কে

বহু শতাব্দী ধরে আলেক্‌জান্দ্রিয়া একহাত ছড়িয়েছিল পশ্চিমের দিকে, অন্যহাত পুবের দিকে। তাহলে এমন কি করে হয় যে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার সমুদ্র-তীরের দেয়াল ঘাসে ছেয়ে গিয়েছিল? এমন কি করে হয় যে পরিত্যক্ত গুদামঘরগুলোতে পাখিরা বাসা বেঁধেছিল?

জাহাজঘাটায় পুরনো তরীগুলো ভেঙে পড়ছিল। বিশাল বিশাল ঢেউ বিনা বাধায় বন্দরের মধ্যে ঢুকে পড়ছিল, বন্দরে হাজার হাজার জাহাজ থাকলে ঢেউগুলো বাধা পেতে পারত। সাগরে জাহাজের পাল এখন বড়ো একটা দেখা যায় না। একটা সময় ছিল যখন সমস্ত জাতির পতাকা এখানে একসঙ্গে উড়ত। সেইসব দিন অনেক আগেই চলে গিয়েছে।

তাহলে কি প্রচন্ড একটা ঝড় একসময়ের এত জীবন্ত একটি বন্দরকে এমনভাবে ধ্বংস করে গিয়েছে? ঝড়ই বটে, তবে সমুদ্রের ঝড় নয়, মানুষের তৈরি ঝড়...

ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্‌টিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক ১৪৫৩ সালের দিকে। ঐটি ছিল বিরাট বিপর্যয় ও যুদ্ধের বছর।

দেশজয়ী যাযাবর বাহিনী এশিয়া থেকে আক্রমণ চালিয়েছিল। কন্‌স্টান্‌টিনোপ্‌ল-এর রাস্তা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়েছিল তুর্কী অশ্বারোহীরা। বাইজান্টিনদের অবদমিত করে সুলতান মহম্মদ বিজয়োৎসব পালন করেছিলেন। তাঁর শত্রুদের কর্তিত মাথা রক্তমাখা হয়ে তাঁর ভোজসভার টেবিলে শোভা পাচ্ছিল।

বাইজান্‌টিয়াম থেকে পশ্চিমমুখী সমস্ত রাস্তায় দলে দলে শরণার্থী ভিড় করেছিল। সঙ্গে নিয়েছিল নিজেদের ছেলেমেয়েদের ও বহনসাধ্য মালপত্র। আরো একবার পন্ডিতরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন তাঁদের কাছে যা সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি—তাঁদের বই—সেগুলো বর্বরদের চোখ থেকে লুকিয়ে ফেলার জন্যে। তাঁরা যেন পিঁপড়ে, ভেঙে-পড়া পিঁপড়ের ঢিবি থেকে নিজেদের ডিম টেনে টেনে বার করে আনছে।

আরো একবার গ্রীক দার্শনিকদের রচনাবলীকে বেরিয়ে পড়তে হলো আশ্রয়ের সন্ধানে। এবারে আশ্রয় পাওয়া গেল প্রতিবেশী ইতালিতে। অন্যদিকে তুর্কীরা চলতে লাগল উত্তরদিকে, কৃষ্ণসাগরের তীর বরাবর, আর দক্ষিণদিকে সিরিয়া ও মিশর পর্যন্ত।

ক্রিমিয়ায় কাফা-র জেনোয়া দুর্গের পতন হলো। দুর্গের ছিল গভীর পরিখা ও উঁচু গম্বুজ—কিন্তু কোনোটাই তাকে রক্ষা করতে পারল না। দুর্গের ভিতরে যারা ছিল তাদের সকলকে বন্দী করা হলো এবং বিদেশের দাস-বাজারে বিক্রি করা হলো।

তিনশো বছর ধরে কৃষ্ণসাগর পরিত্যক্ত ছিল। প্রায় চারশো বছর পরে রুশ জাহাজ যখন আবার কৃষ্ণসাগরের ওপরে ভাসল তখন সমুদ্রের পথ কারও জানা ছিল না। জলের নিচে কোথায় লুকানো পাহাড়, কোন্ সময়ে কোন্ দিকে বাতাস বইছে—এ-সম্পর্কে আগেকার সমস্ত ধারণা লোপ পেয়েছিল। নতুন করে মানচিত্র তৈরি করতে হয়েছিল। জাহাজের চালকরা অন্ধভাবে জাহাজ চালিয়েছিল। সমুদ্র সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হয়েছিল অনেক দাম দিয়ে—অনেক জাহাজডুবি ও অনেক প্রাণহানির মধ্যে দিয়ে। সেই দূর-অতীতে যখন গ্রীক ও রুশ জাহাজগুলি কৃষ্ণসাগরে পথ তৈরি করে চলাচল করতে থাকে, তার আগেই এই দাম পুরোপুরিভাবেই দিতে হয়েছিল।

উপকূল বরাবর তুর্কীরা ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। পূর্বদিকের তোরণ যতোটা শক্তপোক্তভাবে আঁটা ছিল তেমনভাবে আগে আর কখনো হয়নি। তুর্কী অশ্বারোহীরা ও

জানিসারিরা (তুর্কী সৈন্যদলের উন্নত বাহিনীর সৈনিকেরা—অ) পৌঁছে গেল সিরিয়ার কর্মব্যস্ত শহরগুলিতে ও মিশরের পিরামিডের এলাকায়।

আলেক্‌জান্দ্রিয়া পড়ে থাকল জনহীন ও পরিত্যক্ত অবস্থায়। আরো আগে থেকেই আলেক্‌জান্দ্রিয়া প্রাণহীন হয়ে আসছিল যখন রোমান পোপ হুকুম জারি করেছিলেন যে খৃস্টানরা অবতারের ভক্তদের সঙ্গে কোনোরকম বাণিজ্য করতে পারবে না এবং মিশরীয় সুলতানরা নাস্তিকদের আনা সামগ্রীর ওপরে কর বসিয়েছিলেন। কিন্তু সমুদ্রের রানী আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ওপরে সবচেয়ে ভয়ংকর আঘাত হেনেছিল অটোমান তুর্কীরা। তুর্কীরা যে বলত আল্লা জমি দিয়েছেন খাঁটি বিশ্বাসীদের, আর সমুদ্র দিয়েছেন অবিশ্বাসীদের সেটা অকারণে নয়। বিশ্বাসীরা ঘোড়ার পিঠে থাকা অবস্থাতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত, জাহাজের ডেকে থাকা অবস্থায় নয়।

পুবের সঙ্গে পশ্চিমের সংযোগকারী রাস্তাগুলো একে একে বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু পুবের ঐশ্বর্যকে ছেড়ে দেওয়া বণিকদের পক্ষে সহজ ছিল না। দুটি চাকচিক্যময় স্রোত মিলিত হলো ইতালির উপকূলবর্তী শহরগুলিতে, ভেনিসে ও জেনোয়ায়। পুবের স্রোতে ছিল মূল্যবান পাথর, মণিমুক্তো ও মশলাপাতি, আর পশ্চিমের স্রোতে তিনটি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা—ডুকাট, ফ্লোরিন ও রেআল্‌। পুব থেকে আসত নানারঙের চীনা রেশম আর পশ্চিম থেকে ফ্লোরেন্সের উজ্জ্বল বস্ত্র।

মানুষের অক্লান্ত হাত প্রতি বছর আরও বেশি দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছিল। ইতি-মধ্যেই চৌকোর স্থান নিয়েছিল স্বয়ংক্রিয় বুননযন্ত্র। নতুন একটি বুননযন্ত্র প্যাডেলে পা দিয়ে চালিত হতো। সামগ্রী ও স্বর্ণের স্রোত ক্রমেই আরো দ্রুত প্রবাহিত হয়েছিল।

লোকে নিজেরাই নিজেদের প্রশ্ন করত, এই সমস্ত স্রোত যদি শুকিয়ে যেতে শুরু করে তাহলে কী হবে? ভূমধ্যসাগরের শহরগুলির জীবন স্তব্ধ হয়ে যাবে। যন্ত্র থেমে যাবে। হাজার হাজার কারিগর ও তাদের সহকারীরা কর্মহীন হয়ে পড়বে। বাজার ও মেলাগুলি জনহীন হয়ে যাবে। আর দিন শেষ হয়ে যাবে সবচেয়ে ধনী ও সবচেয়ে শক্তিশালী বণিকদের, যেমন গিয়েছিল তাদের আগেকার কালে প্রিন্সদের।

বণিকদের মনোরম প্রাসাদ থেকে হস্তান্তরিত সামগ্রীর ব্যবসায়ীদের লোভী হাতে গিয়ে পড়বে শ্রেষ্ঠশিল্পীদের আঁকা ম্যাডোনার চিত্র, খোদাই করা সোনালী রত্ন-আধার, ভেনিসীয় স্ফটিকের ঘড়া, অতি-দুর্লভ প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। সাধারণ কোষাগারও শূন্য হয়ে পড়বে, কেননা এই সাধারণ কোষাগার পূর্ণ করত কর ও শুল্ক।

আর তাই দেখা গেল মুকুটহীন বণিকরা ও স-মুকুট রাজারা নিজ-নিজ জাহাজ সাজালেন এবং জাহাজগুলোকে সমুদ্রে পাঠাবার আগে চালকদের বললেন :

"নতুন নতুন পথের খোঁজ করো! সন্ধান চালাও উপকূল বরাবর, কিংবা সোজা বাইরের সমুদ্রে, কিন্তু চলতেই থাকো—ঝড়ের মধ্যে দিয়ে, ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যে দিয়ে, জ্বলন্ত উত্তপ্ত বিষুবের দিকে, প্রয়োজন হলে খোদ নরকের তোরণ পার হবে!"

নাবিকরা বেরিয়ে পড়েছিল।

বড়ো বড়ো জাহাজ ঝড়ে হারিয়ে গিয়েছিল। বহু মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল। তাদের পত্নীরা শোকচিহ্ন ধারণ করেছিল, কিন্তু পরপারেও আরও বেশি বেশি জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল। নতুন নতুন অভিযান সাজাবার জন্য রাজারা তাদের মণিমাণিক্য বন্ধক দিয়েছিল, বণিকরা তাদের শেষ সম্পদ বিক্রি করেছিল।

সকলেই সমুদ্রে যেতে চাইত। ছেলেরা বাড়ি থেকে পালাত আর আকাঙ্ক্ষিত

রূপকথার দেশে যাবার জন্যে জাহাজে লুকিয়ে থেকে সমুদ্রে চলে যেত। জাহাজের পর জাহাজ জিব্রাল্‌টার প্রণালীর মধ্যে দিয়ে খোলা সমুদ্রে ভেসে গিয়েছিল।

ভেনিস ও জেনোয়া আটলান্টিক মহাসাগরের যতো কাছে তার চেয়েও কাছের শহর রয়েছে। এই সমস্ত শহরেও শহরবাসীরা সমুখপানে যাওয়ার তাড়না অনুভব করেছিল। মহাসাগর যেন তাদের টানছিল। আজোর দ্বীপের তীরে ডিঙি ভেসে আসছিল উল্‌কি-আঁকা মানুষের শবদেহ নিয়ে। দাঁড়িরা জল থেকে টেনে তুলছিল লোহার হাতিয়ারের সাহায্য ছাড়াই সম্পন্ন দক্ষ কারুকার্যখচিত কাঠের টুকরো। স্রোতের সঙ্গে উঠে আসছিল অজানা গাছের বিরাট বিরাট ফাঁপা গুঁড়ি। সীমাহীন এই মহাসাগর পেরিয়ে নিশ্চয়ই তীর আছে।

আর সেই নাবিকরা সমুদ্রের বিস্তার থেকে চোখ ফেরাতে পারত না। তারা কল্পনা করত মহাসাগরের ওপারে রয়েছে ভারতের মন্দির, চীনের সোনালী প্রাসাদ...

আর তাই একটির পর একটি জাহাজ তোরণ পার হয়ে গিয়েছিল।

৩. তিনটি অন্তরীপ

জিব্রাল্‌টার ছাড়িয়ে এসে জাহাজগুলো চলতে লাগল কতক ডাইনে, কতক বাঁয়ে, আর কতক সামনের দিকে।

জেনোয়ার পোতগুলো গেল ডানদিকে, ইওরোপের তীর বরাবর। তারা গেল অ্যান্‌টোয়ার্প পর্যন্ত, সেখানকার বাজারে তাদের সামগ্রী বিক্রি করল এবং নিরাপদে স্বদেশে ফিরে এল।

ডোরিয়া ও ভিভাল্‌দা ভাইরা সমুদ্রে বেরিয়ে গেল সোজা সামনের দিকে। তাদের আশা ছিল এই পথ ধরে এগোলেই তারা ভারতে পৌঁছতে পারবে। জেনোয়ার দুটি পোতে তারা গিয়েছিল। কিন্তু অন্ধকারের সমুদ্র জাহাজ ও নাবিক দুই-ই গ্রাস করে নিল।

পর্তুগীজরা বাঁ-দিকে ঘুরে গিয়েছিল। তারা ছিল আরো সাবধানী। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে তারা এগোতে লাগল, শেষপর্যন্ত পৌঁছে গেল বোজাদোর অন্তরীপে। এখানে একটা ঝড়ের মুখে পড়ে তারা ভয় পেয়ে গেল ও থামল। সমুদ্র যেন তাদের শাসাচ্ছিল: "না, কিছুতেই আর সামনে যাওয়া নয়!" তাই তারা অন্তরীপটার নাম বদলে নাম রাখল, "না অন্তরীপ।"

জোর করে আরো সামনে এগিয়ে যাওয়াটা নিরর্থক। সেই টলেমির সময় থেকেই তো পণ্ডিতরা বলে আসছেন, আরো দক্ষিণে যাওয়া অসম্ভব। সেখানে এত গরম যে কোনো প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। সেখানে কোনো গাছপালা বা জন্তুজানোয়ার নেই। অধিকন্তু, তারা বলল, আফ্রিকা ছড়িয়ে আছে একটা নিরেট দেয়ালের মতো, পাক্কা দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত। এই পথ ধরে ভারতে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। আর ভারতেই যদি না যাওয়া গেল তাহলে আফ্রিকায় ঘোরাঘুরি করাটা অর্থহীন। এটা একটা বিশ্রী প্রতিবন্ধক ছাড়া কিছু নয়, যা পূবে যাওয়ার পথ আটক করে রয়েছে। সেকালের পণ্ডিতরা এই কথাই বলে গিয়েছেন।

তা সত্ত্বেও কিছু লোক ছিল যারা সাহসী। তারা আরো এগিয়ে গেল এবং "না অন্তরীপকে" করে তুলল "হাঁ"।

তারা গেল দক্ষিণে সবচেয়ে গরম জায়গাগুলোতে, প্রায় বিষুবরেখা পর্যন্ত। তারা জানতে পারল, টলেমি ভুল বলেছিলেন।

বিষুব অঞ্চলের আশ্চর্য সব বিষয়ের গল্প করতে গিয়ে পর্তুগীজরা তামাশা করে বলত, 'আমরা এইসব কথা বলছি মহামহিম টলেমির অনুমতি নিয়ে। তিনি বলেছিলেন ওই সমস্ত দেশে কোনো মানুষ থাকে না, কিন্তু ওখানে বাস করে হাজার হাজার কালো উপজাতির মানুষ, আর ওখানকার গাছগুলো অবিশ্বাস্য আকারে বেড়ে ওঠে।'

মানচিত্রে একটা নতুন নাম দেখা দিল—কেপ ভের্দে বা সবুজ অন্তরীপ। নাবিকরা ভেবেছিল সেখানে গিয়ে দেখবে সবকিছু হলুদ, দেখবে পোড়া মাটি ছাড়া আর কিছু দেখার নেই। কিন্তু গিয়ে দেখল সেখানে তালগাছ থেকে ঝোপঝাড় পর্যন্ত সবই সবুজ। আর সবুজের জঙ্গল থেকে হাতিরা নবাগতদের দিকে তাকিয়েছিল, যে হাতিদের চামড়া গাছের বাকলের মতো খসখসে আর কান বিশাল গাছের পাতার মতো।

নাবিকদের সাহস ক্রমেই বাড়তে লাগল আর সাহস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আরও এগিয়ে গেল। উপকূল বরাবর তারা রেখে গেল পাথরের স্তম্ভ, যার ওপরে খোদাই করা ছিল পর্তুগীজ প্রতীক-চিহ্ন। ক্রুশ ও পতাকা দিয়ে জায়গাগুলো তারা মানচিত্রে চিহ্নিত করে রাখল।

সেই সমস্ত ক্রুশ ও পতাকার চিহ্ন দক্ষিণের দিকে মাইলের পর মাইল চলে গেল। তারপরে হঠাৎ একসময়ে আফ্রিকার উপকূল রেখা পূর্বদিকে বাঁক নিল। অথচ তখনো মেরু থেকে দূরত্ব বহু হাজার মাইলেরও বেশি। তখন তারা যা করতে পারত তা হচ্ছে আফ্রিকাকে ঘুরে যাওয়া। কিন্তু সেটাও সহজ ছিল না। ঝড় ও প্রতিকূল বাতাস বাধা দিচ্ছিল।

একদল পর্তুগীজ নাবিক তাদের মানচিত্রের ওপরে তারা একটি অন্তরীপ বসিয়ে নিল—ঝড়ের অন্তরীপ। অন্য দুটির চেয়ে এটি আরো দক্ষিণে। কিন্তু তারা এগিয়ে যাবে কিনা সে-বিষয়ে মনস্থির করতে পারল না। পাল তোলার আগে তাদের অধিনায়ক বার্থোলোমিউ দিয়াজ প্রতীকচিহ্ন-আঁকা পাথরের স্তম্ভে ঠেস দিয়ে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কিছুতেই সে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারছিল না, যেন নিজের ছেলের কাছে বিদায় নিচ্ছে। সে নয়, অন্য একজন নৌ-সেনাধ্যক্ষ পূর্বদিকে জাহাজ ভাসিয়ে ভারতের পূর্ব-উপকূলে পৌঁছতে পেরেছিল।

পর্তুগালের রাজা হুকুম দিলেন ঝড়ের অন্তরীপের নতুন নাম হোক উত্তমাশা অন্তরীপ। পর্তুগীজরা এবারে আশা করতে পারল এই অন্তরীপ তাদের চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

কয়েক বছর কাটতেই উত্তমাশা সত্য হয়ে উঠল। ভাস্কো দা গামার জাহাজ আফ্রিকা ঘুরে বরাবর পূর্বদিকে রওনা দিল প্রতিকূল বায়ু ও প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে। শেষপর্যন্ত নাবিকরা দিগন্তে দেখতে পেল মালাবার উপকূলের উঁচু পর্বত এবং পর্তুগীজ জাহাজ ভারতের নগর কালিকটের বন্দরে নোঙর ফেলল। ভাস্কো দা গামার একজন অনুচর লিখেছে:

'১৪৯৭ সালে পর্তুগালের রাজা ইমানুয়েল অনুসন্ধান করার জন্য ও মশলা সংগ্রহ করার জন্যে চারটি জাহাজ পাঠিয়েছিলেন। এই চারটি জাহাজের অধিনায়ক ছিলেন ভাস্কো দা গামা। ১৪৯৭ সালের ৮ই জুলাই রবিবার আমরা বাস্টেলো নগরে নোঙর তুললাম। ঈশ্বরের নামে আমরা এই অভিযান শুরু করছিলাম, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম আমাদের অভিযান যেন সফল হয়। ১৪৯৮ সালের ১৭ই মে তারিখে আমরা

ডাঙা দেখতে পেলাম, তারপরে কালিকট নগরের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমাদের অধিনায়ক আমাদের মধ্যে থেকে একজনকে পাঠিয়ে দিলেন নগরের মধ্যে। সেখানে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো দুজন মুরের কাছে। তারা স্পেনের লৌকিক ভাষায় ও জেনোয়ার ভাষায় কথা বলতে পারত। আমাদের লোককে দেখেই তারা বলে উঠেছিল, 'কোন্ শয়তান তোমাদের এখানে নিয়ে এসেছে?' কিন্তু তারপরে অবশ্য তারা খোঁজ নিতে শুরু করেছিল দেশ থেকে এত দূরে কিসের সন্ধানে আমরা গিয়েছি। আমাদের লোক জবাব দিয়েছিল, 'মশলা'...

'কালিকটের রাজার সঙ্গে ভাস্কো দা গামার সাক্ষাৎকার হলো। সাক্ষাৎকারের সময়ে রাজা শয়ান ছিলেন সুন্দর একটি পালঙ্কের ওপরে, যার ওপরে স্তূপ করা ছিল জমকালো সব বালিশ। একটি তালপাতায় আমাদের রাজার কাছে তিনি লিখলেন, 'আপনাদের অভিজাত পুরুষ ভাস্কো দা গামার পরিদর্শনে আমরা অতীব আনন্দিত। কেননা আমাদের দেশে আছে প্রচুর দারুচিনি ও প্রচুর লবঙ্গ এবং আদা ও গোলমরিচ। আর আছে মূল্যবান পাথর। এসবের বদলে আমরা আপনাদের কাছে পেতে চাই সোনা ও রুপো এবং প্রবাল ও রাঙা কাপড়।

'আমাদের অধিনায়কের যখন ধারণা হলো যে-কাজের জন্যে আমাদের পাঠানো হয়েছে তা আমরা সম্পন্ন করতে পেরেছি তখন, ২৯শে আগস্ট তারিখে, তিনি দেশে ফেরার হুকুম দিলেন। বাড়ি ফিরতে পেরে আমাদের খুবই আনন্দ হলো। তাছাড়া, আমাদের কাজ আমরা সম্পন্ন করতে পেরেছি এজন্যে আমরা খুবই খুশি ছিলাম। কালিকট থেকে যেতে লাগল সমস্ত রকমের মশলা যার খুবই কদর ছিল পশ্চিমে ও পূবে, পর্তুগালে ও সকল দেশে। আর আমরা, বাতাস না থাকার জন্যে এবং বাতাস প্রতিকূল হওয়ার জন্যে তিনমাস কাটালাম সমুদ্রের ওপরে। দেশে ফেরার পথে নাবিকদের পুরো দল গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল। আমাদের মাড়ি এতই ফুলে গেল যে সমস্ত দাঁত তাতেই ঢেকে গেল। তখন আমরা আর খেতে পারতাম না।...

'দেশে ফেরার পথে তিরিশজন মারা গেল। আরো তিরিশজন দেশের দিকে রওনা দেবার আগেই মারা পড়েছিল। শেষপর্যন্ত জাহাজে কর্মক্ষম অবস্থায় থাকল ছ'জন কি সাতজন। তাদের অবস্থাও একেবারেই ভালো ছিল না।...সবক'টি জাহাজের জন্যে যতোজন নাবিক দরকার ছিল তা আমাদের মোটেই ছিল না।...'

এই বিবরণ এখানেই শেষ হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে বিবরণের লেখক স্বদেশে পৌঁছবার আগেই মারা গিয়েছিল।

পর্তুগীজরা ভারতে যাবার সমুদ্র-পথ আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু আটলাণ্টিকের বিপুল বিস্তার যারা পার হয়েছিল তারা পর্তুগীজ নয়। পর্তুগীজরা যখন ধীরে ধীরে আফ্রিকা ঘুরে যাচ্ছিল তখন স্পেনদেশীয় ও ইংরেজদের ধারণা হলো পশ্চিমের দিকে ভয়ংকর অন্ধকারের সমুদ্র পার হয়ে তারা সরাসরি ভারতের দিকে যাচ্ছে।

জেনোয়া ও ভেনিস থেকে প্রবীণ অভিজ্ঞ নাবিকদের সঙ্গে নিত অধিনায়করা। মহাসাগর যারা জয় করতে চলেছে তাদের পক্ষে শিক্ষাগ্রহণের স্থান হিসেবে ভূমধ্যসাগর মন্দ নয়। ক্রিস্টোফার কলম্বাস নামে জেনোয়ার একজন নাবিক স্পেনে গিয়েছিলেন কাস্টিল লিওনের রাজার কাছে। আর ভেনিসের অধিবাসী, গিওভানি কাবোটো লণ্ডনের ব্রিস্টলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জাহাজ চলাচলের কোম্পানি। কলম্বাস হয়ে গেলেন ডন ক্রিস্টোবাল কলোন, স্পেনীয় সৈন্যদলের আডমিরাল। আর কাবোটো নিজের পরিচয় দিতে লাগলেন মিঃ জন কাবোট নামে।

তাঁদের মধ্যে একজন মহাসাগর পার হয়ে সেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত চলে

গিয়েছিলেন। কয়েক বছর পরে অন্যজন আবিষ্কার করলেন উত্তর আমেরিকা। মনুষ্য-জাতির কাছে দুটি তারিখ স্মরণীয় হয়ে আছে: ১৪৯২ ও ১৪৯৭। গোড়ার দিকের এই প্রথম অভিযাত্রীদের পরে বহু জাহাজ সমানে নতুন জগতের দিকে গিয়েছিল।

৪. বড়োমানুষের একটি নতুন মহাদেশ আবিষ্কার

বড়োমানুষ একটি বড়োরকমের পা ফেলল আর তার পা গিয়ে পড়ল আমেরিকার উপকূলের অদূরে দ্বীপপুঞ্জের ওপরে। দ্বীপ থেকে দ্বীপে পা ফেলতে ফেলতে পৌঁছে গেল মহাদেশে, মহাদেশের উপকূল বরাবর ঘুরে বেড়াল আর তারপরে চলে গেল আরো অনেক ভিতরে অরণ্য ও সমতল ভূমির এলাকায়। দেখতে পেল নতুন জগতকে যা তার পরিচিত পুরনো জগৎ থেকে একেবারেই আলাদা।

এখানে বিশাল বিশাল নদী বিশাল বিশাল অরণ্যের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে পথ করে নিয়েছে। নদী চলেছে এঁকেবেঁকে সবুজ সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে, যে-সব সুড়ঙ্গ তৈরি করেছে ধূসর সবুজ শ্যাওলার ঝালর দিয়ে মোড়া গাছ। ঘন অরণ্যের আলিঙ্গনে নদী এখানে স্তিমিত। কিন্তু নদীরই জিত হয় যখন সেই নদী অরণ্যকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, যেমন ভাসায় সমুদ্র। তারপরে মস্ত মস্ত গাছগুলো, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা উৎপাটিত হয় এবং জলের তোড়ে আথালি-পাথালি করতে থাকে।

নদীর মোহনায় পেঁছিতে তখনো শত-শত মাইল বাকি। কিন্তু জোয়ার-ভাটা হবার সঙ্গে সঙ্গে নদীর জল বাড়ে-কমে। মহাসাগরের ঢেউ নদীর ভিতরে অনেক দূরে পর্যন্ত চলে আসে। তাই বলে নদী কিন্তু সমুদ্রের কাছে ঋণী থাকে না। নদী যেখানে মহাসাগরে এসে পড়েছে সেই উপকূল থেকে বহুদূরে এসেও নদীর স্রোতকে আলাদা করে ধরা যায়। এমনকি নদীর স্বাদুজলও বালতি বালতি তুলে নেওয়া যেতে পারে।

উত্তরে ছিল কয়েকটি বৃহৎ হ্রদ, বিশাল বিশাল গহ্বরের মতো। আর বিশ্বের সর্ব-বৃহৎ জলপ্রপাতে বজ্রনির্ঘোষে জল পড়ছিল।

বড়োমানুষ মহাদেশের ওপরে ঘুরে বেড়াল।

সে দেখল, পর্বত উঁচু হয়ে আকাশ ছুঁয়ে আছে। পর্বতের ঢালুতে গাছ গজিয়েছে। সবচেয়ে উঁচু যে ওক্‌গাছ সেই গাছের চেয়েও এইসব গাছ চারগুণ বেশি লম্বা। গাছগুলো হাজার বছরের পুরনো।

বড়োমানুষ আরও এগিয়ে গেল। সামনে দেখতে পেল একটি গিরিখাত। সেটিকে দেখে মনে হয়, অতিবিশাল একটি লাঙল দিয়ে খোঁদল করা হয়েছে। গিরিখাতের তলা একমাইলেরও বেশি নিচে। ওপরে থেকে তাকিয়ে তলায় বয়ে যাওয়া জলস্রোত প্রায় দেখাই যায় না।

বড়োমানুষ তার প্রতি পদক্ষেপে পাখিগুলোকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল। আগে আর কখনো পাখির রাজ্যে কোনো উপদ্রব ঘটেনি। কুঁজওলা বাইসনরা তার চারদিকে ভিড় করে এল। লাঠি ও পাথর দিয়ে তাড়াতে হলো তাদের।

বড়ো-হয়ে-ওঠা সেই মানুষ এগিয়েই চলল, এগিয়েই চলল। আর নতুন জগতকে আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে এল।

৫. আবিষ্কারের মূল্য

আমরা বলেছি, 'বড়োমানুষ'। কিন্তু সেই সময়ের ইতিহাসের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাব একজন মানুষকে নয়, অরণ্য ও সমতলে ছড়িয়া থাকা বহু ছোট ছোট দলের সাহসী মানুষদের।

সেখানে রয়েছেন গন্‌জালো পিজারো। তিনি তাঁর দলকে নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার বরফ-ঢাকা আন্দিজ পর্বতে উঠেছিলেন। পর্বতে তাদের উঠতে হয়েছিল অতি সাবধানে, বরফের এক ধাপ থেকে পরের ধাপে। কিন্তু তারা উঠেই গিয়েছিল, দু-হাত ছড়িয়ে নিজেদের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য। পর্বত এত উঁচু ছিল যে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। মানুষের দম বন্ধ হয়ে আসছিল আর শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছিল। পিজারো দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁর দলের লোকেরা একের পর এক অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছে...

অন্য এক স্থানে কুয়েসাদা ও তার সঙ্গীরা দক্ষিণ আমেরিকার ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কুঠার চালিয়ে চালিয়ে পথ করে নিচ্ছিল। পায়ে পায়ে তাদের বাধা দিচ্ছিল মাটির ওপরে জড়িয়ে থাকা লতা আর শূন্যে ছড়ানো শেকড়সমেত গাছের ডাল। দিনে ও রাতে তাদের ঘিরে থাকত বিষাক্ত সাপ ও মাকড়সা, তাদের ওপরে সবসময়ে উপদ্রব চালাত ডাঁশ ও মাকড়সা। প্রতিটি পদক্ষেপে ছিল অমানুষিক পরিশ্রম ও অমানুষিক কষ্টভোগ।

এই লোকগুলো যখন গাছের তলা দিয়ে পথ তৈরি করতে করতে চলত কিংবা পর্বতের চড়াই বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে উঠত তখন তাদের কত ক্ষুদ্রই না মনে হতো! কিন্তু তারা কী বিপুল শক্তির নিদর্শনই না রেখেছিল—যা তারা করেছিল তা করার জন্যে এমন সাহসিকতা, এমন সহ্যশক্তি, এমন অধ্যবসায়!

স্পেনদেশীয় দুজন অভিযাত্রী—পানফিলো দ্য নারভায়েজ ও কাবেবো দ্য ভাকা—যখন ফ্লোরিদার জঙ্গল থেকে মেক্‌সিকো উপসাগরের উপকূলে বেরিয়ে এসেছিল তখন তারা দেখতে পেল তাদের না নিয়েই জাহাজ স্বদেশে চলে গিয়েছে। তারা ভেঙে পড়ল না। স্থির করল, যেহেতু একটি জাহাজের ব্যবস্থা করার কোনো উপায় নেই অতএব তারা একটি ছোট পালতোলা নৌকো নিজেরাই তৈরি করে নেবে।

তখনই তারা কাজে লেগে গেল, প্রায় খালি হাতেই। কিছুই তাদের ছিল না—না কুড়ুল, না হাতুড়ি, না পেরেক। তারা কাঁটা তুলে নিল নিজেদের বুটজুতো থেকে, রেকাব বার করে নিল নিজেদের জিন থেকে, যেখানে যতোটুকু টুকরো টাকরা লোহা ছিল সমস্ত সংগ্রহ করল। তারপরে একটি পাত্রের মধ্যে ঢেলে নিয়ে গলাবার আয়োজন করল। আগুনে বাতাস দেবার জন্যে তারা হরিণের চামড়া দিয়ে হাপর বানিয়ে নিল। তৈরি করল হাতুড়ি আর তা দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে তৈরি করে নিল আঙটা ও পেরেক। পালের প্রয়োজন ছিল, সেটা তৈরি করা হলো গায়ের জামা দিয়ে। দাঁড়ির প্রয়োজন ছিল, সেটা তৈরি করে নিল লতা পাকিয়ে পাকিয়ে। শেষপর্যন্ত যখন নৌকো তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেল তারা বেরিয়ে পড়ল উন্মুক্ত মহাসাগরে।

রবিনসন ক্রুসো তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারত!

বড়ো হয়ে ওঠা মানুষ বিজয়ীর পদক্ষেপে নতুন মহাদেশের ওপরে ঘুরে বেড়াল। কিন্তু প্রত্যেকটি বিজয়ের জন্যে পৃথক পৃথক মানুষকে কী মূল্যই না দিতে হয়েছিল!

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জঙ্গলের আর্দ্রতায় তার বর্মে মরচে পড়ে গেল আর জলাভূমির কুয়াশায় তার টুপি ও পোশাকআশাক নষ্ট হয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্যে তাকে সাপে কামড়াল। নদীর মধ্যে পড়ে গেলে কুমির তাকে কামড় বসাল।

বুনো জন্তুদের থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষকে মাটি থেকে অনেক উঁচুতে দোলনা খাটিয়ে ঘুমোতে হতো। কিন্তু সেই উঁচুতে থেকেও তারা পুরোপুরি নিরাপদ হতো না, কেননা জাগুয়াররা গাছ বেয়ে বেয়ে ঠিক সেই উঁচুতে উঠে যেত। অনেকেই খেতে না পেয়ে মারা যেত। কখনো কখনো এমন অবস্থায় পৌঁছত যে নিজেদের চামড়ার বেল্ট ও বুটজুতো সেদ্ধ করে খেতে হতো।

তাছাড়া, আগন্তুকরা দেখতে পেল নতুন মহাদেশে মানুষ রয়েছে। অল্পদিনের মধ্যেই এই মানুষদের সঙ্গে শান্তিতে থাকা গেল না। নতুন জগতের নদীর তীরে তীরে শোনা যেতে লাগল কামানের গর্জন। জবাবে পাওয়া গেল ঝাঁকে ঝাঁকে বিষাক্ত তীর।

আদি অধিবাসীদের পক্ষে সময় হয়ে উঠল বিশেষ রকমের কঠোর। স্পেনদেশীয়রা এই সমস্ত "ইণ্ডিয়ানকে" মানুষ বলে গণ্য করত না। আমেরিকায় তখনো পর্যন্ত ঘোড়া ছিল খুবই কম। ইণ্ডিয়ান মালবাহকরা স্পেনদেশীয়দের কাছে মালবাহী পশুর মতো ছিল। এই মালবাহকদের টানতে হতো কামানবাহী শকট, ভারী নোঙর ও জাহাজের রশারশি। স্পেনদেশীয়রা যে-সমস্ত জমি দখল করে নিত সেখানে কাজ করত ইণ্ডিয়ানরা—খনি থেকে রুপো তুলত, ক্ষেতে চাষ করত। সামান্যতম অবাধ্যতা দেখালেও অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হতো তাদের সঙ্গে। মানুষ সমেত ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হতো, কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হতো।

স্পেনদেশীয়রা তাদের সঙ্গে নিয়ে আসত হিংস্র বুলডগ। এই কুকুরগুলোকে মানুষ শিকার করার শিক্ষা দেওয়া হতো। প্রভুদের হুকুম পাওয়া মাত্র কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ত ইণ্ডিয়ানদের ওপর আর তাদের গলা কামড়ে ধরত। হতভাগ্য মানুষগুলোর হাত-পা পাল্টা আঘাত করত আর জান্তব আর্তনাদ করে উঠত। তাদের মরণ-চিৎকার শুনে স্পেনদেশীয়রা শুধু হেসে উঠত। ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। কোর্সিকা দ্বীপে ঠিক এইভাবেই রোমানরা মানুষ শিকার করত। কিন্তু স্পেনদেশীয়রা ছিল রোমানদের চেয়েও আরো বেশি নিষ্ঠুর।

লুঠের মাল যখন ভাগ-বাঁটোয়ারা হতো তখন তার ভাগ পেত যেমন সৈন্যরা, তেমনি কুকুররা। লিয়নসোকা নামে একটি বিখ্যাত কুকুর একহাজার ফ্লোরিন "উপায়" করেছিল। সৈন্যদের মধ্যে যারা বন্দুক চালাতে সবচেয়ে ওস্তাদ তারাও বন্দুক চালিয়ে এত বেশি উপায় করতে পারত না।

এমনিভাবে ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবমণ্ডিত পৃষ্ঠাটি কুকুরদের দ্বারা নিহত ইণ্ডিয়ানদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবুও এই প্রথমাগতদের মধ্যে মনুষ্য-জাতির সম্মান রাখার লোকও ছিল, যাঁরা এই লজ্জা সহ্য করেননি।

ধর্মযাজক ফার্নাণ্ডো মণ্টিসিনো তাঁর প্রত্যেকটি উপদেশে পশু-হয়ে-যাওয়া এই লোকগুলোকে স্পষ্ট করে নির্দেশ করতেন। কোনো শাসানি তাঁর মুখ বন্ধ করতে পারেনি। অভিজাত লাস কাসাস ইণ্ডিয়ানদের রক্ষা করার জন্য তাঁর সমগ্র জীবন ব্যয় করেছিলেন।

নতুন জগৎ আবিষ্কারের জন্য বড়োরকমের মূল্য দিতে হয়েছিল যেমন আদিবাসীদের, তেমনি নবাগতদেরও। ইণ্ডিয়ান বসতিগুলির মানুষরা দল বেঁধে সবাই আত্মহত্যা করেছিল, কেননা জীবন তাদের কাছে হয়ে উঠেছিল বড়োই অসহ্য। আর ইওরোপীয়দের কাছে জীবন খুব যে মধুর ছিল তা নয়। তাদের মধ্যে অনেকেই মারা গিয়েছিল ট্রপিকাল জ্বরে ভুগে কিংবা বিষাক্ত তীরে বিদ্ধ হয়ে। অনেকেরই জীবন শেষ হয়েছিল হাড়িকাঠে ও ফাঁসিকাঠে।

নবাগতরা নিজেদের মধ্যে মানিয়ে চলতে পারেনি। নাবিকদের খেতে হতো পোকাপড়া আলুনি ময়দার ঢিবি আর লড়াই করত ঝড়ের সঙ্গে। দেশের জন্যে তাদের মন কেমন করত। এই অবস্থা তাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাই তারা বিদ্রোহ করেছিল আর ক্যাপটেনদের জাহাজের খোলে আটক করে রেখেছিল। বিদ্রোহ দমন করার পরে ক্যাপটেনরা হয় তাদের জাহাজের পাটাতনের কিনার থেকে ঝুলিয়ে দেবে কিংবা কোনো খাঁ-খাঁ দ্বীপে ছেড়ে দিয়ে যাবে।

বিজয়ীদের তৈরি নগরগুলিতে ক্ষমতা ও লাভের জন্যে হিংস্র লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে স্পেনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শেকলে বেঁধে, একেবারে তাঁরই আবিষ্কার করা পথ দিয়ে। প্রশান্ত মহাসাগর প্রথম যিনি দেখেছিলেন সেই ভাস্কো নুনেজ দ্য বাল্‌বোয়া-কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। যে-মহাদেশে তিনি অভিযান করেছিলেন সেই মহাদেশের জমিতেই তাঁর মাথা গড়াগড়ি দিয়েছিল।

এতসব কষ্ট ও বিপদ, তবুও কিসের আকর্ষণ নতুন জগতের দিকে মানুষকে টেনেছিল? দক্ষিণে স্পেনের মানুষদের যে জিনিসটি টেনেছিল তা হচ্ছে সোনা। যেখানে সোনা নেই সেইসব জায়গাকে তারা তাদের মানচিত্রে পোড়াদেশ হিসেবে চিহ্নিত করে রাখত। উত্তরে ইংরেজ ও ফরাসীরা সেই সব "পোড়োদেশ" দখল করে নিয়েছিল আর সেখানকার অরণ্যে পেয়ে গিয়েছিল অমূল্য পশুলোম। ইওরোপের বাজারে এই পশুলোম বিক্রি করে সেই একই চকচকে ধাতুটি তারা পেয়ে যেত।

অলীকের পিছনে ধাওয়া করে মাঝে মাঝে মানুষ হাজার-হাজার মাইল ঘুরে বেড়াত।

গোন্‌জালো পিজারো, কোয়েসাদা ও ওরেলানা সন্ধান করে বেড়াতেন সোনার মানুষের দেশ এল ডোরাডো-র। একই সন্ধানে ফিরতেন ইংরেজ পর্যটক ও কবি ওয়াল্‌টার র‍্যালে। ইন্ডিয়ানরা তাঁদের সবাইকে বলেছিল, এমন দেশ আছে যে-দেশের প্রধান সূর্যের মতো ঝকঝক করে। সকালবেলা তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা অঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো সোনা ছিটিয়ে দেওয়া হয়, আর সন্ধেবেলা সে নদীর জলে সেটা ধুয়ে ফেলে। ইওরোপীয়রা এইসব গল্প বিশ্বাস করত এবং এল ডোরাডোর সন্ধানে আমেরিকার অরণ্যে ও পর্বতে ঘুরে বেড়াত।

পঁস দ্য লিয়ঁ নামে অপর একজন পর্যটক খুঁজে বেড়াতেন 'তারুণ্যের ঝরনা'। ইন্ডিয়ানরা তাঁকে বলেছিল, এই ঝরনায় যে স্নান করবে সে পুনরায় লাভ করবে স্বাস্থ্য, শক্তি ও তারুণ্য।

বাস্তবিক পক্ষে, এল ডোরাডোর মতো দেশ ছিল না, ছিল না 'তারুণ্যের ঝরনা'। কিন্তু এই দুটির খোঁজ করতে গিয়ে, এই মানুষরা এবং অন্যরা খুঁজে পেয়েছিল বাস্তব নদী ও দেশ।

গোন্‌জালো পিজারো ও ওরেলানা বিশাল নদী আমাজনে অভিযান চালিয়েছিলেন। কোয়েসাদা পৌঁছেছিলেন ওরিনোকো-র উৎসে। পঁস দ্য লিয়ঁ আবিষ্কার করেছিলেন ফ্লোরিডা। ওয়াল্‌টার র‍্যালে গিয়েছিলেন গিয়ানায় এবং ভবিষ্যৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এলাকা ভার্জিনিয়ায় বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন।

৬. নতুন জগৎ ও পুরনো সংস্কার

মানুষ নতুন জগৎ আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু যা সাধারণত হয়ে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারেনি জগৎটি নতুন। এমনিতে আবিষ্কার করাটাই যথেষ্ট শক্ত ছিল, কিন্তু

তাকে বুঝতে পারা ছিল আরো শক্ত। মানুষরা মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিল ভারত ও চীনে যাওয়ার নতুন রাস্তা খুঁজে পাওয়ার আশা নিয়ে। তারপরে যখন নতুন এক মহাদেশ অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের চোখের সামনে দেখা দিয়েছিল, তারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে উঠতে পারেনি কোথায় তারা এসেছে।

তাদের চেষ্টা ছিল ভারতে আসার। তার বদলে এসে গিয়েছিল আমেরিকার উপকূলের অদূরে এক দ্বীপে। আসার পথে কলম্বাস যখন তাঁর জাহাজের ডেকে রাত্রিবেলা দাঁড়াতেন তখন স্বপ্ন দেখতেন সেই বহু-প্রতীক্ষিত দিনের যখন ভারতের একটি নগরের বন্দরে তিনি নোঙর ফেলতে পারবেন। সেখানে তাঁর জাহাজকে ঘিরে থাকবে আরো সব জাহাজ আর সেইসব জাহাজের মানুষদের গায়ে থাকবে, কুর্তা, মাথায় পাগড়ি। থাকবে চীনা জাহাজ যাদের পালগুলো চৌকো আর দাঁড়গুলো মাস্তুলের মতো লম্বা। তীরে দেখা যাবে বণিক, নাবিক, শিবিকা-বাহক ও মশালারোহীদের কোলাহল-মুখর ভিড়। দেখা যাবে, আরবী ঘোড়া ছুটিয়ে একজন অশ্বারোহী আসছে, কিংবা গলায় সোনালী মালা দুলিয়ে একটা হাতি আসছে, আর ভিড়ের মানুষরা সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দিচ্ছে।

কল্পনার চোখে কলম্বাস দেখেছিলেন, রাজার সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি প্রাসাদে গিয়েছেন। রাজা বসে আছেন হীরকখচিত সোনালী সিংহাসনে আর তাঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। আরব বণিকরা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করবে। তাঁর জাহাজ হয়তো আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু একদফা কামানের গোলা ছুঁড়লেই দস্যুরা উচিত শিক্ষা পেয়ে যাবে।

কল্পনার চোখে কলম্বাস দেখেছিলেন, তাঁর নৌবহর স্বদেশের দিকে পাড়ি দিয়েছে। মূল্যবান মালে জাহাজগুলো ঠাসা বোঝাই—তার মধ্যে আছে সোনা, মণিমুক্তা, সুগন্ধী চন্দনকাঠ, জায়ফল, দারুচিনি, লবঙ্গ...

এমনি ছিল তাঁর স্বপ্ন। কিন্তু কী দেখেছিলেন তিনি?

আশা করেছিলেন মানুষের পরণে দেখতে পাবেন জাঁকালো পোশাক। তার বদলে দেখলেন, কি ধনী কি দরিদ্র, সকলেই প্রায় উলঙ্গ। বিলাসবহুল প্রাসাদের বদলে দেখলেন দেখতে আদিম ধরনের ঘরবাড়ি। গলায় সোনালী মালা দোলানো হাতি একটিও নয়। সোনালী সাজ পরানো ঘোড়া একটিও নয়। বন্দরে নোঙর করা চীনা জাহাজ একটিও নয়।

মনে হতে পারে, কলম্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বোঝা উচিত ছিল যেখানে তিনি আসতে চেয়েছিলেন সেটি এ-জায়গা নয়। তিনি ভারত বা ইন্ডিয়া দেখতে চেয়েছিলেন, এবং দেখলেনও, যদিও ইন্ডিয়া সেখানে ছিল না। মুহূর্তমাত্র ইতস্তত না করে তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের অভিহিত করলেন ইন্ডিয়ান—আর আজকের দিনেও আমরা একই ভুল করে চলেছি। ভাবলেন, জনশূন্য সমুদ্রতীরে যে-সব জীর্ণ আবাস দেখা যাচ্ছে সেগুলি একটি সমৃদ্ধ নগরের উপকণ্ঠ মাত্র। তারপরে যখন দেখলেন কোনো কোনো স্থানীয় অধিবাসীর নাকে সোনার আঙটা রয়েছে তখন ধরে নিলেন প্রাচ্যের সম্পদ নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও আছে।

ট্রপিকাল অরণ্যের ফুল থেকে সুগন্ধী সুবাস তাঁর নাকে ভেসে এসেছিল। তিনি ভাবলেন, মশলা ও চন্দনকাঠের সুবাস বুঝি। ইন্ডিয়ানরা পশ্চিম দিকের এক দেশের কথা বলল। কলম্বাস শুনলেন 'সিপানগো'—অর্থাৎ জাপান, কেননা তখন জাপানের এই নাম ছিল। ইন্ডিয়ানরা বলল 'ক্যারিব'। কলম্বাস ভাবলেন ইন্ডিয়ানরা কোনো এক মঙ্গোলীয় উপজাতির কথা বলছে।

সন্ধেবেলা জাহাজের রোজনামচা লেখার খাতায় লিখলেন, মহান খানের রাজধানীর কাছে তিনি এসে গিয়েছেন।

কিউবার দ্বীপে উপস্থিত হয়ে কলম্বাস আরব ভাষায় কথা বলতে পারে এমন দূতদের পাঠালেন দেশের শাসকদের কাছে। তাদের বলে দিলেন তারা যেন মশলার নমুনা নিয়ে আসে এবং ফিরে এসে তাকে জানায় দেশে প্রচুর দারুচিনি ও গোলমরিচ পাওয়া যায় কিনা। আরও বলে দিলেন, কাস্তিলের রাজার সঙ্গে মৈত্রী করার জন্য তারা যেন দেশের শাসকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করে।

দূতরা দ্বীপে চলে গেল। সেখানে কোনো নগর দেখতে পেল না। তার বদলে দেখল গোটা পঞ্চাশ ঘর। বসতির সর্দার তাদের সঙ্গে কথা বলল খোলা মাটির ওপরে উবু হয়ে বসে। কথাবার্তা সারতে হলো ইঙ্গিতে, কেননা আরবভাষা সর্দারের জানা ছিল না। স্পেনের দূতরা যখন সর্দারকে মশলার নমুনাগুলো দেখাল সর্দার তো একেবারে হতভম্ব। তাদের সে বুঝিয়ে দিল যে এসব জিনিস সে আগে কখনো দেখেনি।

ব্যাপারটা বড়োই গোলমেলে, কিন্তু তবুও কলম্বাস—যে-জায়গায় তিনি এসেছেন সে-জায়গা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করতে রাজী নন। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে কিউবার এই দ্বীপটি চীনের একটি জেলা। তাঁর নাবিকদের দিয়ে শপথ করিয়ে নিলেন যে তারাও তাই বিশ্বাস করে। তাদের নিয়মাবলীতে লিখে রাখা হলো : "যদি কেউ এই শপথ না মানে তাহলে—সে যদি অফিসার হয়—তাকে জিভ হারাতে হবে এবং জরিমানা দিতে হবে; সে যদি নাবিক হয় তাহলে একশো ঘা বেত মেরে শাস্তি দেওয়া হবে।"

যখন তাঁর জাহাজ ক্যারিবিয়ান সাগর দিয়ে যাচ্ছিল, তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, তিনি যাচ্ছেন ভারত মহাসাগর দিয়ে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন লোহিত সাগর ও আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে স্বদেশে ফিরবেন। পানামা যোজক দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন, এক জায়গায় এসে 'আবিষ্কার' করেছিলেন গঙ্গার মোহনা।

কলম্বাস চারবার মহাসাগর পার হয়েছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিশ্বাস করতেন, ভারতের কাছাকাছি কোনো জায়গায় তিনি গিয়েছিলেন। এস্‌পালোনার দ্বীপ (হাইতি) তাঁর কাছে ছিল জাপানের দ্বীপ।

দিগ্বিজয়ী এই নাবিক ইতিহাসের কাছে হাসির পাত্র হয়েছিলেন। পুরনো ধ্যানধারণা নিয়ে তিনি পদার্পণ করেছিলেন নতুন জগতে। তার ফলে তিনি যা অর্জন করেছিলেন তা উপলব্ধি করতে পারেননি। নতুন যুগের তিনি ছিলেন একজন নতুন মানুষ। কিন্তু তাঁর মস্তিষ্ক তখনো পরিপূর্ণ ছিল পুরনো চিন্তায়।

তিনি বিশ্বাস করতেন এই বিশ্ব ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ, মহাসাগরে দিন কয়েক পাড়ি দিলেই প্রাচ্যের দেশগুলিতে পৌঁছনো চলে। ধর্মীয় শাস্ত্র এজ্‌রার পুস্তকে কি একথা লেখা নেই যে সমুদ্রের এলাকার চেয়ে শুষ্ক জমির এলাকা ছয়গুণ অধিক?

তিনি জানতেন পৃথিবীর আকার গোল, কিন্তু সেটা অনেকটা ন্যাসপাতির মতো, আপেলের মতো নয়। ন্যাসপাতির যেটা সরু দিক সেখানে রয়েছে, তিনি ভাবতেন, উঁচু এক পর্বত, আর এই পর্বত চলে গিয়েছে স্বর্গ পর্যন্ত। এই পর্বতের ওপরেই রয়েছে একটি পার্থিব স্বর্গ। একটা কথা প্রায়ই তাঁর মনে হতো : তিনি কি কখনো এই স্বর্গের কাছাকাছি কোনো জায়গায় যাননি?

তিনি দেখতেন বন্দরের স্বচ্ছ জলে তালগাছের ছায়া পড়েছে। উষ্ণ বাতাস ভরে গিয়েছে সুবাসে। সবুজ ডালপালার মধ্যে উড়ে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে মনমাতানো রঙের

টিয়াপাখি। আর মানুষজন ঘুরে বেড়াচ্ছে আদম ও ইভের মতো উলঙ্গ অবস্থায়। কলম্বাস এই বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেন যে পার্থিব স্বর্গে তিনি পৌঁছতে পেরেছেন।

তাঁর সমগ্র জীবনটাই হচ্ছে এক বিরাট আবিষ্কার ও এক বিরাট ভ্রান্তির কাহিনী। এই ভ্রান্তির জন্য তাঁকে বড়োরকমের মূল্য দিতে হয়েছিল। যে মহাদেশ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তার নাম তাঁর নামে হয়নি, হয়েছিল আমেরিগো ভেসপুচ্চির নামে। শেষোক্ত জন কোনো কিছুই আবিষ্কার করেননি; শুধু এইটুকুই ধরতে পেরেছিলেন যে আমেরিকা পুরনো জগৎ নয়, নতুন জগৎ।

কলম্বাসের পরে যে-সব নাবিক আমেরিকায় গিয়েছিল তারা সেখানে দেখেছিল পাথরের হাতিয়ার সহ আদিম মানুষ শুধু নয়, মেক্সিকো ও পেরুতে দেখেছিল খাল ও বাঁধ, পুল ও রাস্তা, প্রাসাদ ও মন্দির। তারা অবাক হয়ে গিয়েছিল পাখি ও জীব-জন্তুর সোনালী মূর্তি দেখে, সুন্দর সুন্দর কাপড় দেখে, চিত্রলিপি ও নক্শা খোদাই করা ঘট দেখে।

মনুষ্যজাতির অতীত এখানে বর্তমান হয়ে রয়েছে। উত্তর আমেরিকার অরণ্যে মানুষ বাস করে আদিম শিকারীদের মতো এবং যাদু-নৃত্যের সাহায্যে বাইসনকে পোষ মানাতে চেষ্টা করে, যাতে তারা বাইসনের মাংস খেতে পারে।

মেক্সিকোর ঘরবাড়ি ঈজিয়ান দ্বীপের আদিম ঘরবাড়ির মতো। সেখানকার সর্দার মন্তেজুমা তার প্রাসাদে একটি সিংহাসনের ওপরে বসে, যেমন বসে ক্রীট দ্বীপের পুরাকাহিনীর রাজা মাইনস।

দক্ষিণ আমেরিকায় স্থানীয় মানুষরা মন্দিরে সূর্যের কাছে প্রার্থনা জানাত, যেমন জানাত প্রাচীন মিশরের মানুষরা। আর ফারাওদের মতো ইন্কাদেরও ছিল তাদের প্রজাদের ওপরে জীবন ও মৃত্যুর ক্ষমতা।

মনুষ্যজাতির ইতিহাসে এই ছিল তিনটি বৃহৎ পদক্ষেপ।

কিন্তু মহাসাগরের ওপার থেকে যে বিজেতারা এসেছিল তাদের কোনো ইতিহাস-জ্ঞান ছিল না। তারা বুঝতে পারত না তারা কী দেখছে। তারা ভাবত স্থানীয় সর্দাররা হচ্ছে তাদের স্বদেশের প্রিন্সদের মতো; আর যাদু-নৃত্য হচ্ছে সেই প্রিন্সদের দরবারে যে-মেয়েরা নাচত তাদেরই নাচের মতো। সোনা ও রুপোর মূর্তি ও ঘটের দাম তারা ঠিক করত ওজন দিয়ে। এই জিনিসগুলো এখন যদি আমাদের হাতে আসে আমরা তাদের যাদুঘরে কাঁচের বাক্সের মধ্যে রেখে দিই।

অতএব তারা নির্দয়ভাবে নগরগুলি ধ্বংস করেছিল। এইসব নগরেই তখনো পর্যন্ত বেঁচে ছিল সেই প্রাচীন সংস্কৃতি যা পুরনো জগতে বিস্মৃত।

৭. মানুষের ভূ-গোলক প্রদক্ষিণ

অতীত ও বর্তমান একই সময়ে এই বিশ্বে বেঁচেছিল। একদিকে কোনো কোনো মানুষের মনে হতো এই বিশ্ব বড়ো ছোট, বড়ো সংকীর্ণ; অন্যদিকে অনেকে আগেই জেনে গিয়েছিল এই বিশ্ব কী বিরাট।

কলম্বাসের নাবিকরা হাইতি দ্বীপে অবতরণ করে সেখানকার ইণ্ডিয়ানদের জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমাদের দেশের নাম কী?' জবাবে তারা তাদের ভাষা থেকে একটা শব্দ

বলেছিল যার অর্থ 'বিশ্ব'। তারা ভাবত যে-দ্বীপে তারা বাস করছে সেই দ্বীপই গোটা বিশ্ব।

উলটে তারাই স্পেনদেশীয়দের জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমরা কোত্থেকে এসেছ? স্বর্গ থেকে নেমে আসতে হলো কেন তোমাদের?' মিশরীয় নাবিকদের একদিন ঠিক এই প্রশ্নই করেছিল এক সুগন্ধী গাছের দেশের বর্বর মানুষরা। সেই দেশটি ছিল কৃষ্ণসাগর-তীরের পনটাস।

এই সরল প্রশ্ন শুনে স্পেনদেশীয়রা হেসেছিল, যেমন হেসেছিল মিশরীয়রা। স্পেন-দেশীয়রা জানত এই বিশ্ব বিরাট। বহু দেশ ও বহু মানুষ তারা দেখেছে। শেষপর্যন্ত হাইতিতে পৌঁছবার আগে কত দিন ও রাত্রিই না তারা কাটিয়েছে তরঙ্গসংকুল মহসাগরের ওপরে! আর এই যে দ্বীপটি, যে-দ্বীপের অধিবাসীরা মনে করে এই দ্বীপই গোটা বিশ্ব, বিনীতভাবে সেই দ্বীপের নাম তারা রাখল এসপানোলা, মানে 'ছোট-স্পেন'।

কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্ব আরও প্রসারলাভ করল। সমুদ্র-পথে ভূ-গোলককে প্রদক্ষিণ করল মানুষ। মানুষ যে ভূ-গোলককে প্রদক্ষিণ করবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করে-ছিলেন প্রাচীনকালের গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী এরাস্টোথেনেস। তিনি যা বলেছিলেন তাই হলো।

ভারতে যাবার পশ্চিমী পথের সন্ধানে বেরিয়ে মাগেলানের জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়ল। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে গিয়ে এবং আবার স্বদেশে ফিরে এসে যাত্রা সম্পূর্ণ করতে মাগেলান পারলেন না। তার আগেই তাঁর মৃত্যু হলো এবং তাঁর সমুদ্রযাত্রা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। ফিলিপাইনের একটি দ্বীপে সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে ঘটনাচক্রে তাঁর লড়াই বেধে যায়। তিনি তলোয়ার-বিদ্ধ হন এবং লড়াই করতে করতে প্রাণ হারান।

কিন্তু বড়ো-হয়ে-ওঠা মানুষকে কেউ হত্যা করতে পারে না।

একজন পণ্ডিত যখন কলম নামিয়ে রাখে, অপর একজন সেটা তুলে নেয় এবং অসম্পূর্ণ পৃষ্ঠায় লিখে চলে। একজন নৌ-চালক যখন যাত্রাপথে মারা যায়, অপর এক-জন হাল ধরে। মাগেলানের বেলাতেও তাই হলো। তার সঙ্গী এলকানো তার জায়গা নিল এবং সবসুদ্ধ পাঁচটি জাহাজকেই পথ দেখিয়ে স্বদেশের বন্দরে ফিরিয়ে নিয়ে এল।

জাহাজগুলো সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল পশ্চিম দিকে, আর ফিরে এল পূব থেকে। ঠিক যেমন সূর্য অস্ত যায় পশ্চিমে আর ওঠে পূবে।

এলকানোকে উপহার দেওয়া হলো মর্যাদার প্রতীক সম্বলিত একটি ঢাল। সেই ঢালের ওপরে আঁকা ছিল একটি ভূ-গোলক আর তার সঙ্গে এই সগর্ব ঘোষণা: 'তুমিই প্রথম আমাকে প্রদক্ষিণ করেছ।'

কতবারই না মানুষ স্বপ্ন দেখেছে যে সে হাজির হবে পৃথিবীর একেবারে কিনারে। এবারে সে পৃথিবীর চারদিকে গোটা পথটাই ঘুরে এসেছে এবং দেখতে পেয়েছে এই পথ যেমনটি হবে বলে সে ভেবেছিল তেমনটি আদৌ নয়। প্রত্যেক নগরের আছে সীমানা, প্রত্যেক দ্বীপের আছে তীর, কিন্তু পৃথিবীর কোনো সীমানা নেই। পৃথিবীর নিয়ম ভিন্ন।

কলম্বাস ও মাগেলানের সমুদ্র-যাত্রার পরে শুরু হয়ে গেল নতুন সময়। সোনা ও রুপো বোঝাই হয়ে জাহাজগুলো আমেরিকা থেকে ইওরোপে ফিরে এল। আসার পথে এইসব জাহাজ থেকে দেখা গেল, অন্য সব জাহাজ আফ্রিকা থেকে আমেরিকার দিকে চলেছে জীবন্ত মালে বোঝাই হয়ে—জীবন্ত মাল মানে নিগ্রো দাস। একই সময়ে আফ্রিকার

চারদিক দিয়ে ভারত থেকে আনা মশলাপাতির মাল বোঝাই জাহাজগুলো ভেসে বেড়াচ্ছিল।

আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে উঠেছিল ভূমধ্য মহাসাগর—অর্থাৎ বিশ্বের মধ্যস্থলে অবস্থিত মহাসাগর। ইতালির নগরগুলি তখনো তুর্কীদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। যে সমুদ্র তাদের দুই দেশকে যুক্ত করেছে সেই সমুদ্রের ওপরে কে আধিপত্য করবে তাই নিয়ে লড়াই। কিন্তু আসল ভূমধ্যসাগর তখন আর 'ভূ-মধ্য' হয়ে থাকেনি—তার অবস্থান বিশাল বিশ্বের মধ্যস্থলে ছিল না।

উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলি যখন নদীর দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতো, তাকে বলা হতো নদী যুগ। তারপরে মানুষ সাগর জয় করল, শুরু হলো সাগর যুগ। সাগর যুগের পরে এখন চলছে মহাসাগর যুগ, যখন মহাদেশগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মহাসাগরের দ্বারা।

এর পরের যুগটি কী হবে? লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এই প্রশ্নের জবাব জেনেছিলেন, যেদিন তিনি জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আকাশ দিয়ে পাখিদের উড়ে যেতে দেখেছিলেন।

৮. ভূ-গোলক নিয়ে বিবাদ

ভারতে যাবার নতুন পথের খবর ভূমধ্যসাগর-তীরের নগরগুলিতে পৌঁছে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল সেটা বিরাট এক বিপর্যয়ের খবর পাওয়ার মতো। ভেনিসের বণিকরা ছুটে গেল রিয়াল্‌টোতে। সেখানে গ্র্যান্ড ক্যানালের ওপরে পুলে লাইনবন্দী দোকানগুলোতে ব্যবসার বাজার জমজমাট ছিল। সেখানে গেলে সবসময়েই জানা যেত মশলার দর কী এবং দুকাৎ ও ফ্লোরিনের বিনিময় হার কত। শোনা যেত আগের দিন নগরে কী ঘটেছে এবং বিদেশী বণিকরা সর্বশেষ কী খবর নিয়ে এসেছে।

জাহাজের মুটেরা কাঁধ থেকে ভারী বোঝা নামিয়ে দিচ্ছে, ফেরিওলারা পাল্লা দিয়ে গলা চড়াচ্ছে, বাড়ির গিন্নীরা জ্যান্ত গুগলি ও ছটফটে মাছের স্তূপের মধ্যে ঘাঁটাঘাঁটি করছে, বণিকরা পরস্পর দর-কষাকষি করছে। এই বণিকরা সঙ্গে করে থলে বা পিপে ভর্তি মাল আনেনি। তাদের যা করতে হয় তা হচ্ছে মাল ধরা এবং সঙ্গে সঙ্গে মালের দাম ও পরিমাণ বলে দেওয়া। তা করতে গিয়ে যে সংখ্যাগুলো তারা হাঁক দিয়ে বলছে তা শুনলে যে-কোনো লোকের মাথা ঘুরে যাবে।

একটা গণ্ডোলা পাড়ের কাছে চলে আসে। একজন বণিক গাণ্ডোলার মাল্লিকের টুপিতে একটা মুদ্রা ছুঁড়ে দেয়, তারপরে ছুটে যায় খালের ওপরে অনেক উঁচু দিয়ে যে অর্ধবৃত্তাকার পুল গিয়েছে তার ওপরকার ছাদ-ঢাকা গ্যালারিতে। যেতে যেতে ব্যস্ততার সঙ্গে বন্ধু-শত্রু বিচার না করে সবাইকে সম্ভাষণ করে যায়। কেননা, সত্যি কথা বলতে কি, সবাই যেখানে সমানভাবে সর্বনাশের দুখে পড়েছে সেখানে আগেকার দিনের রেষারেষির স্মৃতি মুছে যায়।

'খবর কি?' বণিক সবাইকে জিজ্ঞেস করে।

'খারাপ', একজন জবাব দেয়, 'লবঙ্গের কোনো বাজার নেই।'

'জায়ফলেরও নেই।' আরেক জন বলে ওঠে।

'কিন্তু পর্তুগালে রাজদূত? তিনি কি কিছু লেখেন নি?'

'সেটাই তো হয়েছে মুশকিল। চিঠি আসে, কিন্তু চিঠিতে খারাপ খবর ছাড়া আর কিছু থাকে না।...'

সন্ধ্যা হয়ে যাবার পরে সারাদিনের উৎকণ্ঠা ও ভাবনাচিন্তায় ক্লান্ত বণিক ঘরে ফিরে আসে, একটা মোমবাতি জ্বালায়, তারপরে নানারকমের লেখায় ভরা একটা পুরু মোটা খাতা বার করে লিখতে থাকে :

'২৪ তারিখে পর্তুগাল থেকে একটি চিঠি এসেছে। লিখেছেন ভেনিসের রাজদূত। তাঁকে সেখানে পাঠানো হয়েছে সমুদ্রপথে ভারত গমনের খবরটি ঠিক কিনা জানবার জন্য। সমুদ্রপথে এই অভিযানটির উদ্যোগ নিয়েছিলেন পর্তুগালের রাজা। আর ভেনিস রাজ্যের পক্ষে এই অভিযানটি তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন, বহরের সাতটি জাহাজ ডুবে গিয়েছে কিন্তু বাকি ছয়টি জাহাজ এত বেশি ও এত মূল্যবান সব সামগ্রী নিয়ে ফিরে এসেছে যে তার হিসাব করাটাও শক্ত। যদি এই সমুদ্র-অভিযানটি দ্বিতীয় বার হয় তাহলে পর্তুগালের রাজা নিজেকে বলতে পারবেন অর্থের রাজা, কেননা তাঁর রাজ্যে প্রত্যেকেই যাবে মশলাপাতি কিনতে, আর এই অর্থ পর্তুগালেই থেকে যাবে।'

খবরটা ভেনিসে পেঁছিল। সকলেই অবাক হয়ে শুনল যে ভারতে যাবার নতুন এই পথ আবিষ্কার করা হয়েছে। এই পথ প্রাচীন কালে বা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। মন্ত্রিসভার সদস্যারা পর্যন্ত স্বীকার করলেন ভেনিস রাজ্যের পক্ষে এটা চরমতম খারাপ খবর। এর চেয়ে খারাপ খবর একটাই মাত্র হতে পারে—তা হচ্ছে স্বাধীনতা হারানো। আর এটা তো ঠিক, ভেনিস রাজ্য যে এত খ্যাতি ও গৌরব লাভ করেছে, সেটা সমুদ্রের দৌলতে, তার অবিরাম বাণিজ্য ও সমুদ্রযাত্রার জন্য।

'লিসবন থেকে কালিকট পর্যন্ত সমুদ্রপথ যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে ভেনিসের জাহাজ ও ভেনিসের বণিকদের জন্য যথেষ্ট মশলাপাতি পাওয়া যাবে না। আর ভেনিসের বাণিজ্যই যদি বন্ধ হয়ে যায় সেটা হয়ে দাঁড়াবে শিশুর দুধ বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থার মতো।...'

সবচেয়ে বড়ো আঘাত পড়েছিল ইতালির নগরগুলির ওপরে। আরো অনেক পশ্চিমে, আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে, অন্য সব নগর ছিল যেখানকার আকাশে সমৃদ্ধির উষার রঙ লাগতে শুরু করেছিল। আর সমুদ্র কার অধীনে থাকবে, তরঙ্গ কার শাসনে, তাই নিয়ে অন্য নগরগুলি নিজেদের মধ্যে বিবাদ শুরু করেছিল।

বড়ো বড়ো নৌ-অভিযাত্রী যে-সব আবিষ্কার করেছিল তা থেকে এমনকি ঘোর সন্দেহবাদীদেরও বিশ্বাস হলো যে এই পৃথিবী আপেলের মতো গোল। প্রথম ভূ-গোলক প্রস্তুত করলেন নুরেমবার্গের বণিক ও ভূগোলবিদ মার্টিন বেহাইম। সেটি সতর্কভাবে পরীক্ষা করলেন রাজা ও মন্ত্রীরা, পোপ ও যাজকরা। মার্টিন বেহাইম তাঁর ভূ-গোলকের ওপরে এঁকে দিয়েছিলেন বিভিন্ন মহাদেশ ও মহাসাগর, সাগর ও পর্বত। তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন নিজের এই ব্যাখ্যা :

'সকলে জেনে রাখুন, আপেলের এই মূর্তিটির ওপরে সারা বিশ্বকে মাপমতো বসানো হয়েছে। এ থেকে কারও মনে কোন সন্দেহ না থাকে যে এই বিশ্ব সরল এবং জাহাজে চেপে বা পায়ে হেঁটে যেখানে খুশি যাওয়া যেতে পারে—যেমনটি এখানে দেখানো হয়েছে।'

বেহাইম উঁচুমানের ভূগোলবিদ, কিন্তু নিচুমানের রাজনীতিবিদ। তিনি ভাবতেন, মানুষ এখন যেখানে খুশি যেতে পারে, তার সামনে কোনো বাধা নেই। কিন্তু বেহাইম যেমন ভাবতেন এই জগৎ তেমন সরল ছিল না। 'আপেলের চেহারায়' বিশ্ব তৈরির কাজ তিনি সবে শেষ করেছেন, তখনই এই বিশ্বের ওপরে নতুন একটা দাগ টেনে দেওয়া হলো আর সেই দাগ বিশ্বকে আরো একবার নতুন করে ভাগ করে দিল

স্পেনবাসী ও পর্তুগালবাসীদের মধ্যে মিল ঘটাবার জন্য পোপ আলেকসান্দর বোর্গিয়া মহাসাগরের মধ্যে দিয়ে মেরু থেকে মেরু পর্যন্ত একটি দাগ টেনে দিলেন। স্পেনের রাজাকে দিলেন পশ্চিম গোলার্ধ, আর পর্তুগালের রাজাকে ভারত সমেত পূর্ব গোলার্ধ। কাজটি করতে পেরে পোপ সন্তুষ্ট হলেন। উত্তম পিতার মতো তিনি আপেলটি দুই সন্তানের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন যাতে তারা আর মারামারি না করে।

পোপ আলেকসান্দর বোর্গিয়া ছিলেন চতুর রাজনীতিবিদ, কিন্তু নিচুমানের ভূগোল-বিদ। কিন্তু তিনি বুঝতে পারতেন না যে 'আপেলরূপী বিশ্বকে' কেটে দু-ভাগ করাটা ততো সহজ নয়। ভূ-গোলকের ওপরে দাগ টানা তো সহজ। কিন্তু মহাসাগরে তো আর সীমানাসূচক চিহ্ন নেই বা সীমান্তবর্তী ঘাঁটি নেই—সেখানে দাগ টানার উপায় কি? মহাসাগরের এই অদৃশ্য দাগটির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে কেবলমাত্র যন্ত্রপাতি ও গণকের সাহায্য নিয়ে। তার জন্য নির্ধারণ করতে হবে দ্রাঘিমা। সেটা খুবই জটিল ব্যাপার। এখন আমরা দ্রাঘিমা-রেখা টানি অতি নির্ভুল ক্রোনোমিটারের সাহায্যে। কিন্তু যে-সময়ে সমস্ত ঘড়ির ছিল একটিমাত্র কাঁটা, সেটি ঘণ্টার কাঁটা। সমুদ্রে থাকার সময়ে জাহাজের ঘণ্টা বাজাবার সময় হিসেব করা হতো বালি-ঘড়ি বা জল-ঘড়ির সাহায্যে। কোনো ঘড়িই খুব বেশি সঠিক ছিল না।

নাবিকরা দ্রাঘিমার হিসেব করত আকাশের জ্যোতিষ্ক দিয়ে। কিন্তু এই পদ্ধতি খুবই জটিল, অথচ সঠিক নয়। লোকে সমুদ্রে পাড়ি দিত এটা না জেনে যে ঠিক কোথায় তারা আছে। প্রায়ই দেখা যেত তারা ভুল গোলার্ধে গিয়ে পৌঁছেছে। এটা ঘটত কখনো কখনো আকস্মিকভাবে, তবে সাধারণত উদ্দেশ্যমূলকভাবে।

তখন মহাসাগরে গর্জে উঠত কামান। গোলন্দাজরা কামানের নলের মধ্যে কামানের গোলা ঢুকিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিত। কামানের গোলা গিয়ে পড়ত শত্রুর জাহাজের কিনারে জলের মধ্যে। বিশাল স্তম্ভের মতো উঁচু হয়ে জল ছিটিয়ে পড়ত। ভৌগোলিক দ্রাঘিমা নির্ধারণের দুরূহ সমস্যাটির সমাধান হয়ে যেত কোনো না কোনোভাবে—অবশ্যই, কার শক্তি বেশি, সেই বিচার থেকে।

সমুদ্রের ওপরে শক্তি পরখ হতো কামান দিয়ে ও জাহাজ দিয়ে। জাহাজ নির্মাণের ডকে আরো জোরে হাতুড়ির ঘা পড়ত। স্পেনের লোকেরা একটির পর একটি জাহাজ জলে ভাসিয়েছিল। পর্তুগীজরা চেষ্টা করেছিল তাদের সঙ্গে তাল রাখতে। আর উত্তরের দেশগুলিতে—ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে ও হল্যাণ্ডে—জাহাজ-নির্মাণের কারিগররা ঘুমিয়ে ছিল তাও নয়।

জাহাজের জন্য চাই কাঠ, বিশেষ করে তার মাস্তুলের জন্য। শত বছরের প্রাচীন পাইনগাছগুলো ভূপাতিত হয়েছিল। খানিকটা গুঁড়ি ও শুকনো অঙ্কুশ ছাড়া সেইসব গাছের আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। জাহাজের জন্য চাই লোহা—নোঙরের জন্য, পেরেকের জন্য, কামানের জন্য। খনি-শ্রমিকরা ভূগর্ভের গভীর থেকে গভীরতর এলাকায় চলে গিয়েছিল। জলে ভেসে যাওয়া খনিগুলো থেকে পাম্প করে জল বার করে দেবার জন্য জল-চাকাগুলোকে চূড়ান্ত মাত্রায় চালু রাখা হয়েছিল।

রাজার লোকেরা ঘোড়ায় চেপে দেশের ভিতরে ঘোরাঘুরি করেছিল। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে কামারশালার কালিঝুলি-মাখা দরজায় তারা টোকা দিত।

'রাজার চাই কামান, গোলা, বর্ম আর টাঙ্গি! জলদি! কাজে লেগে যাও! মদদ করো!'

কামারশালার হাপরে দিবারাত্রি আগুন জ্বলছিল। নেহাইয়ের ওপরে বজ্রনির্ঘোষে হাতুড়ির ঘা পড়েছিল।

রণতরীর জন্যে চাই পাল—হাজার হাজার গজ ক্যানভাস। সৈন্যদের উর্দির জন্যে চাই মাইল মাইল কাপড়। সুতাকলগুলিতে কাজের লোক কম। কাজের লোকের প্রচুর চাহিদা। প্রত্যেকটি কুটিরে সুতো কাটা ও কাপড় বোনার কাজ চলেছে। বাড়ির সবাই—চাষী ও নাবিকদের বৌরা, এমনকি বাচ্চারাও—এই কাজে ব্যস্ত। বাচ্চারাও সুতো কাটার চাকা ঘোরাচ্ছে ও পেডাল-চালিত বুনন-যন্ত্র চালাচ্ছে।

সর্বত্রই আরো ক্যানভাস, আরো উল। সর্বত্রই বণিক ও ঠিকাদারদের সিন্দুকে আরও সোনা। গাঁয়ে-গঞ্জে সর্বত্রই রাজার বাহিনীতে সদ্যনিযুক্ত সৈনিক ও নাবিকরা গায়ে নতুন উর্দি চাপিয়ে দেমাকের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন্দরে বন্দরে জাহাজের ওপরে তোলা হচ্ছে নতুন পাল। কড়া গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে নতুন আলকাতরা লাগানো কাঠ ও মাস্তুল থেকে। স্যাঁতসেঁতে নোনা বাতাস ঝাপটা দিয়ে পড়তেই টের পাওয়া গেল মাস্তুলের নতুন ক্যানভাস কত মজবুত।

নৌবহরের পর নৌবহর সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েছিল। জাহাজগুলোর ধারের দিকে চৌকোণা খোলা জায়গায় বসানো ছিল আতঙ্কজনক কামানের সারি। কাজ করতে হচ্ছিল সব মানুষকে ও সব জিনিসকে—কি নাবিক, কি কামান, কি পাল।

লড়াই আরো গুরুতর হয়ে উঠেছিল। লড়াই এখন আর এক জাহাজের বিরুদ্ধে আরেক জাহাজের নয়, বরং এক নৌবহরের বিরুদ্ধে আরেক নৌবহরের, এক দেশের বিরুদ্ধে আরেক দেশের।

কিসের জন্যে তারা লড়াই করছিল? মহাসাগরের পথের জন্যে, সমুদ্র-পারের সম্পদের জন্যে।

আটলান্টিক মহাসাগর ছিল স্পেনদেশীয়দের দখলে। আর ভারত মহাসাগর পর্তুগীজদের দখলে, কেননা পর্তুগীজদেরই দেওয়া হয়েছিল ভারত সমেত "আপেলের" পূর্ব গোলার্ধ।

পর্তুগীজ বাণিজ্যের ঘাঁটি দেখা দিয়েছিল সিংহলে, সুমাত্রায় ও জাভায়। লিসবনের বণিকরা পাল্‌কি-চেয়ারে চেপে লবঙ্গের বাগান ও জায়ফলের বাগিচা পরিদর্শন করেছিল। সুগন্ধী মালে বোঝাই হয়ে পর্তুগীজ জাহাজগুলো ইওরোপে ফিরে গিয়েছিল।

পর্তুগীজ রাজপুরুষরা ও বণিকরা নির্দয়ভাবে সেইসব দেশের মানুষদের লুণ্ঠন ও হত্যা করেছিল। ভারতীয়রা তাদের সম্পর্কে বলত, 'আমাদের কপাল ভালো, ভগবান্ আমাদের এই কৃপা করেছেন যে সংখ্যায় ওরা খুবই কম, বাঘ-সিংহের মতো কম। তা যদি না হতো তাহলে ওরা গোটা মনুষ্যজাতিকে গিলে ফেলত।'

কিন্তু লুণ্ঠনকারীদের নিজেদেরও ছিল বিপজ্জনক এক শত্রু। ডাচ বণিকরা যখন দেখল মশলাপাতি তাদের কিনতে হচ্ছে লিসবনের এক দালাল মারফত, আসল দামের চেয়েও তিনগুণ বেশি দামে—ব্যাপারটা তাদের মোটেও ভালো লাগেনি।

ভারত মহাসাগরে আরও ঘন ঘন দেখা দিতে শুরু করেছিল ডাচ জাহাজ। ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দ্বীপের ওপরে গড়ে তুলেছিল শুধু বাণিজ্যের ঘাঁটি নয়, দুর্গও। ডাচ ব্যবসায়ীরা জানত শুধু টাকা গুণতে নয়, তার চেয়েও কিছু বেশি। তারা সমান দক্ষতার সঙ্গে কামান দাগতে পারত। ডাচ বণিকরা প্রায়ই যুদ্ধ চালিয়ে পর্তুগীজ জাহাজ দখল করে নিত। অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত লবঙ্গ ও সমস্ত জায়ফল চলে গিয়েছিল ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে। ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাষ্ট্রের মতোই শক্তিশালী

হয়ে উঠেছিল। আমস্টারডামে তাদের গুদামগুলো ঠাসা বোঝাই হয়ে গিয়েছিল মশলা-পাতিতে। দাম যাতে বেশি থাকে সেজন্য বণিকরা প্রায়ই দ্বীপের ওপরকার জায়ফলের ঝাড় ও লবঙ্গের বাগান ধ্বংস করে ফেলত। তারা বলত, 'ঈশ্বর এই জগতকে যতোখানি সৃষ্টি করেছেন সেখানে পাঁচশো পাউণ্ডের বেশি লবঙ্গ বিক্রি হওয়া সম্ভব নয়।' তাই তারা লবঙ্গ পুড়িয়ে ফেলত যাতে পাঁচশো পাউণ্ডের বেশি লবঙ্গ বিক্রির জন্য না থাকে। লবঙ্গ যখন পোড়ানো হতো তখন মাইলের পর মাইল জুড়ে চারদিকের বাতাস সুগন্ধে ভরে যেত।...

"আপেলের" যে গোলার্ধ পর্তুগীজরা পেয়েছিল সেটা দখল করে নেবার জন্য ডাচরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল। অন্য যে গোলার্ধ স্পেনদেশীয়রা পেয়েছিল সেটা হাতে রাখতেও তাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। তাদের লোভী হাত উশখুশ করত আরও আরও বেশি সোনা মুঠোয় পাবার জন্য। কিন্তু সেই হাত কাজ করতে চাইত না। স্পেনের নাইটদের যারা বংশধর সেই ক্ষুদে অভিজাতরা বলত যে কাজ করা ও ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করা স্পেনের মানুষের পক্ষে অবমাননাকর। আর যারা কাজ করত সেই আরবরা ও ইহুদীরা বিতাড়িত হয়েছিল। স্পেনের মানুষরা ভাবত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে চুরি করে আনা সোনা নিয়ে তারা ধনী হয়ে উঠতে পারবে, সেজন্যে তাদের দিক থেকে পরিশ্রম করার কোনো প্রয়োজন থাকবে না। কিন্তু সেই সোনা ডাচ ও ফরাসী ও বৃটিশ সামগ্রীর জন্যে দাম দিতে গিয়ে তাদের অলস আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে গেল।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে বাণিজ্য করে বিদেশী চোরাই চালানদাররা ধনী হয়ে উঠেছিল। স্পেনের শুল্ক দপ্তরে এবং এমনকি মাদ্রিদেও তাদের স্যাঙাৎ ছিল।

যে-সময়ে স্পেনের ক্ষুদে অভিজাতরা পানভোজনে ও দামী দামী পোশাকে তাদের সোনা যদৃচ্ছ খরচ করে যাচ্ছিল ইংরাজ বণিক ও কারিগররা কঠোর শ্রম করছিল, জাহাজ বানাচ্ছিল ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করছিল। বৃটিশ জাহাজগুলো আরও বেশি সংখ্যায় আমেরিকায় গিয়েছিল। ইংরেজরা মানতেই চাইত না যে অর্ধ-পৃথিবীর মালিক হচ্ছে স্পেন। স্পেনের রাজা দাবি করলেন, সমুদ্র-পারের দেশের সঙ্গে ইংলণ্ড তার বাণিজ্য বন্ধ করুক। জবাবে ইংলণ্ড বলল যে সে এমন কথা চিন্তা পর্যন্ত করে না।

বিষয়টির নিষ্পত্তি হলো জাহাজ ও কামান দিয়ে। স্পেনের বিশাল আরমাডা ধ্বংস হয়ে গেল। মুক্ত হয়ে গেল আমেরিকার পথ।

কিন্তু ইংরেজদের তখনো আরো এক শত্রু থেকে গিয়েছিল—ডাচরা। মহাসাগরের দখল নিয়ে লড়াই চলতে লাগল।...

এমনিভাবে যে ভূ-গোলক নিয়ে আপেল তৈরি হয়েছিল সেটাই হয়ে উঠেছিল বিবাদের কারণ।

৯. তিন জাহাজ ও উত্তরের মহান দেশের গল্প

ভারত ও চীনে যাওয়ার জন্য কোনো কোনো জাহাজের ক্যাপটেন যখন পশ্চিমের পথ ধরেছিল তখন অন্য কেউ কেউ ভাবছিল উত্তর-পূর্ব দিকে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েও হয়তো এই দূরের দেশগুলিতে যাওয়া যেতে পারে।

১৫৪৮ সালে লণ্ডনে গঠিত হলো 'বণিক অভিযাত্রীদের কোম্পানি—এখনো পর্যন্ত অ-জানা ও সমুদ্রপথে অ-দেখা দেশ, দ্বীপ, রাজ্য ও এলাকা আবিষ্কারের জন্য।'

এই কোম্পানির পরিচালক নির্বাচিত হলেন প্রখ্যাত নাবিক সেবাস্টিয়ান ক্যাবট। তিনি সেই জন ক্যাবটের পুত্র যিনি উত্তর আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। জন ক্যাবট অনেক আগেই মারা গিয়েছেন আর তার ছেলেও এখন বুড়ো হয়ে গিয়েছে। বহু বছর হলো কোনো জাহাজের দোদুল্যমান ডেকের ওপরে তাঁর পা পড়েনি। কিন্তু তিনি তাঁর তরুণোচিত উৎসাহ বজায় রেখেছেন এবং এখনো স্বপ্ন দেখেন যে প্রাচ্যের সুগন্ধীভরা দেশগুলির দিকে যাওয়ার নতুন পথ।

হোলবাইন তাঁর প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। প্রতিকৃতিতে দেখা যায় দীর্ঘদেহী একজন মানুষ, তাঁর দাড়ি ধূসর, তাঁর বুকে সোনার হার। তাঁর লণ্ডনের বাড়িতে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন জানলার পাশে, মাথায় কালো টুপি, পরনে ফারের কিনার দেওয়া জম্বর পোশাক। এক হাতে ধরে আছেন একটি ভূ-গোলক, অপর হাতে একটি কম্পাস। ঘন ভুরুর নিচে তাঁর চোখদুটো চকচক করছে। সামনে তাকিয়ে তিনি দেখছেন টেম্‌স নদীর ওপরে নৌকো বা বজরা নয়, উত্তরমেরুর মহাসাগরের মধ্যে দিয়ে চলেছে এমন এক জাহাজের বহর।

সেবাস্টিয়ানের ক্যাবট খুবই খুশি হতেন যদি তিনি নিজে এই অভিযানের অধিনায়ক হতে পারতেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। এখন তিনি শুধু মনে মনে এই সমস্ত জহাজকে অনুসরণ করতে পারেন। কিন্তু আসলে যা হলো তা অনুসরণ করা নয়, তিনি এই সমস্ত জাহাজকে অতিক্রম করে গেলেন।

জাহাজগুলো তখনো নোঙর করেনি, কিন্তু তিনি তার আগেই তাঁর মনের চোখ দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন সেই সমস্ত মরুভূমির দেশ যেখানে বর্বররা বাস করে, যেখানে মানুষ ও প্রকৃতি দুই-ই বড়ো কঠোর। হিসাব করে রেখেছিলেন কেমন হতে পারে ঝড় ও প্রবাল-প্রাচীর, যুদ্ধ ও বিষাক্ত তীর, আরো হাজারটা বিপদ যার মধ্যে তাঁর নাবিকদের পড়তে হবে।

অস্ত্র ও খাদ্যসম্ভারের আয়োজন এই অভিযানে ভালোভাবেই করা হয়েছিল। কিন্তু সেটুকুই যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়াও প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট সংখ্যক উত্তম নাবিকের, যারা দৃঢ় সাধারণ বুদ্ধির অধিকারী, যারা উদ্ভূত যে-কোনো জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।

সেবাস্টিয়ান ক্যাবট তাঁর টেবিলের সামনে বসেছিলেন, এবং যে-সব জ্ঞাতব্য বিষয় তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন যেগুলি লিখে দিয়েছিলেন :

"অনুচ্ছেদ ২৮। যদি দেখতে পাও যে সমুদ্রতীরে পাথর ও সোনা ও ধাতু জড়ো করা হচ্ছে তাহলে জাহাজগুলোকে আরো কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে দেখে নিও কী জড়ো করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তীরের মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য এবং তাদের কৌতূহল আকর্ষণ করার জন্য এবং তাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলার জন্য একটা ড্রাম বা ওই রকমের কোনো যন্ত্র বাজিও। কিন্তু বিপদ থেকে দূরে থেকো এবং তাদের প্রতি কোনোরকম নিষ্ঠুরতা বা শত্রুতা দেখিও না।...

"অনুচ্ছেদ ৩০। যদি দেখতে পাও যে তারা সিংহের বা ভালুকের চামড়ার পোশাক পরে আছে আর হাতে রেখেছে লম্বা-লম্বা তীর-ধনুক তাহলে আতঙ্কিত হয়ো না। তোমরা তাদের যতো ভয় পাচ্ছ তার চেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছে তারা তোমাদের।..."

নাবিক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে সেবাস্টিয়ান ক্যাবট যা-কিছু শিখেছিলেন সমস্তই এই নির্দেশ-পুস্তকে লিখে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর জাহাজের ক্যাপটেন ও চালকদের তৈরি করছিলেন। তিনি চাননি যে কলম্বাস যে ভুল করেছিলেন সেই ভুল

আবার হোক। কলম্বাস ভেবেছিলেন মহাসাগরের ওপারে গিয়ে তিনি পাবেন সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী সব রাজ্য। তার বদলে পেয়েছিলেন অসভ্য অধ্যুষিত কতকগুলো দ্বীপ।

সেবাস্টিয়ান ক্যাবট সব জিনিসকে বিচার করতেন সমঝদারি থেকে। তিনি জানতেন তাঁর এই অভিযান চলেছে বন্য মরুভূমির দেশের দিকে। এই দীর্ঘ বিপজ্জনক সমুদ্রযাত্রায় যা-কিছু ঘটতে পারে সব কিছুর জন্যেই তিনি তৈরি করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। নির্দেশাবলী শেষ করার পরে তিনি আশাপ্রকাশ করেছিলেন, ওয়েস্ট ও ইস্ট ইন্ডিজে অভিযান যতোটা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এবং স্পেন ও পর্তুগালের রাজাদের যতোখানি লাভ এনে দিয়েছে, সে-তুলনায় এই অভিযানও কম সাফল্যমণ্ডিত হবে না এবং কম লাভ এনে দেবে না।

তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ঈশ্বর যেন অভিযাত্রীদের রক্ষা করেন। তারপরে শেষ অনুচ্ছেদের নিচে কাঁপা-কাঁপা হাতে তাঁর স্বাক্ষর ও তাঁর সীলমোহর জুড়ে দিয়েছিলেন।

ইংলণ্ডের ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের রাজত্বকালের সপ্তম বছরে ১৫৫৩ সালের ১১ই মে তারিখে, স্যার হিউজ উইলোবির অধিনায়কত্বে নৌ-বহর নোঙর তুলে যাত্রা শুরু করেছিল এবং নদীর তীর ধরে ধীরে এগিয়ে গিয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে জানা যায় নদীর তীরে হাজার-হাজার দর্শক জড়ো হয়েছিল। পারিষদরা তাকিয়ে ছিল গ্রীনউইচ প্যালেসের জানলা থেকে ও গম্বুজের চুড়ো থেকে। রাজাকে সেলাম জানিয়ে জাহাজের সমস্ত কামান থেকে তোপ দাগা হয়েছিল এবং সেই তোপধ্বনি চারিদিকের গ্রামাঞ্চল থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত কামান-দাগা চলছিল। নাবিকদের পরনে আকাশী নীল উর্দি এবং তারা ডেকের ওপরে নিয়মাফিক সারিবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের চিৎকারে আকাশ গমগম করছিল।

নৌ-বহরে জাহাজ ছিল তিনটি—'গুড হোপ', 'গুড ফেইথ' এবং 'দি এডওয়ার্ড'—বা, গুড এনটারপ্রাইজ'।

দিনের পর দিন তারা উত্তরে নরওয়ের উপকূলের দিকে ভেসে গিয়েছিল। বাতাস অনুকূল না থাকায় বহুবার থামতে হয়েছিল তাদের। ঝড় হওয়ার দরুন নাবিকরা বহুবার পাল গুটিয়ে রেখেছিল।

ফিনমার্কের উপকূলের কাছাকাছি কোনো এক জায়গায় ভয়ংকর ঝড় উঠে জাহাজগুলোকে নির্দিষ্ট পথ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। 'গুড হোপ' ও 'গুড ফেইথ' তারপরে বহুকাল হিমবাহের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত নদীর মোহানায় আশ্রয় নিয়েছিল। স্যার হিউজ উইলোবি স্থির করেছিলেন শীতকালটা সেখানেই কাটাবেন এবং চারিদিকে অনুসন্ধানী দল পাঠিয়েছিলেন। অনুসন্ধানী দলগুলি সবাই ফিরে এসেছিল এবং জানিয়েছিল, মানুষজন বা ঘরবাড়ির কোনো চিহ্ন তারা দেখতে পায়নি।

তৃতীয় জাহাজ 'এডওয়ার্ড' অজানা দেশের দিকে ভেসে গিয়েছিল।

কোন কোন দেশ এই জাহাজ আবিষ্কার করেছিল? এ-বিষয়ে ক্লিমেণ্ট অ্যাডামস নামে একজন ইংরেজ যা লিখে গিয়েছেন তা এই :

"ঈশ্বর করুণাময়, তাই তিনি তাদের চালিত করেছিলেন একশো মাইল বা তারও অধিক দীর্ঘ বৃহৎ এক উপসাগরের মধ্যে। তারা সেই উপসাগরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল এবং অনেকখানি ভিতরে ঢুকে নোঙর ফেলেছিল। তারপরে, কোন্ পথে যাবে তার সন্ধান নেবার জন্য যখন চারদিকে তাকিয়েছিল তখন দূরে দেখতে পেয়েছিল এক জেলেনৌকো।

"ক্যাপটেন চ্যান্সেলর কয়েকজন লোক নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল জেলেদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং তাদের কাছে খোঁজ করে জেনে নেওয়া এটি কোন্ দেশ, এখানে কারা থাকে এবং কিভাবে তারা জীবন কাটায়। কিন্তু জেলেরা এই অদ্ভুত দৃশ্য ও জাহাজের আকার দেখে এমনই অবাক হয়েছিল যে পালিয়ে গিয়েছিল।..."

এতদিন পর্যন্ত সবকিছুই হয়ে এসেছিল সেবাস্তিয়ান ক্যাবটের নির্দেশ অনুযায়ী। সেটি যদি মানতে হয় তাহলে এর পরে যে-কাজ করা দরকার তা হচ্ছে স্থানীয় অধিবাসীদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলার জন্য ড্রাম পেটানো। কিন্তু সেটা আর করা হয়নি। ভালো উপদেশ দেওয়াটা ভালো জিনিস, কিন্তু সেইমতো সবসময়ে কাজ করা যায় না।

জেলেরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এই বার্তা নিয়ে যে অজ্ঞাত একদল লোক হাজির হয়েছে। তখন স্থানীয় অধিবাসীরা নৌকোবোঝাই হয়ে ভিড় করে জাহাজ দেখতে এল। এই ভিড়ের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি 'শাসনকর্তা'।

ক্লিমেণ্ট অ্যাডাম্‌স আরো লিখেছেন, "আমাদের লোকেরা জানতে পারল যে এই দেশটির নাম রাশিয়া, বা মুস্‌কোভি। আর দেশটি শাসন করেন ইভান ভাসিলিয়েভিচ (তৎকালীন রাজার নাম)। দেশটি ভিতরের দিকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত।..."

ক্যাপটেন চ্যান্সেলর যতোই দেশের ভিতরে গেলেন ততোই একথাটা তাঁর কাছে আরো বেশি বেশি পরিষ্কার হতে লাগল যে প্রাচ্যের যে-সব দেশ সম্পর্কে সেবাস্তিয়ান ক্যাবট তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, মুস্‌কোভি তেমন দেশ নয়।

চ্যান্সেলর লিখেছেন, "সারা দেশ জুড়ে ভালোভাবেই দানাশস্য রোপন করা হয়েছে। প্রতিদিন সকালে দানাশস্য বা মাছ বোঝাই ছ-শো থেকে সাতশো গাড়ি দেখা যেতে পারে।

"মস্কো বেশ বড়ো নগর। আমার মনে হয়, সমগ্র নগরটি উপকণ্ঠ সমেত লণ্ডনের চেয়েও বড়ো।"

মস্কোয় চ্যান্সেলর দেখেছিলেন উঁচু দেয়াল ঘেরা সুন্দর একটি দুর্গ। দুর্গের মধ্যে ছিল নয়টি জমকালো গির্জা। জারের প্রাসাদটি ছিল প্রাচীন বৃটিশ অট্টালিকার মতো।

আর যতোই তিনি এই নতুন দেশের ভিতরে গিয়েছিলেন ততোই আশা করছিলেন যে তিনি সোনার সন্ধান পাবেন। আর সোনা দেখেছিলেন প্রচুর। মস্কোয় এই ইংরেজটিকে 'সোনালী কক্ষ' নামে একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

এই কক্ষে সোনার পাত্র বসানো টেবিল ও দেয়াল-আলমারি ছিল। এখান থেকে অতিথিদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অন্য একটি কক্ষে—যেটি ভোজনাগার। এটি সোনায় পরিপূর্ণ ছিল, যদিও 'সোনালী কক্ষ' নাম নয়। সেখানে ছিল একগজের চেয়েও বেশি উঁচু সোনার মগ ও সোনার রেকাব। দেয়াল-আলমারির পাশে দাঁড়িয়ে পরিচারকরা কাঁধে তোয়ালে রেখে অপেক্ষা করছিল। প্রত্যেকের হাতে ছিল মুক্তা ও মূল্যবান পাথর খচিত সোনার পাত্র। এগুলো ছিল জারের পানপাত্র। খাদ্য পরিবেশন করা হতো সোনার প্লেটে—শুধু জারকে নয়, সকল ভোজীকে। দুই শত লোক একসঙ্গে ভোজনে বসেছিল আর সকলকে একসঙ্গে পরিবেশন করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক সোনার ডিশ ছিল। অভিজাত পুরুষদের পরিচারকরা সকলেই সোনার পোশাক পরত।

বিদেশী অতিথিরা জারের প্রকোষ্ঠ ও কক্ষের এই বর্ণনাই দিয়েছেন।

শুধু যদি এই লেখাটুকুই আমাদের হাতে আসত তাহলে সে-সময়ের মস্কো সম্পর্কে আমরা সামান্যই জানতে পারতাম। সৌভাগ্যের বিষয়, অধিবাসীরা নিজেরাই সেখানকার জীবন সম্পর্কে আমাদের জানিয়ে গিয়েছে। আমরা জানি জারের প্রাসাদের খ্যাতি শুধু সোনার জন্যে নয়, আরও কিছুর জন্যে।

সোনালী কক্ষের দেয়াল সুন্দর সুন্দর চিত্রে ঢাকা ছিল। অলিন্দে ছিল জোশুয়া বেন নান-এর অধিনায়কত্বে ইসরায়েলী বাহিনীর যুদ্ধ ও জয়লাভের চিত্র। এই দৃশ্যটি চিত্র দেখে যে-কেউ তাতারদের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক জয়লাভগুলির কথা মনে করতে পারত। সিলিং-এ আঁকা ছিল জ্যোতিষ্কের চিত্র এবং বিভিন্ন মূর্তি পরিবৃত যীশুর চিত্র। মূর্তি-গুলির মধ্যে ছিল পাশাপাশি সুযুক্তি ও কুযুক্তি, দুই উপাদান বায়ু ও অগ্নি, বাতাস, চার ঋতু। দেয়ালে ও গম্বুজে বিদেশী অতিথিরা দেখেছিলেন রুশ ইতিহাসের ঘটনাবলীর চিত্র এবং ভ্লাদিমির থেকে শুরু করে প্রিন্সদের প্রতিকৃতি।

রুশ সরকারের পদস্থ ব্যক্তিরা এবং রুশ অভিজাত শ্রেণীর উচ্চস্থানীয় ব্যক্তিরা এই চিত্রগুলির দিকে তাকাতে চাইতেন না। কেননা এই চিত্রগুলি নতুন ধাঁচে আঁকা, "চিত্রিত ব্যক্তিদের মতো নয়"। একসময়ে দেয়ালে থাকত শুধু ধর্মীয় চিত্র। এখন খৃস্টের চিত্রের পাশাপাশি রয়েছে "এমন উচ্ছল নারীর চিত্র যাকে দেখে নৃত্যরতা মনে হয়"।

বোয়াররা (রুশদেশে সে-সময়ে শাসক প্রিন্সদের ঠিক পরেই যে অভিজাতশ্রেণীর স্থান ছিল তাদের বলা হত বোয়ার—অ) মনে করতেন, এটা আদৌ সত্য-অনুযায়ী নয়। এটা পুঁথিগত বিদ্যা ও অ-ধর্মীয় বিজ্ঞানের ফল। কেননা জার ছিলেন বিজ্ঞানের অনুগামী। অভিজাত ব্যক্তিরা তাঁদের দাড়ি ও লম্বা টুপি ঝাঁকিয়ে পরস্পরকে ফিসফিস করে বলতেন, এইসব পুঁথিগত জিনিস প্রাচীন ধর্মনিষ্ঠার পক্ষে বিপজ্জনক।

এই সব কথাবার্তা বিদেশী অতিথিরা শুনতে পেয়েছিল কিনা সেটা সন্দেহের বিষয়। বোয়াররা প্রকাশ্যে কথা বলার সময়ে জারের উচ্চ প্রশংসা করতেন। বলতেন, জার হচ্ছেন "আশ্চর্য বিচক্ষণ মানুষ, পুঁথিগত বিদ্যার অধিকারী এবং এই সমস্ত বিষয়ে অতি চমৎকার কথা বলেন।"

তোষামোদ করে বলা হলেও এক্ষেত্রে কথাগুলি সত্য। জার ইভান দি টেরিবল ছিলেন অতীব বিদ্বান মানুষ। ধর্মশাস্ত্র ও গির্জার ফাদারদের রচনার বহু অনুচ্ছেদ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। নিজের মতামত বলার সময়ে তিনি তার সমর্থনে উপস্থিত করতেন ইহুদী, গ্রীক, রোমান, গথ্ ও ফরাসীদের ইতিহাস থেকে শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত। তাঁর পত্রগুলি পরিপূর্ণ করে থাকত নানা নাম—পৌত্তলিক দেবতা ও বীররা, জিউস, অ্যাপোলো, ঈনীয়াস, বাই-বেলের রাজা ও বীররা, ডেভিড, সলোমন ও জোশুয়া বেন নান।

জারের আদেশে মস্কোতে একটি পুস্তক-মুদ্রণালয় স্থাপিত হয়েছিল। মুদ্রক ইভান ফিওদোরোভ নিজেই মুদ্রণযন্ত্রের কাজ করতেন এবং যে অক্ষরগুলি দিয়ে পরিচ্ছেদের শিরোনাম শোভিত হতো সেগুলি তৈরি করতেন।

জার জানতেন মুদ্রিত শব্দ কত শক্তিশালী। তাই তিনি একটি মুদ্রণালয় চেয়েছিলেন "অশিক্ষিত ও অবোধ" জনগণকে জ্ঞান দেবার জন্যে। এইভাবে তিনি রুশ রাষ্ট্রকে শক্তি-শালী করতে চেয়েছিলেন।

ভারা-বাঁধা নির্মীয়মাণ মুদ্রণালয়ের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে ঝাঁঝরি-বসানো তোরণ ও উঁচু গম্বুজের দিকে তাকিয়ে বোয়াররা অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। এই সমস্ত নতুন নতুন ব্যাপার তাঁরা আদৌ পছন্দ করতেন না। সেই পুরনো দিনের কথা তাঁরা ভুলে যাননি যখন প্রত্যেক বোয়ার তার নিজস্ব জমিদারিতে প্রভু ছিলেন।

একসময়ে প্রাচীন কাহিনীকার জনগণের 'অভিন্ন হৃদয়' সম্পর্কে লিখেছিলেন। চারণ-কবি গেয়েছিলেন 'প্রিন্স ইগরের গাথা'। এই চারণ-কবি প্রিন্সদের এই কারণে মন্দ বলেছিলেন যে তাদের বিবাদের জন্যেই রুশদেশ শত্রুদের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে।

এখন আর প্রিন্সদের মধ্যে কোনো বিবাদ নেই। জার-ই সবকিছু চালাচ্ছিলেন।

ব্যবস্থাপনায় দক্ষ ব্যক্তির মতো তিনি প্রিন্সদের বংশধরদের প্রতি না দেখাচ্ছিলেন পক্ষ-পাতিত্ব, না করুণা। এই সমস্ত স্বেচ্ছাচারী জমিদারকে শক্ত হাতে দমন করেছিলেন, যাতে রুশদেশ অনেকের না হয়ে একজন মাত্র শাসকের অধীনে থাকে, যাতে রুশদেশ হয়ে ওঠে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র।

প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে একটা সংগ্রাম চলছিল। প্রিন্স ও বোয়াররা চাইছিল প্রাচীন বিভাগ বজায় রাখতে। ছোট জমিদাররা ও জারের সৈন্যবাহিনীতে কর্মরত মানুষরা হয়ে উঠেছিল নবীন—ঐক্যবদ্ধ—রাষ্ট্র-শক্তি।

সংগ্রাম চলছিল শুধু অগ্নি ও তরবারি দিয়ে নয়, কলম দিয়েও। সে-সময়ের পুস্তক ও পত্রাবলী থেকে এটা পরিষ্কার দেখা যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে ইভান পেরেস্‌ভেতোভের পুস্তকগুলির উল্লেখ করা চলে। এই পুস্তকগুলি সেই সময়ে লেখা হয়েছিল যখন ইভান ভাসিলিয়েভিচের শাসনের গোড়ার বছরগুলিতে বোয়াররা ক্ষমতা দখল করেছিল।

"যে রাজ্যে মানুষ দাসত্বে বন্দী সেখানে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে তারা না হতে পারে সাহসী, না বীর। দাসত্বে বন্দী মানুষ লজ্জাসরমে ভয় পায় না। সে শক্তিমান হোক বা দুর্বল হোক, কখনো সম্মান অর্জন করতে পারে না। তার মনের ভাব এইরকম : যতক্ষণ আমি খতবন্দী হয়ে আছি ততক্ষণ আমার অন্য কোনো নাম নেই।"

কিন্তু অন্য সব পুস্তকও ছিল যাতে প্রাচীন অভিজাতরা তাদের অধিকারের পক্ষে লিখেছিলেন। জার ও প্রিন্স কুর্বস্কি-র মধ্যে যে পত্র-বিনিময় হয়েছিল তা আমাদের হাতে এসেছে। প্রিন্স কুর্বস্কি ছিলেন ইয়ারোস্লাভ প্রিন্সদের বংশধর। তিনি এই ঘটনা স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না যে ক্ষমতা এখন এসে গিয়েছে মস্কোর জারের হাতে। কুর্বস্কি রাশিয়া থেকে পালিয়ে গিয়ে রাশিয়ার শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এই কাজের সমর্থনে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি জারকে একটি পত্র দিয়েছিলেন। পত্রে বাক্‌-পটুতার পরিচয় দিয়ে জারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন যে জার একচ্ছত্র ক্ষমতা নিয়েছেন, জার "রক্ত-শোষক"।

জবাবে জার সম্পূর্ণ একটি পুস্তক লিখেছিলেন। বিশ্বাসঘাতকের মুখোশ খুলে দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে সমগ্র রুশদেশের একমাত্র শাসক হবার অধিকার তাঁর অবশ্যই আছে।

জার ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং ভারি চমৎকার লিখতে পারতেন। কিন্তু যিনি তাঁর শত্রু তিনিও তাঁর সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত ব্যক্তি। কুর্বস্কি আরিস্টটল পড়েছিলেন এবং সিসেরো অনুবাদ করেছিলেন।

তাঁদের পত্র-বিনিময় দুই মহাযোদ্ধার মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের মতো হয়ে উঠেছিল। একজন প্রাচীনের পক্ষে, অপরজন নবীনের পক্ষে। ইতিহাস ছিল ইভান ভাসিলিয়েভিচের পক্ষে।

তাঁকে বলা হতো জার ইভান. দি টেরিব্‌ল। টেরিব্‌ল বা ভয়ংকর তিনি ছিলেন স্বেচ্ছাচারী বোয়ারদের কাছে এবং বিদেশী শত্রুদের কাছে। অনেক শত্রু ছিল রাশিয়ার।

একসময়ে তোরণগুলি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকত, পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকের সীমান্তে। বিশাল এক রাজপথ চলে গিয়েছিল রুশদেশের মধ্যে দিয়ে—ভারাঙ্গিয়ানদের দেশ থেকে গ্রীকদের দেশ পর্যন্ত। কিন্তু এখন তোরণগুলি বন্ধ। পূর্বদিকের এবং দক্ষিণদিকের রাস্তা তাতাররা কেটে দিয়েছিল। পশ্চিমদিকে রুশ জমি দখল করে নিয়েছিল প্রতিবেশীরা। বাল্‌টিক সাগরের তীরে লিভোনিয়ার যোদ্ধারা। উত্তর জার্মানির হান্‌সিয়াটিক বণিকরা কোনো বিদেশী বণিককে অথবা কারিগরকে রাশিয়ায় প্রবেশ করতে দিত না। একবার ইভান, দি টেরিব্‌ল বিদেশ থেকে শতাধিক শিক্ষিত ব্যক্তিকে মস্কোতে আমন্ত্রণ জানিয়ে-

ছিলেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিল কর্মকার, ধাতু-বিগলনকারী, কামান-প্রস্তুতকারক, চিকিৎসক, ভেষজবিদ ও মুদ্রক। দীর্ঘ পথে তারা যাত্রা করেছিল পরিবারবর্গ ও নিজস্ব মালপত্র সহ। কিন্তু হান্সিয়াটিক বণিকরা তাদের কিছুতেই যেতে দিল না। ল্যুবেক-এর সেনেটাররা জারের রাজদূতদের কারাগারে বন্দী করল এবং কারিগরদের তাড়িয়ে দিল।

পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব তিনদিকেই তোরণ বন্ধ ছিল। এই সমস্ত বাধা দূর করার জন্য তারতার ও লিভোনিয়ান উভয়ের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছিল রুশরা।

পশ্চিমদিকের তোরণ খোলার আগেই রুশরা পূর্বদিকের তোরণ খুলতে পেরেছিল। জন্য তাতার ও লিভোনিয়ান উভয়ের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছিল রুশরা।
দেশে যাওয়ার রাস্তা খুলে দিয়েছিল। এই সমস্ত দূর-দূর দেশেই একসময়ে গিয়েছিলেন স-সঙ্গী আফানাসি নিকিতিন। রুশ বাহিনীর এই জয়লাভকে স্মরণীয় করার জন্যে জার হুকুম দিলেন ক্রেমলিনের প্রবেশ-পথে সাতটি পাথরের গির্জা নির্মাণ করা হোক। গির্জাগুলি চিরকাল মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিক রুশ রাষ্ট্রের কতখানি ক্ষমতা।

এই কাজের ভার নিয়েছিল কারিগর পোস্ত্‌নিক ও বার্মা, যারা ছিল এই কাজের পক্ষে "সবচেয়ে জ্ঞানী ও উপযুক্ত"। তারা যা নির্মাণ করল সেটা কিন্তু নির্দেশ অনুযায়ী নয়, বরং "ঈশ্বর তাদের যে বোধ দিয়েছেন তদনুযায়ী, ভিত্তির সহনক্ষমতার অনুযায়ী"।

তারা নির্মাণ করেছিল সাতটি নয়, নয়টি গির্জা, একই ভিত্তির ওপরে। সব মিলিয়ে একটি বিশাল ক্যাথেড্রাল হয়ে উঠেছে। তার মধ্যস্থল থেকে আকাশে তোলা হয়েছে দেড়শতাধিক ফুট উঁচু একটি বুরুজ, বুরুজের মাথায় আছে একটি গম্বুজ, আর গম্বুজের মাথাটি ছুঁচলো হয়ে একটি বিন্দু হয়ে উঠেছে। এই বড়ো বুরুজকে ঘিরে রয়েছে আটটি ছোট-ছোট বুরুজ। নির্মাণকারীদের উঁচু থেকে আরো উঁচুতে বেয়ে বেয়ে উঠতে হয়েছিল। দেয়ালগুলোকে নিয়ে আসতে হয়েছিল ক্রমেই আরো কাছাকাছি। প্রত্যেকটি খিলানকে বসাতে হয়েছিল অতি সতর্কভাবে, যাতে প্রকাণ্ড পাথরের গম্বুজের ওজন সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং নিচের দেয়াল ভেঙে না পড়ে। আজকের দিনে যদি এমন একটি কাঠামো তৈরি করতে হয় তাহলে নির্মাণকারীরা প্রথমে হিসাব করতে বসবে কাঠামোগত বলবিদ্যার নিয়ম অনুসারে কতখানি ওজন ও চাপ তৈরি হচ্ছে।

পোস্ত্‌নিক ও বার্মা কি এসব হিসেব না করেই কাজ চালিয়ে গেছে? অবশ্যই না! কিন্তু সে-সময়ে লোকে বলবিদ্যার নিয়ম বিশেষ কিছু জানত না। তারা বেশি নির্ভর করত হিসাবের ওপরে নয়, তাদের চোখের ওপরে ও বোধের ওপরে। আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারদের এই দক্ষতা আছে কিনা সেটা সন্দেহের বিষয়। পোস্ত্‌নিক ও বার্মার কুশলী কর্ম দেখে লোকে এখনো অবাক হয়।

এই সেন্ট বেসিল দি ব্লেসেড ক্যাথেড্রালে যেটা সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার সেটা সহজে নজরে পড়ে না। সেটা হচ্ছে ইটের তৈরি সিলিং যা একেবারে সমতল। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, এই সিলিং দেখা যায় একমাত্র তিনতলার অলিন্দ থেকে। সকলেই জানেন বৃত্তাকার খিলানের ইটগুলোর ভার সন্নিহিত দেয়ালগুলি বহন করে। কিন্তু সমতল বা ফ্ল্যাট সিলিং-এর ইটগুলোর ভার কে বহন করছে? অতিদক্ষ সেই নির্মাণকারীরা ইটের গাঁথুনিকে ঠেকা দেবার জন্যে লোহার রড ব্যবহার করেছিল, যেমন কংক্রিট জমাবার জন্যে আজকাল আমরা ইস্পাতের রড ব্যবহার করি। তারা তাদের সময়ের চেয়েও শত-শত বছর এগিয়ে ছিল।

রাশিয়ায় এমনি "কুশলী" কারিগর অনেক ছিল। নানা শহরে, মঠে ও জারের তালুকে

দেখা যেত বিরাট বিরাট হাপর। একটি মঠের কামারশালায় হাপর ছিল সাতটি, ভস্ত্রা সাতজোড়া, নেহাই সাতটি।

তুলা ও নভ্‌গারোদ-এর কামান-প্রস্তুতকারকরা জানত কি-ভাবে কামান তৈরি করতে হয়। পুরনো ধরনে তৈরি করত লোহা পিটিয়ে পিটিয়ে। নতুন ধরনেও তৈরি করত পিন্ডলোহা ছাঁচে ঢালাই করে। কোনো কোনো কামানের ওজন হত হাজার-হাজার পাউন্ড। এই কামান ঢালাই করে তৈরি করাটা সহজ কাজ ছিল না। কামান-প্রস্তুতকারকরা তাছাড়াও লোহা পিটিয়ে পিটিয়ে তৈরি করত মসৃণ কামানের গোলা। পিটিয়ে ও ঢালাই করে তৈরি করত ধাতুর ফিতে ও হাত-বন্দুকের আঙটা।

এখানেও কারিগরদের আগে বুঝে নিতে হতো কী তারা করতে চলেছে। রুশ কামান-প্রস্তুতকারকরা ও ধাতুকররা ধাতুর গুণাগুণ জানত। তারা ছিল পদার্থবিজ্ঞানী ও ধাতু-বিজ্ঞানী, যদিও তারা কখনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েনি। আর যে-সব "পাচক" স্‌ল্যোগানভ লবণ কারখানায় লবণ সেদ্ধ করত তারা ছিল রসায়নবিজ্ঞানী। তারা জানত বিভিন্ন ধরনের সমুদ্রের জল থেকে কি-ভাবে লবণ থিতিয়ে পড়াতে হয়। যে-সব কারিগর সৈন্যবাহিনীর জন্যে বারুদ তৈরি করত তারাও ছিল রসায়নবিজ্ঞানী।

প্রাচীন কালে রুশরা শ্বেত সাগরের তীর থেকে লৌহ আকরিক নিষ্কাশন করত। উত্তর দ্‌ভিনা নদী থেকে তারা মাইকা পেত, ভল্‌গা থেকে গন্ধক। আকরিক বিশেষজ্ঞরা জলাভূমিতে অনুসন্ধান চালাত। প্রকৃতির সঙ্গে চলছিল বিরাট এক যুদ্ধ। শক্তিশালী এক রাষ্ট্র তার সীমাহীন বিস্তৃতিকে দখলে আনছিল।

এত সব কাজের জন্যে যথেষ্ট সংখ্যক কারিগর ছিল না, যথেষ্ট হাতিয়ারও ছিল না। রুশদের যা ঘাটতি ছিল তা হয়তো তারা পশ্চিম থেকে আমদানি করতে পারত। কিন্তু পশ্চিমের রাস্তা দুর্গ দিয়ে বন্ধ ছিল এবং পথ আগলে দাঁড়িয়ে ছিল লিভোনিয়ানরা।

খোলা ছিল একমাত্র ছোট একটি পথ। সেটি উত্তরের দিকে—দ্‌ভিনা নদীর মুখে শ্বেতসাগরের তীরে কোল্‌মোগোরিতে। রুশ ধীবর ও বণিকরা প্রাচীন কাল থেকেই তাদের নৌকোয় এই পথে মুরমান্‌স্ক-এর তীর বরাবর নরওয়ে পর্যন্ত চলে যেত। উত্তরের এই ছোট পথ দিয়েই ইংরেজ আগন্তুকরা এসেছিল।...

সেবাস্তিয়ান ক্যাবট যে তিনটি জাহাজ সজ্জিত করেছিলেন তার মধ্যে মাত্র একটি রাশিয়ায় পেঁছিতে পেরেছিল। বাকি দুটি—'গুড হোপ' বা উত্তম আশা এবং 'গুড ফেইথ' বা উত্তম আস্থা—তাদের নামের মর্যাদা রাখতে পারেনি।

এক রুশ কাহিনীকার বলেছেন যে ১৫৫৫ সালের শীতকালে কারেলিয়ানরা মুরমান্‌স্ক-এর উপকূলের কাছে দুটি জাহাজ দেখতে পেয়েছিল। "জাহাজ দুটি বন্দরে নোঙর ফেলেছিল। কিন্তু দুই জাহাজের মানুষরাই ছিল মৃত, যদিও জাহাজদুটিতে প্রচুর সামগ্রী ছিল।" বোঝা যাচ্ছে, মেরু-অঞ্চলের অভিজ্ঞতা ইংরেজদের ছিল না, সেখানকার বরফে ও তুষারে তারা ঠান্ডায় জমে গিয়েছে। তৃতীয় জাহাজ 'গুড এণ্টারপ্রাইজ' সম্পর্কে কাহিনীকার বলছেন, "সমুদ্র থেকে একটা জাহাজ দ্‌ভিনা নদীর মুখে এসে হাজির হলো। জাহাজের মানুষরা ছোট ছোট বোটে তীরে নামল এবং বলল যে তারা হচ্ছে রাজদূত রিচার্ড ও আর্তিথিরা, ইংলন্ডের রাজা এডওয়ার্ড তাদের পাঠিয়েছেন।"

রিচার্ড চ্যান্সেলর নিজেকে রাজা এডওয়ার্ডের দূত হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন। জার ইভান "বিদেশ থেকে বাণিজ্য করতে আসা রাজদূত রিচার্ডকে ও ইংরেজদের দেশের

অতিথিদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এবং আদেশ দিয়েছিলেন তারা যেন নির্বিঘ্নে চলতে পারে এবং অবাধে গৃহ ক্রয় ও নির্মাণ করতে পারে।" মস্কোতে ইংরেজ বণিকদের একটি গৃহ দেওয়া হলো।

তারপর থেকে প্রতি বছর বৃটিশ জাহাজ দ্ভিনা নদীর মুখে উপস্থিত হয়েছে।

রিচার্ড চ্যান্সেলর ও তাঁর জাহাজ 'গুড এণ্টারপ্রাইজ'-এর গতি কী হয়েছিল? রুশ কাহিনী থেকে আর কোনো খবর জানা যায়নি।

শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে আমাদের ভ্রমণের জন্যে আরো একবার আমাদের পথ-প্রদর্শক বদলাতে হবে। আমাদের হাতে একটি চিঠি এসেছে। চিঠিটি লিখেছেন ইংরেজ পুরুষ হেন্‌রি লেন তাঁর এক বন্ধুর কাছে। তিনি বলেছেন, চ্যান্সেলর আরো একবার মস্কোতে পাড়ি দিয়েছিলেন। ইংলণ্ডে ফিরে আসার সময়ে তিনি ইওসিফ নেপেইয়া নামে একজন রুশ দূতকে সঙ্গে আনছিলেন। স্কটল্যাণ্ডের উপকূলের কাছে শিলাস্তূপে ধাক্কা খেয়ে 'গুড এণ্টারপ্রাইজ' ধ্বংস হয়েছিল। চ্যান্সেলর নিহত হন, কিন্তু রুশ দূত কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে যান। রানী মেরি ও ইংরেজ বণিকরা তাঁকে ডেকে পাঠান। লণ্ডনে তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানানো হয়।

ওদিকে মুরমান্‌স্ক-এ, রুশ মঠ থেকে সামান্য দূরে, 'গুড ফেইথ' ও 'গুড এণ্টার-প্রাইজ' বরফে আটকে গিয়েছিল। ইংলণ্ড থেকে দলপতি সমেত নাবিকদের পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু দুটি শীত আটক থাকার ফলে জাহাজদুটিতে পচন ধরেছিল এবং স্বদেশে ফিরে আসার পথে ডুবে গিয়েছিল।

১০. বিরাট মানচিত্রের পুস্তক

রুশদের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল—একটি পশ্চিমের দিকে, অপরটি পূবের দিকে। সে-কালের প্রাচীন লোক-কাহিনীতে পূবের দেশ সাইবেরিয়ার কথা ছিল। "মহাস্তূপ ছাড়িয়ে, উরাল ছাড়িয়ে নয় জাতির বাস ছিল। সেখানে বাস করত দানবরা, তাদের মুখ মাথার চুড়োয়; বাস করত স্কন্ধকাটারা, তাদের চোখ বুকের ওপরে, তাদের মুখ দুই কাঁধের মাঝখানে; বাস করত লোমশ মানুষরা, তারা ছিল নরখাদক।"

এরা আমাদের পুরনো পরিচিত। এই দানবদের সঙ্গে কতবারই না আমাদের দেখা হয়েছে—হিরোডোটাসের ইতিহাসে, ম্যাসিডনের আলেকজাণ্ডারের গল্পে, অ-দেখা দেশ সম্পর্কে লেখা আরো অনেক পুস্তকে! কী অবিনশ্বরই জীবন অস্তিত্বহীন এই মানুষদের! পৃথিবীতে যখন তাদের ঠাঁই হয় না তারা চলে যায় মঙ্গলগ্রহে।

রূপকথা এক দুর্দমনীয় ব্যাপার। রূপকথা ভরাট করতে চেষ্টা করে ইতিহাসের যতো ছেদ, মানচিত্রের যতো ফাঁক। যেমন ধরা যাক মুস্কোভাইট অঞ্চলের এই মানচিত্রটি। এটি তৈরি করেছে বিদেশী পর্যটক, খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে। এর পশ্চিমের অর্ধাংশ সম্পূর্ণভাবে ভরাট হয়ে আছে শহর ও নদী ও হ্রদের নামে। এমন আর এতটুকু জায়গা নেই যেখনে শহর ও দুর্গ যা দিয়ে তৈরি সেইসব ছোট-ছোট গির্জা, ঘরবাড়ি ও গম্বুজ দেখানো যায়। মানচিত্রের পূর্বদিকের অর্ধাংশে এসব কিছুই নেই, তবুও সে-জায়গা যে খালি পড়ে আছে তাও নয়। ফাঁকা জায়গাগুলো ভরাট হয়ে আছে ছোট-ছোট ছবিতে আর শিরোনামায়। এগুলোতে যা উপস্থিত করা হয়েছে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রত্যেকটি শিরোনামাকে বসানো হয়েছে অভিনব চৌখুপির মধ্যে। আর প্রত্যেকটি শিরোনামাই এক-একটি ছোটখাটো রূপকথা।

যেমন, উরাল ছাড়িয়ে দেখানো হয়েছে ওব্ নদী। ওব্ ছাড়িয়ে দেখানো হয়েছে শিশু-কোলে একটি নারীর মূর্তি। শিরোনামায় বলা হয়েছে, "স্বর্ণজয়ী নারী—যুগোর ও ওবদোরদের উপাস্য। পুরোহিত তাকে জিজ্ঞেস করে পশুর দল ও পাল কোথায় নিয়ে যেতে হবে। উপাস্য মূর্তি (বলাটাও কী চমৎকার!) জবাব দেয় আর যেমনটি বলে ঠিক তেমনটিই ঘটে।"

কাজাকস্তানের স্তেপভূমিতে উপস্থিত করা হয়েছে ঘোড়সওয়ার, উট ও ভেড়া। শিরোনামায় বলা হয়েছে, "এই শিলাগুলো দেখে মনে হয় এরা যেন মানুষ, উট, ঘোড়া ও ভেড়া। একসময়ে এখানে ছিল একদল মানুষ, তারা পশুর পাল চরাত ও ঘোড়া ছোটাত। তারপরে হঠাৎ এক আশ্চর্য রূপান্তরণ ঘটে যায়। তারা শিলায় পরিণত হয়, অথচ তাদের পূর্বেকার আকার বজায় থাকে। এই আশ্চর্য ব্যাপারটি তিনশো বছর আগে ঘটেছিল।"

এমনি সব ছবি, এমনি সব কাহিনী। কিন্তু ওব্ নদীর পুবে একটিও নদী বা পর্বত বা শহর দেখানো হয়নি! সে-সময়ের ইওরোপীয়দের কাছে ওব্ নদীই ছিল বিশ্বের পুবদিকের সীমানা।

সীমান্তে পৌঁছতে হলে মাসের পর মাস অন্ধকার অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয় জলপথে জমাট-বাঁধা চওড়া নদীর ওপর দিয়ে। পথে, কামা নদীর কাছে, যাত্রীদের লড়াই করতে হয় ভল্গা তাতারদের সংগে। সাইবেরিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেছিল শত শত লোক, ফিরে এসেছিল মাত্র কয়েক ডজন।

কিন্তু তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি সাহসী, এবং ভাগ্যবান, তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল প্রচুর লুণ্ঠিত সামগ্রী। যেমন, নকুলের চামড়া, সিন্ধুঘোটকের দাঁত, কামা নদী ছাড়িয়ে আরও দূরের এলাকা থেকে রুপো এবং নক্‌শাকাটা অলংকার। অলংকার বলতে মীনা, পুঁতি, স্ফটিক, ইত্যাদি। এগুলো তৈরি করেছিল দূরের সেই উরগেন্‌জ রাজ্যে বোখারার কারিগররা। বোখারার বণিকরা সেগুলো নিয়ে আসত মধ্য-সাইবেরিয়ার আল্‌-তাই পর্বতে এবং পশুলোমের সংগে বিনিময় করত। তারপরে সাইবেরিয়ার শিকারীদের মাধ্যমে সেগুলো গিয়ে পড়ত মস্কোর অধিস্বামীদের হাতে। সাইবেরিয়ায় তারা আসত রাজকর আদায় করার জন্যে।

রুশরা পুবের দিকে ক্রমেই আরো বেশি বেশি দূরে চলে আসছিল। বণিক স্ট্রোগানভ কামা নদী ও তার শাখা-নদীগুলোর তীরে শহর গড়ে তুলেছিল। সেইসব শহরে বসতি করেছিল শিকারীরা। তারা লবণ উৎপাদন করত, জঙ্গল কাটত, অনাবাদী জমি চাষ করত। কসাকরা ছিল মুক্ত মানুষ, তারা বোয়ার ও জমিদারদের আওতা থেকে চলে এসেছিল এবং আশ্রয় নিয়েছিল জঙ্গলে ও প্রান্তরে। তারা স্ট্রোগানভের কাজে লেগে গেল।

কৃষকদের জীবন দিনের পর দিন আরো কণ্টকর হয়ে উঠছিল। তাদের কর দিতে হত জার ও জমিদার উভয়কেই। আর করও ক্রমেই বেড়ে চলছিল। জার চাইত আরো অর্থ—তার সৈন্যদের মজুদ রাখার জন্য ও আমলাদের পোষণ করার জন্য। অভিজাতরা জারের সেবা করত, সেজন্যে জার তাদের জায়গির দিতেন। মাঝে মাঝে এমন হতো যে জমিদারদের শোষণে তাদের কৃষকরা সর্বনাশের মুখে পড়ত। তখন জমিদাররা পুরনো জায়গির ছেড়ে দিয়ে নতুন জায়গির হাতে নিত।

বিদ্রোহ হলে জারের প্রহরীরা তার মোকাবিলা করত। বিদ্রোহী বোয়ারদের জমি বরবাদ করে দিত এবং একই সংগে কৃষকদের ওপরেও নজর দিত। তাদের জমি ঘোড়া দিয়ে

মাড়িয়ে তছনছ করে দিত। তাদের ঘরবাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দিত। রাষ্ট্রকে শক্তিশালী রাখতে হলে দাম দিতে হয় আর সেই দাম দিয়ে থাকে জনগণ।

কৃষকদের কুঁড়েঘরগুলোতে ধোঁয়া বেরোবার চিমনি থাকত না, ফলে কালিঝুলি মাখা হয়ে ছিল। সেখানে এমনকি আরশোলার জন্যেও এককণা খাদ্য থাকত না। কৃষকরা সেই-সব কুঁড়েঘর ছেড়ে পালিয়ে যেত। পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিত স্তেপভূমিতে ও জঙ্গলে, ডন ও উরাল নদীতে, ভল্‌গা ও কামা নদীতে—এবং স্বাধীন মানুষ হয়ে যেত।

জীবিকার জন্যে তারা শিকার করত, মাছ ধরত, রাহাজানি চালাত। লুটপাট করত তাতার উপজাতি বসতিতে ও রুশ যাত্রিদলে।

জারের প্রাদেশিক শাসনকর্তারা কসাকদের "দস্যুদলকে" কোনোরকম আশ্রয় দিত না। কিন্তু পরবর্তীকালে কসাকরা নিজেদের দেখে স্বীকার করেছিল এবং জারের সেবায় কাজে লেগেছিল। তারা তাতারদের আক্রমণ থেকে রুশরাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা করত। দলে দলে কসাক কামা নগরগুলো রক্ষা করেছিল এবং উরাল ছাড়িয়ে গিয়ে তাতার উপনিবেশ-গুলি আক্রমণ করেছিল। স্ত্রোগানভের লোকেরা পরিকল্পনা করেছিল যে ইরতিশ ও তোবোল নদীতীরে শহর গড়ে তুলবে। জার ইভান ঘোষণা করেছিলেন তিনি হচ্ছেন "সমগ্র সাইবেরিয়া জয়ী"।

সাইবেরিয়া কিন্তু তখনো পর্যন্ত রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়নি।

ইয়েরমাক-এর নাম আগে কি কেউ জানত? কিন্তু এখন সোভিয়েত ইউনিয়নে এমন লোক খুঁজে পাওয়া শক্ত যে ইয়েরমাকের নাম শোনেনি। মুষ্টিমেয় কসাক নিয়ে মাত্র কয়েকটি নৌকায় তিনি গিয়েছিলেন সাইবেরিয়া জয় করতে। কী সাহসী আর অক্লান্ত উদ্যমী ছিলেন তিনি!

ইয়েরমাকের ক্ষুদ্র বাহিনী স্তেপভূমির মহাসাগরে ছিল একটি বিন্দুর মতো। কিন্তু এই বিন্দুটিই মহাসাগরকে বশীভূত করেছিল। লড়াই করতে গিয়ে তাদের সামনে পড়ে-ছিল বিশাল বিস্তৃত জমি শুধু নয়, উপরন্তু সাইবেরিয়ার কঠোর প্রকৃতি, তার কোমর সমান উঁচু বরফ, তার তুষার ও তুষার-ঝঞ্ঝা। সবকিছুই কসাকদের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। তাছাড়া, তাতারদের বিশাল বাহিনী লড়াই করেছিল তাদের সঙ্গে। রুশদের সংখ্যা গোণা যেত হাজার দিয়ে, আর তাতারদের সংখ্যা অযুত দিয়ে। একথা ঠিক যে রুশদের হাতে ছিল আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। এই আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে তাতাররা বলত, "ওরা এসেছিল জ্বলন্ত ধনুক নিয়ে। সেটা আকাশ দিয়ে ছুটে আসার সময়ে বজ্রের মতো গর্জন করত। আমরা তীর দেখতে পেতাম না, কিন্তু সেটা আমাদের মারাত্মকভাবে জখম করত ও খুন করত। সেটা আমাদের ঢাল ও বর্ম ভেদ করত।"

আক্রমণকারী তাতারদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে চালাতে ইয়েরমাকের বাহিনী নদী-বরাবর এগিয়ে গিয়েছিল। ইয়েরমাকের শত্রুরা এমন সময়ে হাজির হতো যখন সেটা কেউ আশা করত না। কসাকরা তাই দিনে-রাতে কখনো বিশ্রাম নিতে সাহস পেত না। সে-সময়ে তাদের স্বদেশ বহু দূরে, প্রতিদিনই সেটা আরো দূরে সরে যাচ্ছিল।

ইয়েরমাক তার দলবলকে জড়ো করে তাদের উদ্দেশে বলেছিল, "কোথায় যাব আমরা? শরৎ এসে গিয়েছে। নদীগুলো জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। আমরা যেন এমন কিছু না করি যাতে আমাদের দুর্নাম হয়।...আমরা যদি ফিরে যাই সেটা হবে আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা, আমাদের কথার খেলাপ। কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যদি আমাদের সাহায্য

করেন তাহলে আমাদের স্মৃতি কখনো ম্লান হবে না আর এই সমস্ত দেশে আমরা লাভ করতে পারব চিরস্থায়ী গৌরব।"

কসাক বাহিনী স্থির করেছিল তারা সামনে এগিয়ে চলবে। অতএব রুশরা এগিয়ে গিয়েছিল এবং একটির পর একটি তাতার শহর দখল করে নিয়েছিল। প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল—রুশ ও তাতার, ওস্তিয়াক ও ভোগুল।

শেষপর্যন্ত কসাকরা সেই প্রধান দুর্গে পৌঁছেছিল যেখানে তাতাররা ইরতিশ নদীর উঁচু পাড়ের ওপরে নিজেদের ঘাঁটি তৈরি করেছিল। এখানেই ছিলেন স্বয়ং খান তাঁর পুরো সেনাদল নিয়ে।

রুশরা ইরতিশ নদী পার হয়ে গিয়েছিল, তাতার ঘাঁটিকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল। এই যুদ্ধে তারা শতাধিক লোক হারিয়েছিল এবং নতুন করে যুদ্ধ শুরু করার জন্যে তাদের হাতে ছিল আর মাত্র কয়েক-শো লোক। কিন্তু দুর্গ দখল করা হয়েছিল এবং খান পালিয়েছিলেন।

কসাকরা প্রচুর লুণ্ঠিত সামগ্রী পেয়ে গিয়েছিল—সোনা ও রুপো, মূল্যবান পাথর, আর হাজার-হাজার নকুলের চামড়া।

ইয়েরমাক হয়েছিলেন সাইবেরিয়ার প্রভু। কিন্তু তিনি ভুলে যাননি যে তিনি "শাসন-কর্তার ভৃত্য" মাত্র। অবিলম্বে তিনি তাঁর সাথী ইভান কোল্‌ৎজোকে মস্কো পাঠালেন নতুন সাইবেরিয়ার শাসনকর্তা জার ইভান ভাসেলিয়েভিচকে প্রণতি জানাবার জন্যে।

একটা প্রাচীন প্রবাদে বলা হয়েছে, "জগতটা গুজবে ভরা।" কোল্‌ৎজো মস্কো পৌঁছবার আগেই জারের কানে খবর পৌঁছে গেল যে ইয়েরমাকের "দস্যুদল" সাইবেরিয়ার প্রভু হয়ে বসেছে। এই লোকগুলো, যারা দাসত্বের বদলে মুক্ত কসাক জীবন বেছে নিয়েছে, তাদের বোয়াররা বলত চোর ও পকেটমার। আর ঠিক তখনই ইয়েরমাকের দূতরা এসে গিয়েছিল।

জার তাদের সহৃদয়তার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এবং নিজের কাঁধ থেকে ফারকোট নিয়ে তাদের সর্দারের কাছে পাঠিয়েছিলেন। উপরন্তু তিনি ইয়েরমাকের কাছে সাহায্য পাঠিয়েছিলেন।

সাহায্যের প্রয়োজন ছিল ইয়েরমাকের। তাতারদের সঙ্গে তাঁর কঠিন লড়াই চলছিল। তাতাররা অনবরত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল।

একদিন রাতে ইয়েরমাকের দলের লোকেরা যখন ইরতিশ নদীর পারে ঘুমোচ্ছিল তখন তাতাররা তাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দলটি ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং ইয়েরমাক একা হয়ে গিয়েছিলেন। নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর গায়ে ছিল ভারী বর্ম. বর্মের ওজনে তিনি তালিয়ে গিয়ে-ছিলেন এবং জলে ডুবে গিয়েছিলেন।

ইয়েরমাক মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পথ ধরে চলেছিল। তারা পথ করে নিয়েছিল টাইগা (মেরু-অঞ্চলের জঙ্গল—অ) ও অরণ্যের মধ্যে দিয়ে। নৌকো চালিয়েছিল অদ্ভুত অদ্ভুত নদীর ওপরে। কখনো কখনো এইসব নদী তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল একেবারে উত্তর মেরুর মহাসাগরের তীর পর্যন্ত। তাদের সহ্য করতে হয়েছিল শীতকালের ভয়ংকর তুষার-ঝড় আর গ্রীষ্মকালের গুমোট গরম। উৎপাটিত গাছের গুঁড়ি ও ঝোপঝাড়ে অরণ্যগুলো পরিকীর্ণ ছিল। তুষার জলাভূমি ও ভাসমান শৈল তাদের পথকে কষ্টকর করে তুলেছিল। কিন্তু তবুও তারা থামেনি, সমানে এগিয়ে গিয়েছিল উত্তর ও প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে।

য়াকুত, বুরিয়াত ও সাইবেরিয়ার অন্যান্য জাতিকে রুশ রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের মিলনের জন্যে চড়া দাম দিতে হয়েছিল। প্রদেশিক শাসনকর্তা, বণিক, ব্যবসায়ী সকলেই তাদের ওপরে শোষণ ও লুটপাট চালাত। তবুও কিন্তু বলা চলে, এই কণ্টকর পথ ছিল অগ্রসর হবার পথও। রুশদের চেয়ে বহু শতাব্দী পিছিয়ে ছিল সাইবেরিয়ার মানুষরা। উত্তরে শিকারীরা তখনো পর্যন্ত লোহা সম্পর্কে কিছু জানত না, তীরের ফলক তৈরি করত পাথর দিয়ে। রুশদের সঙ্গে যোগাযোগ হবার ফলে সাইবেরিয়ার মানুষ ইতিহাসের পথে আরো দ্রুত অগ্রসর হয়েছিল।

প্রকান্ড প্রকান্ড ফাঁকা জায়গা ছিল। সেখানে আশি মাইলের মধ্যে কোনো মানুষের বসতি ছিল না। সেগুলি যুক্ত হয়েছিল বসতিপূর্ণ জগতের সঙ্গে। এটি প্রকৃতই ছিল বিশাল এক ফাঁকা জায়গা—শুধু তৎকালীন মানচিত্রে নয়, পৃথিবীর ওপরেও। রুশরা এই ফাঁকা জায়গা ভরাট করার জন্য কাজে লেগেছিল—শহর নির্মাণ করেছিল, স্তেপভূমিতে চাষ করেছিল, টাইগার ভিতর দিয়ে রাস্তা বানিয়েছিল, নদীর ওপর দিয়ে পুল তৈরি করেছিল।...

মস্কোয় লিপিকরদের বসানো হয়েছিল একটি পুস্তকের নক্শা করার জন্য। পুস্তকটির নাম 'বিরাট মানচিত্রের পুস্তক'। এই পুস্তকে চিহ্নিত হয়েছিল সেইসব রাস্তা যেগুলি মস্কোর দিকে এসেছিল, এবং সেইসব রাস্তাও যেগুলি নতুন শহর তিউমেন ও তোবোল্স্ক-এর দিকে গিয়েছিল। বিশাল নদী ওব্ তখন আর বিশ্বের সীমানা ছিল না।

ক্রেমলিনে জারের একটি প্রকোষ্ঠে লিপিকররা রাশিয়ার একটি মানচিত্র এঁকেছিল। রুশদেশ বিস্তৃত ছিল উত্তর সাগর থেকে কাস্পিয়ান পর্যন্ত, আরল সাগর থেকে দ্নিয়েস্তার পর্যন্ত। যুবরাজ জারোভিচ তার হাতের কলম দিয়ে এই মানচিত্রের সীমানা-রেখার ওপরে দাগা দিয়েছিল, আর তার মন চলে গিয়েছিল উরাল ছাড়িয়ে, বিশাল ওব্ নদীর কাছে, সাইবেরিয়ার অরণ্যে ও স্তেপভূমিতে।...

এমনিভাবে মস্কো, লন্ডন, মাদ্রিদ ও লিস্বনের মানুষরা তাদের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছিল ভূ-গোলকের একটি মানচিত্র, সমগ্র গ্রহের একটি বিরাট মানচিত্র।

অষ্টম অধ্যায়

১. ইতিহাসের পাতা থেকে

গ্রীক ও পারসিক, রোমান ও কার্থাজিনিয়ান, বাইজানটাইন ও আরব, বাইজানটাইন ও রুশ, ভেনিশিয়ান ও তুর্কী—তারা সবাই সাগরে আধিপত্য লাভের সংগ্রামে সুযোগমতো লেগে থেকেছিল। জাহাজ খোয়া গিয়েছিল, সাগরের ঢেউ রক্তে লাল হয়েছিল। কিন্তু সাগর যদিও তাদের বিচ্ছিন্ন করেছিল, তা সত্ত্বেও তাদের মিলিতও করেছিল। উপকূলের শহরগুলিতে ভাষা ও রীতিনীতি ও ধর্ম মিশে গিয়েছিল। জাহাজগুলি বহন করে আনত শুধু দক্ষ কারিগরদের তৈরি সামগ্রী নয়, শিল্পদ্রব্যও। পণ্ডিতরা দেশ থেকে দেশে ঘুরে বেড়িয়ে বিভিন্ন জাতির অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করত এবং বহু সংস্কৃতি থেকে একটি সংস্কৃতি সৃষ্টি করত।

তারপরে এসেছিল সাগরের যুগের জায়গায় মহাসাগরের যুগ।

মহাসাগরের ঢেউয়ের ওপরে আধিপত্য কে করবে তার জন্য সংগ্রামটা অনেক দিনের। সেই সংগ্রাম ক্রমেই আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল। মাঝ-মহাসাগরে লড়াইয়ের সুযোগ উপস্থিত হলে যে জাহাজগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ত, সেই জাহাজগুলিই আবার দেশে দেশে বহন করে নিয়ে যেত মানুষ, জীবজন্তু, রীতিনীতি, গাছ, ধাতু ও বিদেশী শব্দ।

ইওরোপের খেতগুলিতে বহুকাল ধরে চাষ চলছিল একমাত্র দানাশস্যের, এখন পাশা-পাশি জন্মাতে শুরু করেছিল আমেরিকান অতিথি আলু। ইওরোপের ভাষাগুলিতে দেখা দিয়েছিল নতুন নতুন ইন্ডিয়ান শব্দ—যথা, 'কোকো', 'তামাক', 'ভুটা'।

প্যারিসের কাফেগুলিকে পরিবেশন করা হচ্ছিল গোলমরিচের সুগন্ধ দেওয়া মেক্সিকোর চকোলেট। লোকে এই চকোলেট পান করত খুবই সাবধানে। তাদের ভয় ছিল এই পানীয় তাদের ভিতরটাকে পুড়িয়ে দিতে পারে।

ইওরোপের ঘোড়া দলে দলে চরে বেড়াত আমেরিকার জমিতে। মাত্র কিছুকাল আগেও ইন্ডিয়ানরা ভাবত ঘোড়া হচ্ছে অজানা একধরনের দানব। হাজার-হাজার সাহসী যোদ্ধা দুই-মাথাওলা দানব দেখে ভয়ে পালিয়ে যেত। ঘোড়ার পিঠে মানুষ থাকলে তারা দেখত দুই-মাথাওলা দানব। আর যখন সেই দানব দু-ভাগে ভাগ হয়ে যেত—অর্থাৎ, আরোহী ঘোড়া থেকে নামত—তারা আরো বেশি ভয় পেয়ে যেত।

প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়ায় যেমন দেখা গিয়েছিল তেমনি দেখা যাচ্ছিল আমেরিকার উপকূলবর্তী শহরগুলোতে—নানা বর্ণের চামড়ার মানুষ, নানা ভাষা।

মানুষের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল।...

ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলোতে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

এই হচ্ছে একদল আদিম শিকারী। তারা নদীতে যাচ্ছে পাথরের ছুরি ও বর্শার উপকরণের জন্যে।

বহু হাজার বছর পরে এই নদী দিয়ে নৌকো চলবে। লোকে তাদের অলঙ্কার-করা পাত্র ও ঘট নিয়ে যাবে অন্য দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় করার জন্যে। এই কুমোররা ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছে এই জগতে তারা একা নয়।

আরও পৃষ্ঠা ওল্‌টানো যাক।

সমুদ্রের উপকূলে একটি নগর গড়ে ওঠে। বন্দরে এসে জাহাজ নোঙর করে। জাহাজগুলো এসেছে অন্যান্য নগর থেকে, অন্যান্য দেশ থেকে। এখন এই সমস্ত ভিন্ন-ভিন্ন উপজাতিকে মিলিত করছে নদী নয়, সমুদ্র। কিন্তু এই সমুদ্র তাদের পৃথকও করছে। সমুদ্রের পথ নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে নগরগুলো নিজেদের মধ্যে লড়াই চালায়।

ইতিহাসের এই সমস্ত পৃষ্ঠার মধ্যে ক'টিতে পাওয়া যায় লড়াই ও আবিষ্কার এবং জয় ও পরাজয় সম্পর্কে খবর!

পরিশেষে কলম্বাসের নৌবহর আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হয়। রুশ বাহিনী স্থল-পথে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে এগিয়ে চলে।

আরো কয়েকটি শতাব্দী পার হয়। মানুষ এখন নিজেদের আকাশে তুলতে পারে। বিমান যুগ শুরু হয়েছে। আর এখন হিংস্র যুদ্ধ চালানো হচ্ছে যেমন আকাশে তেমনি স্থলে ও সমুদ্রে। এইসব যুদ্ধের কাছে পুরনো কালের যুদ্ধকে অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। অন্য দিকে, একথাও ঠিক যে বায়ুসমুদ্র বিভিন্ন জাতিকে যেমনভাবে মিলিত করতে পারে তেমনিভাবে কি পারে কোনো নদী, কোনো সাগর, কোনো মহাসাগর। বায়ুসমুদ্রের তীর সর্বত্র রয়েছে। প্রত্যেকটি নগর হয়ে উঠতে পারে বন্দর।

কিন্তু আমরা নিজেদের ছাড়িয়ে যাচ্ছি। আমাদের সামনে যে পৃষ্ঠাগুলো রয়েছে সেখানে বিমানের আবির্ভাব এখনো ঘটেনি। এমনকি আমরা রেল-ইঞ্জিন থেকেও দূরে রয়েছি। লোকে এখনো ভ্রমণ করছে স্থলে ঘোড়ার পিঠে, সমুদ্রে পালতোলা জলযানে।

২. জগতকে চেনা শক্ত

সেই পুরনো মন্থর জীবন—যখন মানুষ বাস করত নিজেদের জায়গিরে ও নিজেদের গ্রামে, যখন মানুষ জানত না অন্য কোথায় কী ঘটছে——কী হলো সেই জীবনের?

মানুষ এখন আর একজায়গায় থাকে না। রাজপথ দিয়ে মালবোঝাই গাড়ি চলে, রাস্তার খানাগর্ত পার হবার সময়ে সেই গাড়ি প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খায়। একই সংগে দেখা যায় ছয় ঘোড়ায় টানা কোচগাড়ি। রাস্তার অবস্থা এখনো খারাপ। ছয়টি ঘোড়া যে জোতা হয়েছে সেটা বিলাস করার জন্যে নয়, প্রয়োজন পূরণের জন্যে। একটা ভারী গাড়ি গভীর কাদায় পড়লে তাকে তোলার জন্যে সবচেয়ে কাছের গ্রাম থেকে ঘোড়া নিয়ে আসতে হয়।

ঘোড়াগুলো সকলেই—জমিদারের জই-খাওয়া পালের ঘোড়া। খাওয়া থেকে শুরু করে কৃষকের খড়-খাওয়া ও কাজে-লেগে-থাকা টাট্টুঘোড়া পর্যন্ত—তাদের শরীরের সমস্ত জোর লাগিয়ে বিশাল চাকাটাকে চটচটে কাদা থেকে টেনে তোলে। এখানে-ওখানে ভালো রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। ঘোড়সওয়াররা এখন একটু গা এলিয়ে দিতে পারে, কোচম্যান গাড়ির ঝাঁকুনিতে পড়ে যাবার ভয় না করেই একটু ঝিমিয়ে নিতে পারে।

কারও যদি তাড়া থাকে তাহলে সে ঘোড়ার পিঠে চেপে যায়। বণিকরা যায় শান্ত কদমের ঘোড়ার পিঠে, তাদের সামগ্রীর কিছু কিছু নমুনা সঙ্গে নিয়ে। বিশ্বের প্রথম

ডাক-হরকরা চিঠি ও পার্সেল নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে। ডাকের চিঠি এখন আর বিরল ব্যাপার নয়। ডাক-হরকরা কিংবা ডাক-বিলির সম্মানজনক কাজ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে এমন কোনো কোচম্যান এসে যদি দরজায় টোকা দেয় তাহলে লোকে এখন আর ভয় পায় না। বণিকরা চিঠি থেকে অন্যান্য নগরের দাম জানতে পারে এবং সেখানে কী ঘটছে তা বুঝতে পারে।

একসময়ে মানুষ বাস করত বিশ্বের কোথায় কী ঘটছে কিছুমাত্র না জেনে। কিন্তু এখন এমনকি ছোট ছোট শহরেও লোকে আলোচনা করে স্পেনের রাজা কেন বন্দরের সমস্ত ওলন্দাজ জাহাজকে আটক করার হুকুম দিয়েছে এবং তার ফলে লবঙ্গের দাম বাড়বে কিনা।

খবর পাওয়া যায় যেমন চিঠি থেকে তেমনি চটিতে আশ্রয় নেওয়া যাত্রীদের কাছ থেকে।

চটি চেনাটা খুবই সহজ। উঠোনে দেখা যায় ক্লান্ত ঘর্মাক্ত ঘোড়াগুলোর লাগাম খুলে দেওয়া হয়েছে আর তাজা ও দানাপানি দেওয়া ঘোড়াগুলোর লাগাম পরানো হয়েছে।

হাট করে খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসে হাসির শব্দ ও বোতলের টুং-টাং। নাকে আসে ঝলসানো মাংসের উষ্ণ সুবাস। সেই গন্ধ শুঁকলে এমনকি ভরাপেট মানুষেরও খেতে ইচ্ছে করে। হলঘরে ধুলোমাখা সওয়ারী বুটজুতো পরা একদল মানুষ অগ্নি-কুণ্ডের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে। রাস্তার ধারে একটি খুঁটি থেকে ঝোলে গিল্‌টি-করা সিংহ বা সাদা ঘোড়া বসানো বর্ম। লিখতে পড়তে না জানলেও এ-ধরনের একটি চিহ্ন বুঝে নিতে কারও কোনো অসুবিধা হয় না।

এমনি চিহ্ন শহরে ক্রমেই বেশি বেশি সংখ্যায় দেখা যায়। নাপিতের চকচকে ঢালের পাশেই ঝোলে রুটিওলার সোনালী বাদামী ঝালর। দোকানের আবির্ভাব এই প্রথম। সেখানে বিক্রি হয় সমস্ত রকমের জিনিস—কাঁটা, সার্ডিন, মোজা ও পেরেক।

পাইকারি ব্যবসাদার ধনী বণিকরা ছোট দোকানদারদের অবজ্ঞার চোখে দেখে। তাদের হাতে আসে হাজার হাজার মার্ক, পাউন্ড ও রুবল। লিপিকররা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দপ্তরে ব্যস্ত থাকে আর মোটা মোটা হিসাবের খাতা লেখে। বণিকরা যে-ধরনের ছোট-ছোট নোটবই রাখত তা থেকে এইসব ভারী খাতা ও বই একেবারেই ভিন্ন ধরনের।

আগেকার দিনে একজন বৃদ্ধ বণিক তার নোটবইয়ে লিখত, "এক বস্তা দস্তানা, তার কত দাম আমার মনে নেই। দুই টুকরো লাল কাপড় বিক্রি করেছি, কার কাছে মনে নেই।...পোশাক তৈরি করার জন্য আমার গিন্নীকে এতটা গেণ্ট ভেলভেট দিয়েছি।"

অন্য এক সময়ে বৃদ্ধ তার নোটবইয়ে কোনো কিছু লিখে রাখত না। মনে রাখার জন্যে রুমালে একটা গিঁট দিত মাত্র। সে-সময়ে সবাই যে কলম ধরে লিখতে পারত, তা নয়। কিন্তু এখন, যে-লোক লিখতে পড়তে জানে না তার পক্ষে বণিক হওয়াটাই অসম্ভব। যেখানে লেনদেন ও বিকিকিনি চলে ভারত অথবা আমেরিকা থেকে আনা নৌবহর-বোঝাই মাল নিয়ে, সেখানে কি আর মনে-মনে হিসাব রেখে কারবার করা যায়? হাজারটা রুমালে গিঁট লাগিয়েও কূল পাওয়া সম্ভব নয়।

বইয়ের দাম এখন আরো সস্তা। এখন আর লিপিকরকে একবারে একটি বই কপি করতে হয় না। গুটেনবার্গ আবিষ্কৃত আলগা টাইপের সাহায্যে এখন শত-শত বই একবারে ছাপিয়ে নেওয়া যায়।

চামড়ার কাগজকে এখন মনে হয় সেকেলে। তার জায়গা নিয়েছে কাগজ-কলে তৈরি কাগজ। এই কাগজ টেকসই নয়, কিন্তু সস্তা।

বইয়ের দোকানের দরজায় বইয়ের নামপত্রগুলি সাজানো থাকে। প্রত্যেকটি বইয়ের নাম অতি দীর্ঘ। এই নাম থেকে ক্রেতা স্পষ্ট বুঝতে পারে বইটি কি বিষয়ে লেখা হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় গ্রীক ও রোমান লেখকদের রচনাবলী, বিদেশের কাহিনী এবং প্রাচীন মধ্যযুগীয় ব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করে লেখা বই। লোকে যখন রাবেলের (ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী ব্যঙ্গকৌতুক লেখক—অ) বইয়ে পড়ে কেমনভাবে পান্তাগ্রুয়েল সসেজের সঙ্গে লড়াই করেছিল, কিংবা কেমনভাবে গারগান্তুয়া পাঁচবছর বয়সে ছোট একটা কাঠের ঘোড়ায় চেপে ক্রীড়াযুদ্ধে যোগ দিতে গিয়েছিল, তখন না হেসে থাকতে পারে না।

এই বইগুলিতে সবাইকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হয়েছে। বাদ পড়েনি কেউ—না নাইটরা, না সাধুরা, না বিদ্যাদিগ্গজরা। নাইটরা তো করে শুধু পানাহার ও লড়াই। সাধুরা উপদেশ দেবার সময়ে উপবাস করার কথা বলে, কিন্তু নিজেরা সারাটা দিন কাটায় গির্জায় নয়—রসুইঘরে। বিদ্যাদিগ্গজরা গোপন সংকেতে নিজেদের চিন্তা প্রকাশ করার কলাকৌশলে প্রতিযোগিতা করে, কিন্তু সেই সংকেত তারা নিজেরাই বোঝে না।

'অখ্যাত মানুষদের চিঠি' পুস্তকটি যেমন ক্ষতিকর তেমনি আনন্দদায়ক। চিঠিগুলি লেখা হয়েছে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ ওর্টভিন গ্রাটিউসের উদ্দেশে। সবাই বলেছে, যা-কিছু নতুন তারই শত্রু তিনি। তাঁর উদ্দেশে লেখা এই চিঠিগুলিতে তাঁর বন্ধুরা নিজেদের ভোঁতা বুদ্ধি ও অজ্ঞতার এমন খোলাখুলি প্রশংসা করেছে যে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সেগুলি লেখা হয়েছে ওর্টভিনকে নিয়ে মজা করার জন্যে। ব্যাপারটা যে তাই সেটা স্পষ্ট বোঝা যায় বইটির শেষাংশ পড়ার সময়ে। কেননা, ওর্টভিনের কাছে শেষ চিঠিটি লিখেছে তাঁর এক মৃত বন্ধু সরাসরি স্বর্গ থেকে। এই মৃত ব্যক্তি কোনো সংকোচ না করে খোলাখুলি ওর্টভিন গ্রাটিউস ও তাঁর বন্ধুদের বলেছে পণ্ডিত গর্দভ।

গর্দভ না হলে একথা বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না যে বইটি লিখেছে বন্ধুরা নয়, অজ্ঞ মানুষদের শত্রুরা। অজ্ঞ মানুষরা তো ক্ষেপে লাল। তারা দাবি করল এই ধরনের পুস্তক এই মুহূর্তে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলা হোক। এবং প্রায়ই তারা এ-কাজে সফলও হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণ থেকে বেরিয়ে আসত ডক্টর, মাস্টার ও ছাত্রদের মিছিল। মিছিলের আগে আগে থাকত একজন ভেরীবাদক। সে প্রাণপণে ভেরী বাজিয়ে চলত। চারদিক থেকে লোক ছুটে আসত বই পোড়ানোর দৃশ্য দেখার জন্যে।

কিন্তু বই ছাপানো হতো হাজারে হাজারে। সমস্ত বই পুড়িয়ে ফেলাটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। লোকে সেইসব বই বাড়িতে লুকিয়ে রাখত এবং গোপনে একে অপরের কাছে চালাচালি করত।

মানুষ আবার নতুনভাবে চিন্তা করতে শিখল—তাদের পূর্বপুরুষরা যে-ভাবে চিন্তা করত তা থেকে ভিন্ন ভাবে, ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞরা যে-ভাবে চিন্তা করতে শেখাত তা থেকে ভিন্ন ভাবে। বিশ্ব হয়ে উঠল এক নতুন বিশ্ব। পুরনো লেখার সঙ্গে মানুষ যা নিজের চোখে দেখছিল তা মিল ছিল না। তাই বলে পুরনো লেখা বিনা লড়াইয়ে মঞ্চ ছেড়ে চলে যাবে তাও নয়।

নবম অধ্যায়

১. একটি পুস্তকের বিবরণ

আমাদের এই সত্য কাহিনীতে নায়কের নাম প্রায় প্রতি অধ্যায়ে বদলে গিয়েছে। আর এই নায়কের সঙ্গেই আমরা গিয়েছি নগর থেকে নগরে, দেশ থেকে দেশে।

এবারে কে আমাদের নায়ক হবে?

বাল্‌টিক সাগরের কুয়াশাবৃত তীরের দিকে যে পথটি গিয়েছে সেই পথ ধরে চলা যাক। উপসাগরের ধারে অঞ্চলটি সমতল, তীরে বালিয়াড়ি থাকার জন্যে সমুদ্রের গ্রাস থেকে সেটি রক্ষা পেয়েছে। এই অঞ্চলেই পোল্যান্ডের ছোট শহর ফ্রাউয়েনবার্গ। শহরটির দিকেই তাকানো যাক। শহরে রয়েছে বহুতল বাড়ি, অংশে অংশে নির্মিত। প্রত্যেকটি অংশের ছাদ চুড়োর মতো, টালি দিয়ে ঢাকা। বাড়িগুলোর জটলা পাহাড়ের ওপরে যে দুর্গ রয়েছে তার চারদিকে। এমনভাবে ঘিরে রয়েছে যে মনে হয় বাড়িগুলো যেন দুর্গের কাছে আশ্রয় পেতে চাইছে। দুর্গের চারদিকে চওড়া শক্ত প্রাচীর। কোণে কোণে—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম মুখে—উঁচু উঁচু গম্বুজে প্রহরী ঘাঁটি। টিউটনিক যোদ্ধারা প্রায়ই এই দুর্গ আক্রমণ করেছে। তারা সমস্ত গ্রামাঞ্চল পুড়িয়ে দিয়েছে, বাগান ছারখার করেছে, শস্যভরা ক্ষেতকে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। কিন্তু আসল দুর্গটিকে কখনো দখল করতে পারেনি।

এটা কি প্রকৃতই একটা দুর্গ? একটা গির্জার চুড়ো চোখে পড়ে যেটি প্রাচীর ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছে। উপাসনার সময়ে বহু-থাকের ঘণ্টাঘর থেকে ঘণ্টার ধাতব ধ্বনি ঝংকৃত হয়। মাথায় ফারের কিনার দেওয়া উঁচু টুপি, পরনে চওড়া আস্তিনওলা লম্বা আলখাল্লা—এমনি সব মানুষ সাদা দেয়ালের পিছনে ছায়া-ছায়া বাগানের পথে পায়চারি করে। একনজর তাকিয়েই বোঝা যায়, যারা এখানে বাস করে তারা জাগতিক মানুষ নয়, আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ।

তবে কি এটা একটা ধর্মীয় মঠ?

না। যাজকের জুব্বা পরা এইসব মানুষ যে জীবন যাপন করে তা আদৌ ধর্মীয় মঠের জীবন নয়। উপাসনা-চালনার পালা যখন আসে তখন এদের মধ্যে অনেকেই ধর্মযাজক ভাড়া করে কাজ চালিয়ে নেয়। তাদের অবস্থা স্বচ্ছল, আয় আসে তাদের বিরাট ভূমি-সম্পদ থেকে এবং শহরে ও গ্রামে সংগৃহীত কর ও শুল্ক থেকে। তারা যোদ্ধা নয়, ধর্মযাজক। তাদের প্রধান হচ্ছেন বিশপ, যিনি কোনো পার্থিব শাসককে মানেন না। যাজকের জোব্বা পরা এইসব মানুষ তাঁর রায়ত, তাঁর দরবার ও যাজক-সভার সদস্য।

কিন্তু আমরা যে ইওরোপের অন্য সমস্ত শহর ছেড়ে এই ফ্রাউয়েনবার্গে এসেছি তা এই অলস পরিতৃপ্ত মানুষগুলোর জন্যে নয়। নিষ্কর্মা মক্ষিকাদের এই চাকে কয়েকজন কর্মী মৌমাছিও আছে।

মধ্যরাত্রি পার হয়ে যাবার অনেক পরেও গম্বুজের উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে একটা উঁচুদিকের জানলায় তখনো বাতি জ্বলে। আকাশ যদি নির্মেঘ হয় তাহলে গম্বুজের একটি দরজা খুলে যায় এবং একজন বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে গম্বুজের চওড়া দেয়ালের ওপরে দাঁড়ান। তাঁর এক হাতে একটা লণ্ঠন, অন্য হাতে অদ্ভুত একটা যন্ত্র—অনেকটা রুলার দিয়ে তৈরি ত্রিভুজের মতো। বৃদ্ধ প্রথমে তাঁর হাতের লণ্ঠন মাটিতে রাখেন, তারপরে তাঁর যন্ত্রটি একটি স্ট্যান্ডের ওপরে স্থাপন করেন এবং আলসেয় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশটাকে ভালো করে দেখেন। আকাশের তারাগুলিকে পুরনো বন্ধুর মতো অভিনন্দন জানান, আর জবাবে আকাশের তারাগুলিও যেন বলে ওঠে, "শুভ সন্ধ্যা"।

বৃদ্ধ তাঁর যন্ত্র তুলে ধরেন। একটি রুলারকে তিনি কাজে লাগান ছোট দূরবীন হিসেবে। রুলারের সঙ্গে লাগানো রয়েছে দুটি ছোট কাঠের টুকরো, দুটি টুকরোর মধ্যেই ফুটো করা রয়েছে। যন্ত্রটিকে যদি কোনো তারার ওপরে নিবদ্ধ করতে হয় তাহলে সেটিকে এমনভাবে স্থাপন করা দরকার যেন তারাটি দুটি ফুটোর মধ্যে দিয়ে দেখা চলে। রুলারটিকে তিনি তার অক্ষের চারদিকে ঘোরাতে থাকেন এবং ঝিকিমিকি তারাগুলোর মাঝখানে একফোঁটা লাল মদের মতো দীপ্যমান একটি স্থির লাল বিন্দুর ওপরে নিবদ্ধ করেন। এই বিন্দুটি হচ্ছে মঙ্গলগ্রহ। তারপরে বৃদ্ধ তাঁর লণ্ঠনটি যন্ত্রের কাছে তোলেন এবং রুলারের ওপরে কালি দিয়ে আঁকা ছোট ছোট দাগগুলো গণনা করেন। এ থেকেই গ্রহটির উচ্চতা নির্ধারিত হয়ে যায়।

বৃদ্ধ খুবই খুশি যে আজকের রাতটি এমন চমৎকার ও পরিষ্কার। এমনটি এই উত্তরাঞ্চলে বড়ো একটা দেখা যায় না। তাঁর মনে পড়ে, সেই যৌবনকালে যখন তিনি সবেমাত্র জ্যোতির্বিদ্যা জানতে শুরু করেছিলেন তখন ইতালিতেও এমনি আকাশ দেখেছিলেন। মনে পড়ে যায় তাঁর প্রথম শিক্ষক জ্যোতিষী দোমেনিকো নোভারার কথা।

এই অধ্যাপককে শক্ত শক্ত কাজ করতে হতো। তিনি পঞ্জিকা ও ঠিকুজি লিখতেন, গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, সুদিন ও দুর্দিন নিরূপণ করতেন। খুব একটা উৎসাহ নিয়ে তিনি যে এসব কাজ করতেন তা নয়। করতেন শুধুমাত্র জীবিকার জন্যে। কেননা, আকাশের তারা যদি দেখতে হয় তাহলে তাঁকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

বৃদ্ধ তাঁর জোব্বার ঝুলের দিকটা নিজের শরীরের চারদিকে শক্তভাবে পেঁচিয়ে নিলেন, তারপরে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। সেখানে তাঁর টেবিলের ওপরে ছিল বিশাল মোটা পাণ্ডুলিপি। এই পুস্তকটি তাঁর সন্তান, তাঁর প্রিয়—মায়ের কাছে শিশুর মতো। আসলে এই "শিশুটির" বয়স কিন্তু তিরিশ বছরেরও বেশি।

রোমান কবি হোরেস-এর উপদেশ বৃদ্ধ মনে রেখেছিলেন—"প্রকাশ করতে হয় নবম বছরে।" কিন্তু তাঁর বেলায় নয়বছরের প্রায় চারগুণ সময় পার হয়ে গিয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি এখনো পড়ে আছে লেখকের টেবিলের ওপরে।

বৃদ্ধ পাণ্ডুলিপির বড়ো পৃষ্ঠাগুলো উলটিয়ে গেলেন। পুস্তকের নামপত্রে লাতিন-ভাষায় লেখা রয়েছে: 'তুরিন-এর নিকোলাস কোপারনিকাস। জ্যোতিষ্কদের আবর্তন সম্পর্কিত ছয়টি পুস্তক'।

আরো একবার—এই নিয়ে কতবারই না হলো—তিনি পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে দেখে গেলেন। প্রথম পুস্তকের বিষয় পৃথিবীর আকার। পৃথিবী যে একটা গোলক এই কথাটা লোকের মাথায় ঢোকাতে কী বেগই না পেতে হয়! কোপারনিকাসের মনে পড়ল দার্শনিক লাক্‌টান্‌টিয়াস-এর কথা, যিনি বলেছিলেন, "একমাত্র বিকৃতমস্তিষ্ক মানুষই বিশ্বাস করতে পারে যে পৃথিবীর অন্যদিকে ঘাস ও গাছ জন্মায় আকাশে শেকড় চালিয়ে

আর মানুষের পা থাকে মাথার চেয়েও উঁচুতে।" এই রোমান অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ, এই বাগ্মিতার শিক্ষক—যিনি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন—বিজ্ঞানের বিষয়ে কিছুই ভাবতেন না। কিন্তু এই অজ্ঞতা সত্ত্বেও তাঁর চেয়ে বিদ্বান ব্যক্তিদের নিয়ে উপহাস করা থেকে তিনি বিরত হননি! তবুও, তাঁর এই ছেলেমানুষী যুক্তির জন্যে উপহাসের পাত্র হয়েছিলেন তিনি নিজেই।

কোপারনিকাস বিষণ্নভাবে ভাবলেন, "কতগুলি শতাব্দী তো পার হয়ে গেল, কিন্তু এখনো ল্যাক্টানটিয়াসের ঠিকমতো বিচার হলো না! যারা বুঝতে চায় না তাদের কখনো বোঝানো যায় না। পণ্ডিত গর্দভরা যখন এই বইটি পড়বে, কী বলবে তারা! তারা তো নিঃসন্দেহ যে পৃথিবী অনড়। হঠাৎ এই বইটিতে তারা এই চিত্রটি দেখবে যেখানে বিশ্বের কেন্দ্রে সিংহাসনটি দখল করে আছে পৃথিবী নয়—সূর্য। রাজার মতোই সূর্য গ্রহ-পরিবারকে শাসন করে। আর পৃথিবী হচ্ছে ছয়টি গ্রহের মধ্যে একটি মাত্র। পৃথিবীর চলন পূর্ব-নির্ধারিত একটি পথে—আর সেই পথটি রয়েছে শুক্রগ্রহ ও মঙ্গলগ্রহের মধ্যে।"

শত্রুদের কথা ভুলে গেলেন কোপারনিকাস। সস্নেহে পরীক্ষা করতে লাগলেন তাঁর সৃষ্টি, তাঁর তৈরি আকাশের চিত্র। এই হচ্ছে সঠিক বিন্যাস—আরিস্টটল ও টলেমির সময় থেকে যে-বিন্যাস সবাই মেনে এসেছে সেটা ঠিক নয়। কোপারনিকাসের চিত্র গ্রহদের গতি ব্যাখ্যা করার জন্য অজস্র বৃত্ত আঁকার প্রয়োজন নেই। যার সামান্যতম গণিতের জ্ঞান আছে সে-ই এই চিত্রের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারবে, কেন—দৃষ্টান্ত হিসেবে মঙ্গল-গ্রহকেই ধরা যাক—কেন মঙ্গলগ্রহকে কখনো ছোট দেখায়, কখনো বড়ো। সেটা এই কারণে যে মঙ্গলগ্রহ কখনো পৃথিবী থেকে দূরে চলে যায়, কখনো পৃথিবীর কাছে চলে আসে।

চিত্রটিতে কী চমৎকার সামঞ্জস্য ঘটেছে, কী সুশৃঙ্খল সম্পর্ক। এমনটি অন্য কোথাও দেখা যায় না। এই চিত্র সমস্ত অসঙ্গতি নিমেষে দূর করেছে, যে-সব মত-বিরোধ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বিভ্রান্ত করত সেগুলির মীমাংসা করেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তো এমনকি বৎসরের দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারেননি। একটি স্থায়ী পঞ্জিকা তৈরি করতে পারেননি। জ্যোতিষ্কের চলন হিসাব করার সময়ে তাঁরা ব্যবহার করেছেন বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা। অনেকটা এই রকম—যেন একজন শিল্পী কোনো ছবি থেকে হাত নিচ্ছে, কোনো ছবি থেকে পা, কোনো ছবি থেকে মাথা, আর সব মিলিয়ে সৃষ্টি করছে একটা দানব। নাবিকদের অভিযোগ যথার্থ ছিল যখন তারা বলত যে জ্যোতিষ্ক চিত্রগুলি তাদের কোনো সাহায্যই করে না, বরং সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায়।

এই অবস্থার অবসান ঘটানোর সময় হয়েছে!

কোপারনিকাস তাঁর পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাগুলো উল্টিয়ে যেতে লাগলেন—যেন তিনি তাঁর জীবনের পৃষ্ঠাগুলো উল্টিয়ে যাচ্ছেন। পাণ্ডুলিপির শান্ত ও চৌরস লাইনগুলোর মধ্যে কতই-না আশঙ্কা ও সন্দেহ নিহিত হয়ে রয়েছে। কতই-না বিনিদ্র রাত্রি! কতই-না কণ্টকর এই ব্যাপারটা—অন্য সবাই যা বিশ্বাস করে তার বিরুদ্ধে একা দাঁড়ানো!

যদিও পুস্তকটি এখনো প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে গুজব ছড়িয়েছে। শত্রুরা দাবি করছে, এই সাহসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী—যিনি পৃথিবীকে সচল ও সূর্যকে অনড় করেছেন—তাঁর বিরুদ্ধে সরকার দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। তাঁর শত্রুরা এ-ব্যাপারে ধর্মশাস্ত্রকে সাক্ষী মানলেন, যে-ধর্মশাস্ত্রে যোশুয়া স্থির হয়ে থাকার জন্য আদেশ দিচ্ছেন পৃথিবীকে নয়—সূর্যকে। পুস্তকটি প্রকাশিত হোক—তার জন্যে তাঁরা অপেক্ষা করছেন। তারপরেই দাবি তুলবেন পুস্তকটিকে নিন্দা করা হোক।

না! তার চেয়ে বরং ভালো দিনের অপেক্ষায় পুস্তকটি এই টেবিলের ওপরেই আরো

কিছুকাল থাকুক! এখনো এই পুস্তকের বন্ধু আছে—যদিও সংখ্যায় খুব বেশি নয়। তাঁরা সবাই আলোকপ্রাপ্ত মানুষ।

কোপারনিকাসের আবার মনে পড়ল তরুণ বয়সে ইতালিতে থাকার দিনগুলির কথা। মনে পড়ল ইতালীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনার কথা। তাঁরা সেইসব বিষয়ে আলোচনা করতেন যে-সব বিষয়ে আলোচনা করা গির্জার হুকুমে নিষিদ্ধ ছিল। সেইসব বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতেন যে-সব বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা গির্জার হুকুমে নিষিদ্ধ ছিল। তাঁরা যা ভাবতেন তার সবটাই লিখতেন না। যা লিখতেন তার সবটাই ছাপাতেন না। কোনো আলোচনা শুরু করার আগে তাঁরা শক্তভাবে দরজা-জানলা বন্ধ করে দিত যাতে আড়ি পেতে কেউ কিছু শুনতে না পারে। কেননা, ইনকুয়িজিটরদের (ধর্মবিরুদ্ধ মত অবলম্বনের অপরাধে দণ্ড দেবার জন্য বিচারালয়ের বিচারকরা—অ) কান বড়ো সজাগ ছিল।

তবুও একথা ঠিক যে নতুন ভাবধারা নিষ্ফল হয়নি! এমনকি এই পুস্তকটিও হয়তো কোনোকালেই লেখা হতো না যদি-না সেই সমস্ত আলোচনা হতো!

কোপারনিকাস পুস্তকটি বন্ধ করে দিলেন, তারপরে মোমবাতি হাতে নিয়ে চলে গেলেন নিজের ছোট শোবার ঘরে। সেখানে তাঁর বিছানাটি সরু, বিছানার ওপরে বইয়ের তাকে ঠাসা হয়ে রয়েছে চামড়ায় বাঁধানো সারি সারি বই—তাঁর প্রিয় দার্শনিক ও কবিদের রচনা। তিনি ভার্জিলের রচনার একটি খণ্ড নামিয়ে নিলেন, নিজের বিক্ষুব্ধ মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে এবং বিদ্রোহী আত্মাকে প্রশমিত করার জন্যে ভার্জিলের শান্ত কাব্যে মনোনিবেশ করলেন।

২. পুস্তকটির পক্ষে বন্ধুলাভ

বছরের পর বছর পার হয়ে গেল। পৃথিবী একটির পর একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করে চলল—যদিও পৃথিবীর খুব অল্প লোকই এ-বিষয়ে সচেতন ছিল।

পাণ্ডুলিপিটা তখনো টেবিলের ওপরেই ছিল—আরো ভালো সময়ের অপেক্ষায়। কিন্তু সময় আরো ভালো না হয়ে দিন-দিন আরো খারাপ হয়ে উঠল।

ফ্রাউয়েনবার্গে উপস্থিত হলেন নতুন একজন ধর্মযাজক—ডক্টর হোসিয়ুস। লোকে তাঁকে বলত "ধর্মবিরোধীদের মুগুর"। তিনি সর্বত্র ধর্ম-বিরোধিতা দেখতে পেতেন। কোপারনিকাসের প্রতিটি চালচলনের ওপরে গোপনে নজর রাখতেন এবং সমস্তই বিশপকে জানিয়ে দিতেন। কোপারনিকাস কুনজরে পড়লেন। কোপারনিকাসের সঙ্গে যদি কাউকে কথা বলতে দেখা যায় তাহলে সেও সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তি হয়ে ওঠে।

আঘাত পড়তে লাগল আরও ঘন ঘন! যাজক-সভায় কোপারনিকাসের বন্ধু ছিলেন মাত্র একজন। নাস্তিকতার অভিযোগ তুলে তাঁকেও তাড়িয়ে দেওয়া হলো।

বৃদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিজের গম্বুজ ছেড়ে বড়ো একটা বাইরে যান না। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়া তাঁর দেখাশোনা করতেন। সামান্য আয়োজনের তাঁর সংসারটি বহু বছর এই আত্মীয়াই চালিয়েছেন। কিন্তু এই আত্মীয়ার সঙ্গেও কোপারনিকাসকে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হলো। তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে যাজকের গৃহে স্ত্রীলোকের স্থান নেই। তাঁকে কোনো কিছু করতে নিষেধ করা হয়নি, কোনো কিছু করতে বলাও হয়নি। তাঁকে শুধু ভর্ৎসনা করা হয়েছিল, "পিতা যেমন সন্তানকে ভর্ৎসনা করে তেমনিভাবে; উপদেশ দেওয়া

হয়েছিল "ভাই" যেমন ভাইকে উপদেশ দেয় তেমনিভাবে। কিন্তু তবুও "প্রীতিময়" ভ্রাতৃপ্রতিম যাজকদের মধ্যে, বিশপের পিতৃপ্রতিম দৃষ্টির সামনে তিনি কী একা!

কিন্তু হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটে গেল যার ফলে তিনি আগেকার উৎসাহ ফিরে পেলেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস ফিরে পেলেন। একজন অতিথির আগমন ঘটল তাঁর কাছে, গণিতের তরুণ অধ্যাপক, নাম জর্জ ইওয়াখিম রেটিকাস। তিনি এক অধৈর্য পাঠক, কোপারনিকাসের বই কবে প্রকাশিত হবে তার জন্য অপেক্ষা করতে রাজী নন, নিজেই চলে এসেছেন পাণ্ডুলিপিতে বইটি পড়বার জন্য।

প্রাচীন সেই গম্বুজের ঘরে নতুন জীবন ফিরে এল! গমগম করে উঠল উ'চু গলায় কথাবার্তা। পুস্তকটি পাঠ করে তরুণ অধ্যাপক রেটিকাস অভিভূত হলেন এবং পুস্তকটির প্রকাশে আর দেরি না করার জন্য কোপারনিকাসকে রাজী করালেন। বললেন, এই পুস্তক পাঠ করলে স্বয়ং আরিস্টটলও তাঁর মত বদলাবেন। পুস্তকটির যখন এত প্রয়োজন তখন এটিকে কিছুতেই "পাথর চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখা" উচিত নয়।

কোপারনিকাস তবুও ইতস্তত করতে লাগলেন। বললেন, "তার চেয়ে বরং শুধু সারণিগুলো প্রকাশ করলে হয় না? তাহলে সাধারণ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তৈরি-করা হিসাবগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। আর বৃহস্পতির বরপুত্র যদি কেউ থাকেন, যাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে, তিনি নিজেই এই সমস্ত সারণি থেকে নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা নির্ধারণ করতে পারবেন।"

কিন্তু কোপারনিকাসের তরুণ বন্ধু এসব কথা শুনতে রাজী নন। তিনি চান এক্ষুনি লড়াইয়ে নামতে, ধৈর্য ধরতে চান না।

বইয়ের বাজারে ছোট একটি পুস্তিকা দেখা দিল। তার নামপত্রে লেখা ছিল: "সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ, মাননীয় মহোদয় ডক্টর নিকোলাস অব থর্ন, ভোর্ম্‌স-এর যাজক, রচিত গ্রন্থ সম্পর্কে এই প্রাথমিক বিবরণটি লিখেছেন গণিতের একজন তরুণ ছাত্র।"

এই "তরুণ ছাত্রটি" কে? কোপারনিকাসের নতুন বন্ধু অধ্যাপক রেটিকাস। তাঁর এই পুস্তকটি আগে এসে ঢোল-শহরৎ করার মতো সারা বিশ্বের কাছে ঘোষণা করল শীঘ্রই কি মহান গ্রন্থ প্রকাশিত হতে চলেছে। তরুণোচিত আগ্রহ নিয়ে রেটিকাস অজ্ঞ ঈর্ষান্বিত চক্রান্তকারী মানুষের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর শিক্ষকের জন্যে একটি পথ তৈরি করে দিলেন। এই ভিড়ের মধ্যে এমন নির্বোধ কত আছে যাদের মাথায় একটিও মৌলিক চিন্তা নেই! এমন আকাট বিদ্যাদিগ্‌গজ কত আছে যারা বিচারবুদ্ধিহীন, যারা আপ্তবাক্যের কাছে সত্যকে জলাঞ্জলি দেয়। কোনো কিছু নতুনকে তারা ভয় করে—যেমন পে'চা ভয় করে সূর্যের আলোকে! তারা তাদের ভুয়ো বিজ্ঞানকে আঁকড়ে আছে, কারণ এই বিজ্ঞান যদি ভেঙে পড়ে তাহলে তাদের আর কোনো আশ্রয় থাকে না।

কোপারনিকাসের তরুণ সহযাত্রী প্রচণ্ড একটা ঝড়ের মতো তাদের অবস্থানের মধ্যে দিয়ে ধাবিত হলেন। জোর গলায় বললেন, "দার্শনিক যিনি হতে চান তাঁর মন হওয়া চাই মুক্ত।" তিনি সেই মানুষদের উপহাস করলেন যারা মনে করে কোনো কিছু প্রাচীন হলেই সেটা সত্য। তিনি তাদের মনে করিয়ে দিলেন, আকাশের ব্যাপার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কথা অনুসারে চলে না, বরং আকাশের ব্যাপার অনুসারেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের চলতে হয়। এবং তিনি ঘোষণা করলেন, স্বয়ং টলেমি যদি বে'চে থাকতেন তাহলে তিনি আর নিজের ব্যবস্থার পক্ষে থাকতেন না।

৩. পুস্তকটি লড়াইয়ে নামে

যুক্তি হিসাব ও সারণি দ্বারা সুসজ্জিত কোপারনিকাসের পাণ্ডুলিপি শেষপর্যন্ত তার যাত্রা শুরু করল। নুরেমবার্গ শহরের ছাপাখানায় এটি ছাপাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

কোপারনিকাস শেষপর্যন্ত মনস্থির করে তাঁর সন্তানকে ছেড়ে দিলেন। সন্তানটি নিজের মতো করে বাঁচুক। অজ্ঞতার বিরুদ্ধে লড়াই করুক। সত্যের পক্ষ নিয়ে দাঁড়াক। তাহলে কি অবশেষে সুসময় উপস্থিত হলো? না। সুসময় কখন আসবে ততদিন পর্যন্ত কোপারনিকাস নাও বাঁচতে পারেন। তিনি চান মৃত্যু হবার আগে তাঁর সারা জীবনের কাজটি শেষ করে যেতে। পাণ্ডুলিপি ধ্বংস করা যায়, কিন্তু বহু কপিতে ছাপা হয়ে যাবার পরে একটি না একটি কপি নিশ্চয়ই টিকে থাকে।...

পুস্তকটি তখনো তার পাঠকদের কাছে পৌঁছয়নি, তখনো তার লড়াই শুরু করেনি, কিন্তু তখনই তার পথ জুড়ে বাধা দেখা দিল। সম্পাদক চাইলেন "ধর্মশাস্ত্রবেত্তাদের তুষ্ট করার জন্যে একটি ভূমিকা" কোপারনিকাস পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যোগ করুন। এই প্রলোভনে কোপারনিকাস সাড়া দিলেন না। তিনি জানতেন আপস করা চলবে না। একটা ভূমিকা যোগ করা মানেই সবকিছু ধ্বংস করা। তিনি তা করতে পারেন না।

তাহলে পুস্তকটিকে বাঁচানো যায় কি-ভাবে?

কোপারনিকাস চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। পশ্চিম ইওরোপের সকল খৃস্টান দুটি শিবিরে বিভক্ত—একটি শিবিরের প্রধান পোপ, অপর শিবিরের প্রধান জার্মান মার্টিন লুথার। মার্টিন লুথার টুরিঙ্গিয়ার এক খনি-কর্মীর পুত্র, পোপের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ গড়ে তুলেছেন। কিন্তু তাই বলে তিনি কোপারনিকাস সম্পর্কে মন্তব্য করতে ছাড়লেন না। কোপারনিকাসের নতুন শিক্ষা সম্পর্কে গুজব কানে যেতে না যেতেই কোপারনিকাসকে বলে বসলেন নির্বোধ।

কোপারনিকাস ভাবলেন, পুস্তকটি পোপের নামে উৎসর্গ করা যাক না কেন। তাহলে হয়তো পোপ পুস্তকটিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করবেন, কেননা মার্টিন লুথার পুস্তকটির নিন্দা করেছেন। আর যদি ধর্মশাস্ত্রবেত্তাদের কোনো বিচার-সভায় পুস্তকটিকে উপস্থিত করা হয় তাহলে বিচারকের আসনে কোনো বিশপের থাকার চেয়ে পোপের থাকাটাই বরং ভালো।

উৎসর্গ-পত্রে কোপারনিকাস লিখলেন :

"হে পরম পবিত্র ফাদার!

আমি এই বিষয়ে অতীব সচেতন যে এমন মানুষ আছেন যাঁহারা যখনই শুনিবেন যে আমি ভূ-গোলককে গতিশীল করিয়াছি অমনি বলিবেন যে ইহার জন্য আমার নিন্দা হওয়া উচিত।...আমার রচনা সম্পূর্ণ হইবার পরেও আমি প্রায় সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে রচনাটি প্রকাশ করিব না। কেননা, আমার ভয় ছিল যে আমার মতামত এমনই নূতন ও আপাত-বিচারে এমনই অসম্ভব যে ইহার ফলে আমাকে নিন্দিত হইতে হইবে। কিন্তু আমার সুহৃদদের অনুরোধে রচনাটি প্রকাশ করিতে রাজী হইয়াছি।...অন্য বহু বিদ্বজ্জন ও প্রখ্যাত ব্যক্তিও আমার নিকট অনুরূপ দাবি করিয়াছেন. জোর দিয়া বলিয়াছেন যে এই সকল ধারণার দ্বারা আমি যেন বিব্রত না হই. বরং. পক্ষান্তরে. গণিতবিদগণের সমূহ উপকারের জন্য আমার রচনা প্রকাশ করা আমার অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হওয়া উচিত।

"হে পরম পবিত্র, আপনি হয়তো ইহাতে তেমন বিস্ময়াভিভূত হইবেন না যে রাত্রি-

ব্যাপী আমার পরিশ্রমের ফল প্রকাশ করিতে আমি সাহসী হইয়াছি এবং জানাইয়াছি পৃথিবীর সচলতার ধারণা কি-ভাবে আমি লাভ করিলাম, যদিও সকল গণিতবিদ এই ধারণার বিরোধী এবং এই ধারণা মানুষের সাধারণ বুদ্ধির বিরোধী।..."

তিনি আশা প্রকাশ করলেন কুৎসা-রটনাকারীদের বিরুদ্ধে পোপ তাঁকে বাঁচাবেন, যদিও লোকে বলে যে কুৎসার হুল সারানো যায় না। এবং যদি কোনো মূর্খ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে, তাই তিনি আগে থেকেই ঘৃণার সঙ্গে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করলেন :

"শূন্যগর্ভ বাক্যবাগীশরা যদিও গাণিতিক বিজ্ঞান কিছুই জানে না, তবুও তারা সদম্ভে আমার কাজের বিচার করতে পারে বা আমার কাজকে বর্জন করতে পারে এবং সেজন্য তারা ধর্মশাস্ত্রের অংশকেও ইচ্ছাপূর্বক বিকৃত করতে পারে। তাই যদি হয় তাহলে তাদের প্রতি আমি কোনো মনোযোগ দেব না এবং এ-ধরনের অযৌক্তিক বিচারকে ঘৃণা করব..."

মাসের পর মাস কেটে গেল। শীতের ঝড়ের পরে এল বসন্ত। ফ্রাউয়েনবার্গের আকাশে তারাগুলো ঝিকমিক করতে লাগল। কিন্তু বৃদ্ধ যাজক এখন আর রাত্রিবেলা নিজের গম্বুজ-ঘরের দেয়ালের বাইরে আসতে পারেন না। পীড়াগ্রস্ত হয়ে নিজের সরু খাটের ওপরে শুয়ে থাকেন। তাঁর বইয়ের তাকে পাশাপাশি রয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ-দের বইয়ের পাশাপাশি রোগ-নিরাময়ের উপায় সম্পর্কিত বইও। কোপারনিকাস ছিলেন একাধারে চিকিৎসক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। একসময়ে তিনি প্রতিদিন সকালে নিচে নেমে শহরের উপকণ্ঠে রুগী দেখতে যেতেন। গরিব চাষীদের কাছ থেকে কোনো অর্থ নিতেন না। প্রায়ই এমন হতো যে ঘুরে ঘুরে রুগী দেখার সময়ে তাদের টেবিলের ওপরে রেখে আসতেন দামী রজন ও মশলা দিয়ে তৈরি ওষুধপত্র শুধু নয়, কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রাও।

আর এখন তিনি একেবারে একা! কেউ তাঁর জন্য ভাবে না। তিনি জানেন বেশিদিন তিনি বাঁচবেন না। উৎকণ্ঠার সঙ্গে কান পেতে প্রতিটি আওয়াজ শোনেন, সিঁড়িতে প্রতিটি পায়ের শব্দ। মনে মনে কল্পনা করেন তাঁর তরুণ বন্ধু বৃহৎ পুস্তকটি হাতে নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দিনের পর দিন চলে যায়। কিন্তু পুস্তকের আর দেখা নেই।

এতদিনে কোপারনিকাসের নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে পুস্তকটি তিনি আর দেখে যেতে পারবেন না। তারপরেও কিন্তু পুস্তকটি তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়—তাঁর জীবনের শেষ দিনটিতে, মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা মাত্র আগে। পুস্তকটি তিনি হাতে নেন, তাকিয়ে দেখেন, কিন্তু তাঁর চিন্তার সমস্ত সূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে।...

পুস্তকটির পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখার ক্ষমতা যে কোপারনিকাসের ছিল না তাতে সম্ভবত ভালোই হয়েছিল। তিনি যদি পুস্তকটি খুলতেন তাহলে দেখতে পেতেন পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি অ-স্বাক্ষরিত ভূমিকা যোগ করা হয়েছে। কোপারনিকাসের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্পাদক বইয়ের সঙ্গে কিছু "বক্তব্য" জুড়ে দিয়েছেন। আর এই বক্তব্য ছিল এক্ফোঁটা বিষের মতো যা কোপারনিকাসের জীবনের শেষ সময়টুকুকে বিষিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

ভবিষ্যৎ অভিযোগকারীদের সামনে নিজেকে ন্যায়সংগত প্রতিপন্ন করতে গিয়ে এবং স্পষ্টতই নিজের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়ে সম্পাদক লিখেছেন যে বইটির লেখক এমন কিছু করেননি যা নিন্দনীয়। লেখকের শিক্ষা কারও পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। এটি একটি তত্ত্ব মাত্র, এবং তত্ত্বটি এই কারণে সুবিধাজনক যে এতে হিসাবের ব্যাপারটা সহজ হয়ে

যায়। সাধারণভাবে বলা চলে, কেউ যদি প্রামাণ্য কিছু শিখতে চান তাহলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পুস্তক পড়ার প্রয়োজন নেই। এই পুস্তকটি প্রামাণ্য নয়, "আর এমন যদি কেউ থাকেন যিনি এই পুস্তকে যা লেখা হয়েছে তাকে সত্য মনে করছেন, তাহলে পুস্তকটি পড়ার পরে আগের চেয়েও বেশি নির্বোধ হয়ে উঠবেন।..."

কোপারনিকাসের তরুণ বন্ধু এই বক্তব্য পড়ে রাগে ফেটে পড়লেন। কোপারনিকাসের মৃত্যুর জন্যে তাঁর শোকের সঙ্গে মিশে গেল বিশ্বাসঘাতকের হীন কার্যের জন্যে তাঁর ক্রোধ। কিন্তু এখন আর তিনি কী করতে পারেন! পুস্তকটি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে এবং বইয়ের দোকানে বিক্রি হচ্ছে।

পুস্তকটি এখন বন্ধুরাও পড়ছে, শত্রুরাও পড়ছে। তবে কোপারনিকাস যেটা আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, বন্ধুর চেয়ে শত্রুর সংখ্যা বেশি।

"জার্মানির শিক্ষক" এবং মার্টিন লুথারের বন্ধু মেলাখ্টন লিখলেন, কোপারনিকাসের শিক্ষা অর্থহীন এবং এ-ধরনের বই ছাপলে কু-দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়। "চোখ দিয়ে তাকালেই প্রমাণ পাওয়া যায় পৃথিবীর চারদিকে আকাশ প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় একবার ঘুরছে।" "জার্মানির শিক্ষকের" দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাঁর বহু ছাত্রও পুস্তকটির কুৎসা করতে শুরু করে দিল।

কিন্তু যাদের জন্যে পুস্তকটি লেখা তারা যে-ভাবে বইটিকে গ্রহণ করল তা দেখে কোপারনিকাস সন্তুষ্ট হলেন। প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে কোপারনিকাসের উদ্দেশে একটি উচ্ছ্বসিত গীতি-কবিতা পর্যন্ত লিখে বসলেন।

টাইকো ব্রাহের মানমন্দিরটি ছিল বিরাট। কাব্য ও সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী উরানিয়া অনুসারে মানমন্দিরের নাম উরানিয়েনবার্গ। বিজ্ঞানসাধনার এই দুর্গে ছিল অনেক বড়ো-বড়ো যন্ত্রপাতি, এবং কোপারনিকাস স্প্রুসগাছের ছোট ছোট কাঠি দিয়ে নিজের হাতে যে-সব যন্ত্রপাতি বানিয়ে নিতেন তার চেয়েও অনেক বেশি জটিল যন্ত্রপাতি। কোপারনিকাসের মৃত্যুর পরে তাঁর বন্ধুরা এইসব যন্ত্রপাতি টাইকো ব্রাহের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী কবিতাও লিখতেন। একটি কবিতায় তিনি ছোট স্প্রুস কাটির কীর্তন করেছেন, যার সাহায্যে কোপারনিকাস তারালোকে উঠতে পেরেছিলেন।...

আমরা এই অধ্যায়ের চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছে গিয়েছি। কিন্তু জীবনে যা ঘটে, অধ্যায়ের চূড়ান্ত পরিণতিতেও তেমনি শুরু হয়ে যায় পরবর্তী অধ্যায়ের কাহিনী।

দশম ও শেষ অধ্যায়

১. কোপারনিকাসের বই কি-ভাবে একজন তরুণ সন্ন্যাসীর হাতে এল

১৫৪৩ সালটি কেবলমাত্র কোপার্নিকাসের মৃত্যুর বছর নয়, তাঁর বইয়ের জন্মেরও বছর। যখন তিনি একটি পাথরের পাটাতনের নিচে নিশ্চল হয়ে শায়িত ছিলেন তখন তাঁর বই চারদিকে সফর করতে শুরু করেছিল।

কেউ কেউ বইটিকে উপহাস করল, কেউ কেউ প্রশংসা করল। কিন্তু কেউ-ই নির্বিকার থাকতে পারল না। বইটি বদলায়নি, কিন্তু বইটি হাতে আসার পরে তার অনেক পাঠকই একেবারে বদলে গেল।

বইটি, এই বিপজ্জনক বইটি, তাদের কাছে এল নিয়তির মতো, ভবিষ্যতের মতো। যারা ঘুমন্ত তাদের জাগিয়ে তুলল, এমনকি যারা দুর্বলচিত্ত তাদেরও টেনে নিয়ে গেল দুঃসাহসী অবিশ্বাসী চিন্তার দিকে। গির্জার হুকুম মতো নয়, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা—তাতে কতই না আনন্দ। কিন্তু এই আনন্দের জন্যে মাঝে মাঝে দামও দিতে হয় বড়ো বেশি।

কোপারনিকাসের বই একজন তরুণ সন্ন্যাসীর হাতে পড়ল। তিনি থাকেন নেপ্‌ল্‌স-এর অদূরে একটি ছোট শহরে। তাঁর নাম জিওর্দানো ব্রুনো। নিজের প্রকোষ্ঠে অনেক বই আছে তাঁর—কতকগুলো বইয়ের তাকে, কতকগুলো অনুসন্ধানী চোখ থেকে আড়াল করার জন্যে লুকানো অবস্থায়।

মঠাধ্যক্ষ যদি কখনো সন্ন্যাসী জিওর্দানোর প্রকোষ্ঠে তন্নতন্ন তল্লাশী চালান তাহলে তাঁর হাতে আসবে শুধু আরিস্টটল নয়—আরিস্টটল তো গির্জার মঞ্জুরপ্রাপ্ত—উপরন্তু হাতে আসবে স্বাধীন-মতাবলম্বী রোমান লুক্রেটিয়াস-এর কবিতা 'দে রেরুম নাচুরা' বা বস্তুর ধর্ম বিষয়ে। হাতে আসবে 'দেবদূতোপম ডাক্তার' টমাস অ্যাকুইনাস-এর আঠারোটি নথি এবং সেই সঙ্গে রোটারডাম-এর ইরেসমাস রচিত বিপজ্জনক পুস্তিকা 'মূর্খতার প্রশস্তি'।

তোশকের নিচে বা মেঝের কোনো একটা পাটাতনের নিচে তল্লাশি চালালে মঠাধ্যক্ষের হাতে আসবে ব্রুনোর নিজস্ব নোটবই। প্রথম নোটবইটি খুলে যদি তিনি দেখেন তাহলে ক্রোধে ও ঘৃণায় নীল হয়ে উঠবেন।

তাঁর লেখা কমেডি 'আলোকবর্তিকা', কথোপকথনমূলক রচনা 'বীর উৎসাহীবৃন্দ'-তে তীব্র উপহাসের বিষয় হয়েছে পবিত্র অজ্ঞতা, একনিষ্ঠ নির্বুদ্ধিতা, ধর্মের মুখোশধারী পাপ। ভাবা যায় যে এইসব লিখেছেন ডোমিনিকান ভেকধারী এক সন্ন্যাসী! তাহলে কেন তিনি সন্ন্যাসীর আলখাল্লা পরে থাকেন?

বাস্তবিক পক্ষে, এই তরুণ স্বাধীন-মতাবলম্বী আদৌ কেন সন্ন্যাসী হয়েছেন?

সেন্ট ডোমিনিকের মঠে যখন তিনি যোগ দিয়েছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পনেরো। ডোমিনিকানদের সম্পর্কে বহুকাল ধরে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে তারা

ধর্মবিশ্বাসে গোঁড়া ও উগ্র এবং অবিশ্বাসীদের কাছে আতঙ্ক। এমনটি হওয়ার কারণ, পোপের বিরুদ্ধবাদীদের দমন করার জন্যে যে বিচার-সভা বসত (ইন্‌কুইজিশন) তার সভাপতিমণ্ডলীর আসনে ডোমিনিকানদের স্থান ছিল। ডোমিনিকানদের পতাকায় দেখা যেত একটি কুকুরের মাথা, তার দাঁতে একটি জ্বলন্ত মশাল। প্রভুর অনুগত খাঁটি শিকারী কুকুরের মতো তারাও সর্বত্র অবিশ্বাসীদের সন্ধান করে বেড়াত। সন্ন্যাসীদের মধ্যে তারাই ছিল সবচেয়ে বিদ্বান। অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য যুক্তিজাল বিস্তার করে তারা অবিশ্বাসী চিন্তাকে উদ্‌ঘাটন করতে পারত। 'দেবদূতোপম ডাক্তার' অ্যাকুইনাস তাদেরই ভেকধারী। তিনিই তৈরি করেছেন 'সুমা থিওলজিয়া', যা থেকে এক প্রজন্মেরও অধিক ডোমিনিকান শিক্ষালাভ করেছে কি-ভাবে চিন্তা করা উচিত এবং কি-ভাবে চিন্তা করা উচিত নয়।

আর এখানেই এসেছিল সেই পনেরো বছরের বালক আরও জ্ঞানলাভ করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। সেন্ট ডোমিনিকের সেই মঠেই যোগ দিয়েছিল যেখানে একসময়ে টমাস অ্যাকুইনাস শিক্ষাদান করতেন। বালকটি বই ভালোবাসত। মঠের গ্রন্থাগারে যতো প্রচুর বই রয়েছে তার চেয়ে বেশি আর কোথায় থাকতে পারে?

বালকটি তার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বিজ্ঞানের জন্যে আকাঙ্ক্ষিত ছিল। তার বিশ্বাস ছিল—বিজ্ঞানকে, তার সুন্দরী কন্যাকে, সে খুঁজে পাবে মঠের ঐ উঁচু পাঁচিলের পিছনে। হ্যাঁ, কন্যা ওখানেই আছে। কন্যাকে প্রথম নিয়ে আসা হয়েছিল অমায়িক বৃদ্ধ ক্যাসিওডোরাসের কক্ষে (ক্যাসিওডোরাস ষষ্ঠ শতাব্দীর রোমান রাষ্ট্রনেতা ও গ্রন্থকার—অ), তারপর থেকে মঠ থেকে মঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ব্রুনো ভেবেছিল, এখানকার শান্ত পরিবেশ কন্যার কাছে আরো ভালো লাগবে। কিন্তু কী পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছে এই সুন্দরী কন্যা। এই সেই কন্যা যে একসময়ে হেলাসের (অর্থাৎ গ্রীসের—অ) পাহাড়ে ও উপত্যকায় তার ভগিনীদের নিয়ে আগুয়ান হয়ে নাচগান করেছিল! সে হয়ে উঠেছিল সিন্ডেরেলা—তার ভক্তিমতী ও নিষ্ঠাবতী কর্ত্রীর কাছে কর্মরতা দাসী। এখানে ঘণ্টার শব্দ ও প্রার্থনার ধ্বনির মধ্যে কন্যার গলার স্বর বড়ো একটা শোনা যেত না। তার জন্যে ছিল কঠোর উপদেষ্টা ও তত্ত্বাবধায়ক। স্বয়ং ডাঃ টমাস অ্যাকুইনাস তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন :

"তোমার কর্ত্রীর সামনে মাথা নত করো, কেননা মানুষের বোধি মহান ঐশ প্রজ্ঞার চেয়ে কম। এই চৌকাঠ ডিঙিও না, এই পাঁচিলের বাইরে যেও না, কেননা মানুষের বুদ্ধিবৃদ্ধি সীমাবদ্ধ। মানুষ সবকিছু অবলোকন করতে পারে না। যদি তুমি এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করো, যদি তুমি তোমার স্বাধীনতা ফিরে পেতে চাও, তাহলে তোমাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। অবিশ্বাসীদের দণ্ড মৃত্যু।..."

এখানেই এসেছিলেন জিওর্দানো ব্রুনো, চার-দেয়ালে ঘেরা ছিলেন। এই সংকীর্ণ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কেন তিনি এসেছিলেন? কেন থাকতে পারলেন না বাইরে জগতের উল্লাস ও আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে? একজন যোদ্ধা ও কবির পুত্র হয়ে কেন তিনি সন্ন্যাসী হতে গেলেন? মঠে তিনি এসেছিলেন সেই কন্যার জন্যে—বিজ্ঞানের জন্যে।

তাঁর প্রয়োজন ছিল নিজের চোখ দিয়ে যতোদূর দেখা যায় তার চেয়েও বেশি দূর পর্যন্ত দেখার। বিজ্ঞান তাঁকে নতুন দৃষ্টি দিক, তাঁকে দেখতে শেখাক যা অন্য কেউ দেখেনি। আর বিজ্ঞান রয়েছে এই মাঠ, মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত হাজার হাজার বইয়ে ঠাসা এই গ্রন্থাগারে।...

বছরের পর বছর কেটে গেল। ব্রুনো একটির পর একটি বই পড়ে ফেললেন। নড়বড়ে

মই বেয়ে উঠতে উঠতে শেষপর্যন্ত পেঁছে গেলেন সবচেয়ে উঁচু ধাপটিতে। সেখানে পেয়ে গেলেন ধুলোমাখা একটি বই, যেটি বহুকাল অন্য কেউ হাতে নেয়নি।

গ্রন্থাগারে দীর্ঘ সময় কাটাতে গিয়ে তিনি পার হয়ে গেলেন শতাব্দীর পর শতাব্দী, দেশের পর দেশ। মনুষ্যবসতির সম্পূর্ণ যাত্রাটি চিহ্নিত করলেন। গ্রীসের দার্শনিকরা তাঁকে নিয়ে গেলেন জ্ঞানী ব্যক্তিদের পথে, বিশ্বের সীমানাকে ক্রমেই বাড়িয়ে তুলে। গ্রীকদের পথ ধরে এলেন আরব ও ইহুদীরা। আভেরোয়েজ (দ্বাদশ শতাব্দীর আরব দার্শনিক ও বৈদ্য—অ) তাঁকে জানালেন যে এই বিশ্ব শাশ্বত, মনুষ্যজাতির মহাসাগরে আত্মা একটি বিন্দু মাত্র। মানুষ নশ্বর, মনুষ্যজাতি অবিনশ্বর।

ক্যাথলিক গির্জার ফাদারদের তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করলেন। স্বচ্ছ গ্রীক জ্ঞানের পরে তিমিরাচ্ছন্ন এইসব "দেবদূতোপম", "অতি মহান", "উত্তম", "অখণ্ডনীয়" উচ্চাসীনদের শিক্ষা! কুয়াশা আরও গাঢ় হয়ে এল। সীমানা ক্রমেই আরও ছোট হতে লাগল। সারা বিশ্ব অশরীরী আত্মায় পরিপূর্ণ—ওপরে দেবদূতরা, নিচে শয়তানরা। দেবদূতরা আকাশের গোলকগুলোকে ঘোরায়, শয়তানরা পাঠায় ঝড়। তাহলে মানুষ কোথায়? এই সমস্ত গোপন শক্তি, এই সমস্ত উড্ডীয়মান আত্মার সংঘর্ষে তার মন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

টমাস অ্যাকুইনাসকে পাশে সরিয়ে রেখে তিনি আবার ডুবে গেলেন প্রাচীন মনীষীদের রচনাবলীর মধ্যে। অধ্যয়ন করলেন আরিস্টটল। কিন্তু পেলেন না সেই জীবন্ত আরিস্টটলকে—যিনি সত্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন, পথ হারাতেন, আবার পথ খুঁজে পেতেন। দেবদূতোপম ডাক্তার শত-শত প্রশ্ন, উপপ্রশ্ন ও ভাগবিভাগ ভুলে এমনকি আরিস্টটলকেও শুষ্ক প্রস্তরীভূত প্রত্নবস্তু করে তুলেছেন।

কত সংকীর্ণই না মনে হয় আরিস্টটলের বিশ্বকে। ক্ষিতি পরিবর্তিত হয় অপ্-এ, অপ্ মরুৎ-এ, মরুৎ তেজ-এ, তেজ ব্যোম-এ। ব্যস, এই নিয়েই সব কিছু! শেষ স্বর্গীয় গোলকটি তারাখচিত। তার বাইরে আর কিছু নেই—না প্রাণ, না অন্য কোনো বিশ্ব।...

নিজের প্রকোষ্ঠে ব্রুনোর দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। দেয়ালগুলো চারপাশ থেকে তাঁকে চেপে ধরেছে। তিনি এসেছিলেন সুন্দরী কন্যা বিজ্ঞানের সন্ধানে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন, সেই সুন্দরী কন্যাও কারাগারে জীবনপাত করছে।

দিনে দিনে মঠের বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়াটাও ব্রুনোর কাছে কণ্টকর হয়ে উঠল। কণ্টকর হয়ে উঠল জপমালা হাতে ধরার দৃশ্য। আকাশের দিকে চোখ তোলা অথচ আকাশ না-দেখার দৃশ্য। তাঁর মনে হতে লাগল মঠের মধ্যে তিনি যেন একেবারে বাইরের লোক। আর মঠের সন্ন্যাসীরাও তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল।

একজন যাজক প্রধান যাজকের কাছে যাজক জিওর্দানোর নামে এই বলে নিন্দা করল যে যাজক জিওর্দানো পবিত্র ভার্জিনের সপ্ত আনন্দ নিয়ে ঠাট্টা করেছেন। আরও একজন এসে জানাল যে জিওর্দানো যা করেছে—কথাটা মুখে আনলেও পাপ হয়—নিজের প্রকোষ্ঠ থেকে সাধুদের মূর্তিগুলি বার করে দিয়েছে আর শুধু ক্রুশ রেখে দিয়েছে।

জিওর্দানোকে অবিশ্বাসী বলে সন্দেহ করা হতে লাগল। কড়া নজর রাখা হলো তার ওপরে। কিন্তু মুখে কেউ কিছু বলল না। যথাসময়ে তিনি খৃস্টান পুরোহিত হলেন। তখন খৃস্টের ভজনা গাইলেন। শিশুদের দীক্ষিত করলেন, শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন।

মঠ ছেড়ে তাঁকে প্রায়ই নেপ্‌ল্‌স-এ যেতে হতো। স্বাধীনতার এই ছায়াটুকু তিনি

আগ্রহের সঙ্গে কাজে লাগাতেন। বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করতেন। নিষিদ্ধ বই সংগ্রহ করতেন।

আর ঠিক এই সময়েই কোপারনিকাসের বইটি তাঁর হাতে এসে পড়ল। কী আনন্দের সঙ্গে তিনি আবিষ্কার করলেন তাঁর চোখের সামনে নভোমণ্ডল উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। তারাগুলি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে অসীমের মধ্যে। এই তারাগুলির মধ্যে পৃথিবী এক উদ্ভাসিত বিন্দু মাত্র। প্রাচীন পৃথিবী ছিল উপর ও নিচে থেকে চাপা অবস্থায়—উপরে স্বর্গের শিখর, নিচে নরকের গহ্বর। এখন এই ক্লিষ্ট ভূত অদৃশ্য হয়ে গেল। চারিদিকে সীমাহীন অন্তরীক্ষ, সেখানে কত সহজে নিঃশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে। আর পৃথিবী যেন একটা পাখি, সহগামী গ্রহমণ্ডলকে নিয়ে স্বর্গীয় অন্তরীক্ষে ভেসে বেড়াচ্ছে।

আগ্রহের সঙ্গে ব্রুনো কোপারনিকাসের চিত্র অধ্যয়ন করলেন। সূর্য রয়েছে কেন্দ্রে। আর সূর্যের চারিদিকে, অনেকটা দূরে, রয়েছে নক্ষত্রদের গোলক।

কোপারনিকাস বিশ্বের প্রাচীর সরিয়ে দিয়েছেন বাইরের নক্ষত্রদের দিকে। কিন্তু ভীরুর মতো সেখানেই থেকে গিয়েছেন। তিনি থেমে গেলেন কেন, কেন ভাবলেন যে নক্ষত্র ছাড়িয়ে আর কিছু নেই? আরিস্টটলের শিক্ষা তাই—এই কারণেই কি? কিন্তু ডিমোক্রিটাস, এপিকিউরাস ও লুক্রেটিয়াস তো এই শিক্ষা দিয়েছেন যে বিশ্ব অসীম আর সেখানে কত-যে জগৎ আছে তা কেউ জানে না!

ব্রুনোর মনে হতে লাগল এই শেষ প্রাচীর ভেঙে ফেলাটাই তাঁর কর্তব্য, এজন্যেই তিনি নিযুক্ত। নিজেকেই নিজে বললেন, 'বিশ্বাসজনক যুক্তি খুঁজে বার করো! অমিতবিক্রমে এই শেষ অচলায়তন প্রাচীর ভেঙে ফেল, ধূলিসাৎ করো! মানুষকে বোঝাও যে জগৎ আছে মাত্র একটি নয়, অসংখ্য! দুয়ার খুলে দাও যাতে সবাই দেখতে পায় আমাদের সূর্যের মতো আরো নক্ষত্র রয়েছে!'

আর তখন জগতের প্রাচীর ও মঠের প্রাচীর অদৃশ্য হয়ে গেল। চারিদিকে সীমাহীন অন্তরীক্ষ। যেদিকেই তাকানো যাক, দেখা যাচ্ছে সংখ্যাতীত নক্ষত্র। সেইসব নক্ষত্রের চারিদিকে গ্রহমণ্ডল আবর্তিত হচ্ছে। সেইসব গ্রহে বাস করছে জীবন্ত প্রাণী। তারা আমাদের সম্পর্কে জানে না, যেমন আমরা জানি না তাদের সম্পর্কে।

তাঁর সামনে উন্মোচিত এই বিপুল বিশ্বের দিকে ব্রুনো তাকিয়ে দেখলেন। এখনই মনে হচ্ছে চারিদিকের এত নক্ষত্রের মধ্যে তাঁর স্বদেশ পৃথিবীকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। এটি এখন কোনোরকমে চোখে পড়ার মতো একটি বিন্দু মাত্র—মহাশূন্যে ঝিকমিক করছে।

এই বিশ্বের সঙ্গে তুলনায় মানুষ তাহলে কতটুকু? কিছুই নয়? না, মানুষ এই অসীমকে চিনতে পেরেছে, এক পলক তাকিয়েই তাকে ধরতে পেরেছে, নিজের বুদ্ধি দিয়ে তাকে বুঝতে পেরেছে।

মহা আনন্দে ব্রুনো পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন। অনুভব করলেন মনের প্রসার। তাঁর আত্মা দুই অনন্তের মাঝখানে ভেসে বেড়াতে লাগল—একদিকে বৃহৎ বস্তুর জগৎ, অন্যদিকে ক্ষুদ্র বস্তুর জগৎ; একদিকে নক্ষত্রের জগৎ, অন্যদিকে পরমাণুর জগৎ।

২. ব্রুনোর নিশ্চিত ধারণা হলো পৃথিবীতে তাঁর ঠাঁই নেই

তা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু পৃথিবীতেই আছেন—নেপল্‌স-এ, একটি মঠের প্রকোষ্ঠে। ব্রুনো যখন অনন্তে ভাসছিলেন তখনো তাঁর ওপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর রাখা

হচ্ছিল। তিনি কী বলছিলেন সেটা তারা শুনছিল। শুধু তাই নয়, তিনি কী ভাবছিলেন তাও তারা জেনে নিচ্ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে একশো-ত্রিশটি অভিযোগ আনা হয়েছিল। একশো-ত্রিশবার তিনি ক্যাথলিক চার্চের শিক্ষা অমান্য করেছিলেন।

নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তিনি তাড়াতাড়ি নেপল্‌স থেকে রোমে চলে গেলেন। কিন্তু মঠের সাধুরা তাঁর প্রকোষ্ঠে তল্লাশি চালিয়ে তাদের অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ পেয়ে গিয়েছিল। সেটি একটি বই—রোটারডামের ইরাসমাস রচিত। তাড়াতাড়িতে বইটি তিনি ফেলে গিয়েছিলেন।

ব্রুনো তখন সাধুর আলখাল্লা ছেড়ে দিয়ে টুপি ও পিরাণ গায়ে দিলেন। কোমরের বেল্‌ট থেকে ঝুলিয়ে দিলেন একটা তলোয়ার। সাধুসন্ন্যাসীদের পোশাকের চেয়ে এই জাগতিক পোশাকটাই তাঁকে যেন আরো বেশি মানিয়ে গেল।

তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন রূপকথার রাজপুত্র, সিন্ডেরেলাকে উদ্ধার করতে এসেছেন। তিনি চলে গেলেন বন্দরে, একটি জাহাজে চেপে বসলেন। সমুদ্রের তাজা বাতাস তাঁর মুখের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। তাঁর সামনে স্বাধীনতা!

এমনিভাবে তিনি নগরে-নগরে ও দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। জগৎটাকে এমনিতে বড়ো মনে হতে পারে, কিন্তু ব্রুনোর কাছে ছিল খুবই ছোট।

তিনি ভেবেছিলেন, আল্‌প্‌স-এর ওপারে স্বাধীন সুইজারল্যান্ডে নিজের জন্যে ও ভ্রমণ-সঙ্গী বিজ্ঞানের জন্যে আশ্রয় পেয়ে যাবেন। খৃস্টীয় ধর্মগুরুদের লম্বা হাত ওখানে নিশ্চয়ই পৌঁছতে পারবে না।

ব্রুনো জেনিভাতে গেলেন। আনন্দের সঙ্গে মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন, তিনি মিথ্যা আশা পোষণ করেছেন। এখানকার ধর্মীয় বিশ্বাস রোম থেকে আলাদা, কিন্তু অসহিষ্ণুতা একই রকমের। চারদিকে ছড়িয়ে আছে মঠের সাধু নয়, ছোট ছোট দোকানদার। এখানকার ধর্ম সন্ন্যাসীর নয়, কারবারীর। যার ধন আছে সে-ই ধার্মিক। অথচ গোঁড়ামি আছে একই রকমের প্রচণ্ড।

তারা যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলল, ব্রুনো তাদের চোখে দেখতে পেলেন উদগ্র মনোযোগের সেই একই রকম ধিকিধিকি আগুন। শুনলেন, শহরে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ঘুরে বেড়ায়। তারা প্রত্যেকের ওপরে নজর রাখে। যদি কখনো দেখে যে কেউ অসদাচরণ করছে বা বিশৃঙ্খল জীবন যাপন করছে তাহলে বন্ধুভাবে তাকে ভর্ৎসনা করে। তাদের এমনভাবে বাছাই করা হয় যেন শহরের প্রত্যেকটি এলাকায় কেউ-না-কেউ থাকে এবং এইভাবে শহরের সর্বত্র "চোখ রাখা হয়"। তার প্রমাণ পাওয়ার জন্যে আর কিছু করার দরকার নেই, শুধু রবিবারের দিনটিতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেই হলো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে কঠোরভাবে মনে করিয়ে দেওয়া হবে যে গির্জায় যাবার সময় হয়েছে।

এই শান্তিপূর্ণ ধার্মিক শহরে, যেখানে সবকিছুই এত ধীরস্থির ও শান্তশিষ্ট, সেখানে এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে অত্যাচারিত সারভিটাসের আত্মা। স্পেনদেশীয় চিকিৎসক সারভিটাসও আশা করেছিলেন সুইজারল্যান্ডে এসে তিনি ইন্‌কুইজিশনের দৃষ্টি থেকে নিজেকে গোপন করতে পারবেন। তিনি ছিলেন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী। মানব-শরীরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং রক্তপ্রবাহের রহস্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

জেনিভার ধর্মধ্বজী নাগরিকরা তাঁকে এই দন্ড দিল যে বইটি লেখার জন্যে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হবে। তাঁকে যে শুধু পুড়িয়ে মারা হলো তাই নয়, দু-ঘণ্টা ধরে অগ্নিকুণ্ডে ঝলসানো হলো।

ব্রুনোর উচিত ছিল আরো সতর্ক হওয়া। উচিত ছিল মুখ বন্ধ করে থাকা। কিন্তু সেটা তিনি চাইতেন না, পারতেনও না। একজন প্রফেসর-বেশী গণ্ডমূর্খের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তো আর রক্ষে নেই, সঙ্গে সঙ্গে সকলকে শুনিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন, 'এই এক ভণ্ড লোক! বিজ্ঞানের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই!'

জেনিভায় ব্রুনোর হাজির হওয়ার কয়েক মাস পরে বইয়ের দোকানগুলোতে ব্রুনোর লেখা পুস্তিকা দেখা দিল। পুস্তিকায় তিনি জেনিভার এক বৈজ্ঞানিক ভণ্ডের অজ্ঞতা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট ছিল। ব্রুনোর বিচার হলো এবং তাঁকে জেনিভার কারাগারে বন্দী করা হলো।

ভাগ্যক্রমে আরও গুরুতর অপরাধ করার মতো সময় তখনো তিনি পাননি। তাই অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলো। কিন্তু তাঁকে পরিষ্কার করে জানিয়ে দেওয়া হলো যে জেনিভার মানুষের আতিথেয়তা তিনি যেন আর আশা না করেন। অশান্ত অতিথি জেনিভা ত্যাগ করলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে দেখা গেল তুলুজ-এ, ছাত্রদের ক্লাশ নিচ্ছেন। সুন্দরী কন্যা বিজ্ঞানের স্থান যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে না হয় তাহলে আর কোথায় হবে!

খুব ভোরে, অন্ধকার থাকতেই, হাতে মোমবাতি ও নোটবই নিয়ে ছাত্ররা ক্লাশঘরে ছুটে যায়। এই নতুন তরুণ শিক্ষকের কথা মুগ্ধ হয়ে তারা শোনে। নতুন এই শিক্ষক প্রাচীন স্থিতধী অধ্যাপকদের থেকে কতই-না আলাদা। প্রাচীন এই অধ্যাপকরা বছরের পর বছর একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন। তাঁরা এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন যে স্পষ্ট জিনিসও অস্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন, "পাম্প জল পাম্প করে কারণ প্রকৃতিজগতে শূন্যস্থান থাকতে পারে না; আফিম খেলে ঝিমুনি আসে, কেননা আফিমের ধর্মই হচ্ছে ঝিমুনি আনা..."

শুনতে শুনতে ছাত্রদের মনে হয় অধ্যাপকদের প্রকৃতির মধ্যেই ঝিমুনি ধরানোর ধর্ম থেকে গিয়েছে, যদিও সেখানে শূন্যস্থান থাকার আশঙ্কা নেই।

নতুন শিক্ষক এইরকম নন। যখন তিনি পড়ান, ছাত্রদের খাগের কলম তাদের নোট-বইয়ের পৃষ্ঠায় বিঁধে যায়। শিক্ষকের চিন্তাপ্রবাহের সঙ্গে তাল রাখা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আর শিক্ষকের চিন্তাপ্রবাহ দূরগামী যে সারা বিশ্ব তাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

তিনি তাদের শেখান যা-কিছু অভ্রান্ত বলে মনে করা হচ্ছে তাকেও সন্দেহ করতে। তিনি খোদ আরিস্টটলের বিরোধী, প্লেটোরও বিরোধী।

হাজার বছর পরে ডিমোক্রিটাসের অনুগামী ও প্লেটোর অনুগামীদের মধ্যে সংগ্রাম নতুন শক্তি নিয়ে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে। প্লেটোর পুস্তকগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী নিরাপদে পার হয়ে এসেছে। পুস্তকগুলিকে রক্ষা করেছে প্রশাসনিক ও ধর্মীয় উভয় শক্তিই। কেননা, পৌত্তলিক প্লেটো খৃস্টান ধর্মতত্ত্ববিদদের মতোই এই শিক্ষা কি দেননি যে এই বিশ্ব ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি পরপারে পুরস্কৃত হন?

কিন্তু নিরীশ্বরবাদী ডিমোক্রিটাসের পুস্তকগুলির প্রতি সময় সদয় থাকেনি। সবই লোপ পেয়েছে, শুধু অন্য লেখকদের রচনার মধ্যে কিছু টুকরো অংশ আকস্মিকভাবে বেঁচে গিয়েছে। কি পৌত্তলিক, কি খৃস্টান—উভয় দলই ডিমোক্রিটাসের পুস্তক পুড়িয়েছে।

আর এখন ভস্ম থেকে এই পুস্তকগুলিকে আবার যেন উদ্ধার করা হচ্ছে। ডিমো-ক্রিটাস আবার যেন প্লেটোর সঙ্গে সংগ্রাম চালাচ্ছেন। এবং ডিমোক্রিটাসের অনুগামীদের আবার নিরীশ্বরবাদী বলে অভিযুক্ত করা হচ্ছে।

তুলুজ ছেড়ে ব্রুনো প্যারিসে চলে এলেন।

প্যারিসে লুগেনটরা সদ্য তখন গণ-হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। তাদের বাড়ির দরজা থেকে ক্রুশচিহ্নগুলো তখনো মুছে ফেলা হয়নি। এই যে পুল, যেখানে আবার জমজমাট ব্যবসা শুরু হয়েছে, সেখানেই ক্যাথলিকরা পলায়মান লুগেনটদের হত্যা করেছিল এবং মৃতদেহগুলো সীননদীর জলে নিক্ষেপ করেছিল। রাজপ্রাসাদের জানলা ও বারান্দা থেকে মহিলারা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখার সুযোগ যাতে ফসকে না যায় সেজন্য মহিলারা অভাবিতপূর্ব সময়ে বিছানা ছেড়ে উঠেছিল। সেটি ছিল রক্তমাখা ছুটির দিন, অসহিষ্ণুতার জয়লাভের দিন। ১৫৭২ সালের ২৩শে থেকে ২৪শে আগস্ট—সেণ্ট বার্থেলোমিউর ইভ্ নামে খ্যাত এই একটি মাত্র রাতে—ক্যাথলিকরা প্যারিসের তিনহাজার লুগেনটকে হত্যা করেছিল।

ব্রুনোর মনে রাখা উচিত ছিল যে এখানে, এই প্যারিসেই, ভাড়াটে খুনীরা সাহসী চিন্তাকারী পিয়ের দ্য লা রামে-কে রাস্তায় খুন করেছিল। প্রথমে তাঁর লেখা পুস্তকগুলি পোড়ানো হয়েছিল। এই পুস্তকগুলিতে সরকার ও যাজক-সম্মত আরিস্টটলের বিরোধিতা করা হয়েছিল। তারপরে এই পুস্তকগুলির লেখককেও মেরে ফেলা হয়।

গোড়ার দিকে ব্রুনোর ওপরে ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। তাঁকে রাজার সামনে উপস্থিত করা হয়। যা-কিছু নতুন তার ওপরে এই তরুণ রাজার দুর্বলতা ছিল। বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা তাঁর কাছে ছিল অসাধারণ এক বিষয়ান্তর—তিনি মুগ্ধ হলেন। ব্রুনোকে তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত করলেন এবং উপাসনা-সভায় যোগ দেওয়া থেকে অব্যাহতি দিলেন।

ব্রুনো ইচ্ছে করলে রাজসভার পণ্ডিত হতে পারতেন। তাতে তাঁর পদমর্যাদা ও ভূষণ বাড়ত। কিন্তু ব্রুনোর মতো মানুষের গায়ে আজ্ঞাবহের পোশাক চড়ানো চলে না। তিনি খৎ-বন্দী নন। তিনি যোদ্ধা। তিনি বেরিয়েছেন জগতকে বিজ্ঞানের পক্ষে জয় করতে। সর্বত্র তিনি বিজ্ঞানের প্রশংসা করছেন। ব্রুনোর এই মানসীকে কেউ যদি যথোচিত সম্মান না দেখায় তাহলে তার কপালে দুঃখ আছে। সেই গণ্ডমূর্খের ওপরে ব্রুনো ডাইনে-বাঁয়ে ঘুষি চালাবেন।

কিন্তু তিনি তো একা, অন্যরা বহু। অন্যরা কখন তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করবে সেই অপেক্ষায় না থেকে তিনি একটা জাহাজে চড়ে বসলেন এবং চ্যানেল পার হলেন।...

ব্রুনো এখন অক্স্ফোর্ডে এসেছেন। আলোচনা-সভার মঞ্চেও উপস্থিত হয়েছেন এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে মানুষরা লড়াই করছে তলোয়ার দিয়ে নয়, যুক্তি দিয়ে। আঘাতকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে গ্রন্থের নির্দেশ ও বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতি দিয়ে। দর্শকদের মধ্যে রয়েছেন ইংরাজ অভিজাত-সম্প্রদায়, রাজ-দরবার ও বিদেশের রাষ্ট্রদূতদের শিরোমণিরা—এবং রয়েছেন স্বয়ং রানী। তেরটি বিষয় ব্রুনো খণ্ডন করেছেন, অর্থাৎ তেরটি মারাত্মক আঘাত হেনেছেন তাঁর বিরোধীর ওপরে যিনি অক্স্ফোর্ডের অধ্যাপকদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো পণ্ডিত।

অধ্যাপকটি নিরস্ত্র হয়ে গেলেন। পরাজিত হবার পরে তিনি তাঁর বিরোধীকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে গলা মেলালেন তাঁর মান্যবর সতীর্থরা। তাঁদের অঙ্গের ভূষণ কুটিলতায় বাঁকা হয়ে গেল। তাঁদের ঠোঁট থেকে অশ্লীল গালাগালি বর্ষিত হতে লাগল।

বিতর্ক শেষ হয়ে গেল। মান্যবর অতিথিরা বিভিন্ন পথে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু বিজয়ীকে তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে হলো। তাঁর পিছন থেকে চিৎকার শোনা যেতে লাগল : "দূর হও! তুমি যেন আরিস্টটলের চেয়েও পণ্ডিত! তুমি যেন প্লেটোর

চেয়েও বেশি জানো! কোথাকার মাতব্বর তুমি, দূর হও! কোত্থেকে হাজির হলে, অভদ্র ছোকরা, তোমার এত সাহস যে স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে চাও!"

বিশ্ব যতোই বড়ো হয়ে উঠুক, তাতে কিছু যায় আসে না। তাঁর মতো মানুষের পক্ষে এই বিশ্ব এখনো খুবই ছোট! কোথায় যেতে পারেন তিনি?

লন্ডন, প্যারিস, মাগ্‌ডেবুর্গ, ভিটেনবার্গ।...

দূর থেকে দূরে, দেশ থেকে দেশে, এক সীমান্ত থেকে অন্য সীমান্তে। আরও কত আছে! সারা বিশ্ব ভাগ হয়ে গিয়েছে বিরুদ্ধভাবাপন্ন রাজ্যে, নগরে ও সম্প্রদায়ে।

ব্রুনো সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে, অতএব সকল সম্প্রদায়ের কাছে তিনি অবিশ্বাসী। তাঁর সম্মুখে রয়েছে অসীম মহাবিশ্ব, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে তাঁর জন্যে কোনো স্থান নেই। তিনি প্রচার করেছেন মানুষের মহত্ত্ব, কিন্তু তাঁর চারদিকে যে-সব মানুষ রয়েছে তারা বন্যজন্তুর চেয়েও হিংস্রভাবে একে অপরের ওপরে অত্যাচার চালাচ্ছে।

কিন্তু তিনি যা ছিলেন তার চেয়ে অন্য কিছু তিনি হতে পারেন না, হবার ইচ্ছাও তাঁর নেই। একজন মানুষ যখন স্পষ্টভাবে দেখতে শুরু করে তখন আবার অন্ধ মানুষের মতো বেঁচে থাকাটা তার মনঃপূত হতে পারে না।

দূর থেকে দূরে। প্রাগ, হেল্‌মস্টাট, ফ্রাঙ্কফুর্ট।...

নগর থেকে নগরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ব্রুনো। বিজ্ঞানের জয়গান গাইলেন—এমন সব জায়গায় যেখানকার ময়দানে সাহসী চিন্তাকারীদের পুস্তক শিঙা বাজিয়ে পোড়ানো হয়েছে।

"অন্ধকারের মানুষদের" বিরুদ্ধে তিনি অবিরাম লড়াই চালিয়ে গেলেন। প্রহারের বিরুদ্ধে প্রহার ফিরিয়ে দিলেন। আঘাত করলেন নীচতাকে, দমন করলেন ঔদ্ধত্যকে, উদ্ঘাটিত করলেন অজ্ঞতাকে। যেখানেই দৃষ্টিপাত করছেন দেখতে পাচ্ছেন অসহিষ্ণুতা, গুপ্তচর, ধর্মান্ধ, ভণ্ড ও নির্বোধরা ইতিহাসের রথের চাকা আঁকড়ে ধরে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

স্বাধীন চিন্তার স্থান কোথাও নেই। তাই যদি হয় তাহলে স্বদেশ ছেড়ে আসার সার্থকতা কী? মানুষকে ভালোবাসেন ব্রুনো, আর এখনো পর্যন্ত তাঁর নিজের দেশই সারা বিশ্বে তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় দেশ। তার কারণ, যে মানুষের হৃদয় বিরাট, যে মানুষ সমগ্র বিশ্বকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত, সে তো নিজের দেশকে ভালোবাসবেই—সংকীর্ণ, অকিঞ্চিৎকর, আত্মম্ভরী ও ক্ষুদ্র অন্তঃকরণের মানুষের চেয়েও গভীরভাবে।

ব্রুনো ইতালিতে ফিরে গেলেন। যদি তাঁকে মরতেই হয় তাহলে বরং নিজের দেশের মাটির ওপরে, নিজের দেশের আকাশের নিচে মরাই ভালো। তাঁর প্রিয় কবি লুক্রেটিয়াস সে-দেশের প্রকৃতির গুণগান করেছেন। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি সে-দেশে কাজ করেছেন।

যতো বছর ধরে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেই সময়ে ব্রুনো ইতালির কথা ভোলেন নি। অন্যদিকে ইতালিও তাঁর কথা ভোলেনি। ডোমিনিকানরা কেবলই ভাবছিল বয়ে-যাওয়া ভ্রাতাটিকে আবার কি করে নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে ফিরিয়ে আনা যায়। এই উদ্দেশ্যে নিপুণ জাল পাতা হলো। তার সঙ্গে জড়িত থাকল ডোমিনিকানরা, সেখান থেকে পাপ-স্বীকারের কথা শ্রবণকারী ধর্মগুরু, সেখান থেকে ভেনিসের এক অভিজাত তরুণ। এই অভিজাত তরুণ বিনীতভাবে আমন্ত্রণ জানাল ব্রুনোকে—ব্রুনো যদি তার গৃহে আসেন তাহলে শান্তিতে বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন করার জন্যে প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা তিনি ব্রুনোর জন্যে করে দেবেন।

খুবই লোভনীয় আমন্ত্রণ। ব্রুনো ভেনিসে চলে এলেন এবং ফাঁদে ধরা পড়লেন।

৩. ভবিষ্যতের দিকে মানুষের দৃষ্টি

খুব বেশি দিন ব্রুনো স্বদেশের আকাশ উপভোগ করতে পারলেন না। ভেনিসের কারাগারে ছোট্ট জানলা দিয়ে সেই আকাশ বড়ো একটা দেখাও যায় না।

জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে তাঁকে বইরে নিয়ে আসা হয়। একটা বেঞ্চির ওপরে তিনি বসেন। তাঁর হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা থাকে। তাঁর সামনে একটা মঞ্চের ওপরে বসেন বিচারকরা ও ফাদার বিচারপতি। ফাদার বা পিতা এবং ব্রাদার বা ভ্রাতা হিসেবে কী চমৎকার পরিচয়ই না তাঁরা দিচ্ছেন! "পিতৃসুলভ" ও "ভ্রাতৃসুলভ" ভালোবাসার নামে কত অপরাধই না তাঁরা করছেন!

সবকিছু স্বাভাবিকভাবে ঘটে যাচ্ছে—গোড়ার দিকে শুধুই জিজ্ঞাসাবাদ, পরে জিজ্ঞাসাবাদের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক নির্যাতন। বিচারকদের হাতে এমন সব পদ্ধতি আছে যা প্রয়োগ করলে যে-কাজ মানুষ করেনি তাও করেছে বলে স্বীকার করে নেয়। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁরা জানেন কি-ভাবে শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে মানুষের ইচ্ছাশক্তি গুঁড়িয়ে দিতে হয়। এটি একটি বিশেষ কলাকৌশল। প্রথমে হাতদুটোকে দড়ি দিয়ে পেঁচানো হয়। দড়ির গিঁটে একটি লাঠি থাকে, যাতে সহজেই ঘোরানো যায়। বন্দীকে স্বীকারোক্তি করতে বলা হয়। যদি স্বীকারোক্তি না করে তাহলে লাঠিটা ঘোরানো হয় আর শরীরের মাংসে লাঠিটা গভীর হয়ে কেটে বসে।

বন্দী যদি তবুও চুপ করে থকে তখন লাঠিটা আরো একবার ঘোরানো হয়, আরো একবার, আরো একবার। পাঁচ, দশ, কুড়ি বার। বন্দীকে আরো একবার বলা হয় যে সে ঈশ্বরের নামে স্বীকারোক্তি করুক। কথাটা যদি সে না শোনে তাহলে জল ও আগুন ব্যবহার করা হয়। প্রকোষ্ঠের মধ্যে নিয়ে আসা হয় এক-বালতি জল ও এক-পাত্র জ্বলন্ত কয়লা। বালতির জল ঢেলে দেওয়া হয় বন্দীর গলায়। "যদি সে মারা যায়, সেটা তারই দোষ।" লাল করে তাতানো লোহা দিয়ে তার মুখ পুড়িয়ে দেওয়া হয়: "সে স্বীকার করছে না, অতএব তার প্রতি কোনো করুণা নয়।"

নির্যাতন চলতেই থাকে। ফাদার বিচারপতিরা কারাগারের মধ্যেই দিন ও রাত্রি কাটান। সেখানেই পানভোজন করেন। নির্যাতন চালানোর প্রকোষ্ঠই তাঁদের ঘর, নির্যাতন চালানোই তাঁদের বিনোদন।

এমনিভাবে ব্রুনো নির্যাতিত হতে থাকেন।

আট সপ্তাহ পার হয়।

কী অত্যাচারই না চলেছে তাঁর শরীরের ওপরে। কারাগারের উত্তপ্ত সীসার ছাদ কী কষ্টকর আর কী শ্বাসরোধী! জীবনটা যদি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত!

কিন্তু বিচারপতিরা তো শুধু তাঁর প্রাণহনন চান না, তার আগে চান তাঁর প্রাণশক্তির হনন।

ব্রুনোকে তাঁরা রোমে নিয়ে গেলেন। রোমের বিচারপতিরা এমন এক চমৎকার শিকারকে হাতে পেয়ে সেটি আর ভেনিসের বিচারপতিদের হাতে ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না। ছ'টি বছর তাঁরা কাটালেন এই অত্যাচারিত নির্যাতিত শরীর নিয়ে। বিচারপতিরা জানতেন ব্রুনোর মনের জোর খুবই বেশি, তাঁর জ্ঞান বিশাল। যুক্তিতর্কে তাঁকে হারাতে পারে এমন দার্শনিকের জন্ম এখনো পর্যন্ত হয়নি। অতএব ব্রুনোকে নিজের খণ্ডন নিজেকেই করতে হবে। মরবার আগে তাঁর নিজের শিক্ষাকে নিজেই হত্যা করে যেতে হবে। তিনি বিজ্ঞানকে প্রশংসা করেছেন, বিজ্ঞান-মানসীকে রক্ষা করেছেন। এবার

তাহলে তাঁকে সকলের সামনে তাঁর মানসীর মুখে থুতু দিতে হবে, মানসীকে গালাগালি দিতে হবে, মানসীকে চিরকালের জন্যে ত্যাগ করতে হবে।

কিন্তু যতো নির্যাতনই চলুক ব্রুনোকে দিয়ে এ-কাজ করানো যাবে না এই পরীক্ষার জন্যে বহুকাল ধরেই তিনি প্রস্তুত হয়েছেন। অনেকবারই নিজেকে বলেছেন, "চালিয়ে যাও। সাহস হারিও না। এমনকি যদি অজ্ঞানের আদালত তোমাকে হুমকি দেয় এবং তোমার মহৎ শ্রম ধ্বংস করতে চেষ্টা করে তাহলেও পিছু হটো না।

"আছে বিচারবুদ্ধির আরো এক উচ্চ বিচারসভা যেখানে অন্ধকার থেকে আলোককে আলাদা করে চেনা যায়। সেখানে তোমার উদ্দেশ্যের পক্ষে উঠে দাঁড়াবে খাঁটি ও সৎ সাক্ষী ও রক্ষাকারীরা। তোমার শত্রুরা নিজেদের বিবেকের মধ্যেই তোমার প্রতিশোধ-গ্রহণকারীদের দেখতে পাবে।"

অলিন্দে আরো একবার পায়ের শব্দ শোনা গেল। খুলে গেল দরজা। ব্রুনোর সামনে এসে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ মঠাধ্যক্ষ—ডোমিনিকান সম্প্রদায়ের প্রধান। বন্দীকে আরো একবার স্বীকার করতে বলা হলো যে তাঁর শিক্ষা ধর্মবিরোধী এবং এই ভ্রান্তি তিনি অস্বীকার করছেন। আর বারেবারেই বিপুলতম সাহসিকতার সঙ্গে ব্রুনো জবাব দিলেন, "না, তা হতে পারে না, কোনো কিছু প্রত্যাহার করার ইচ্ছে আমার নেই। কোনো কিছু অস্বীকার করারও নেই।"

বিচারসভার শেষ অধিবেশন বসল। ব্রুনো ছিলেন প্রধান বিচারপতির প্রাসাদে। তাঁকে নতজানু করে বসানো হলো, তারপরে বিচারসভার সিদ্ধান্ত পাঠ করা হলো।

কথাগুলো খুবই সরল, কিন্তু তার অর্থ যে কী ভয়ংকর সেটা ব্রুনো ভালোভাবেই বুঝতে পারলেন। কথাগুলো এই রকম: "ভ্রাতা জিওর্দানোকে প্রশাসনিক শক্তির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তারা যেন যতোদূর সাধ্য কোমলতম উপায়ে, বিনা রক্তপাতে, তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।"

এই কোমলতার দাম কী, তিনি জানেন। এই লোকগুলো নির্যাতন চালায় কোমল-ভাবে, বিকলাঙ্গ করে বিনা আক্রোশে, পুড়িয়ে মারে করুণার সঙ্গে।

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি মাথা তুললেন। তাঁর চোখে ঘৃণা। বললেন, "আপনারা রায় ঘোষণা করছেন, শুনে আমার যতোটা-না ভীতি হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ভীতি নিয়ে।"

হ্যাঁ, কথাটা ঠিক, রায়দানকারীদের চেয়ে তিনি কম ভীত। তিনি তো মরবেন, কিন্তু যার জন্যে তিনি প্রাণ দিচ্ছেন তা বেঁচে থাকবে। আর যদিও তাঁর নির্যাতনকারীরা আরো কয়েকটা বছর বেশি বেঁচে থাকবে, কিন্তু তারা যে বীভৎস ও জঘন্য কাজটি করল তা ইতিহাসের পাতায় নিন্দিত হবে।

ব্রুনোকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। কিন্তু অন্য নেতারা ইতিমধ্যেই লড়াইয়ের মাঠে নেমে গিয়েছেন। ইতিমধ্যেই গ্যালিলিও প্রস্তুত করছেন বিজ্ঞানের সপক্ষে নতুন সব অকাট্য যুক্তি এবং জোরগলায় ঘোষণা করেছেন, "আরিস্টটলের চেয়ে ডিমোক্রিটাসের যুক্তি শ্রেয়তর।" ইতিমধ্যেই দক্ষ কারিগরদের হাতে লেন্স পালিশ হচ্ছে। অল্পদিনের মধ্যেই এই সমস্ত লেন্স জোড়া লাগিয়ে তৈরি হবে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র। অনুমান করার দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। অবিসম্বাদিত প্রমাণ উপস্থিত করার সময় এসে গিয়েছে। লোকে একসময়ে কেবল তাদের বুদ্ধির চোখ দিয়ে যা দেখতে পেত তা শীঘ্রই দেখতে পাবে তাদের শারীরিক চোখ দিয়ে।...

দিনটি ১৬০০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি।

রোমের লক্ষ-লক্ষ মানুষ ছুটে চলেছে অসাধারণ এক দৃশ্য দেখার জন্যে—বিখ্যাত এক অবিশ্বাসীকে পুড়িয়ে মারা। স্বয়ং পোপ পঞ্চাশজন কার্ডিনাল সহ সেখানে উপস্থিত থাকবেন। উপস্থিত থাকবেন গির্জার এই মহান উৎসবের জন্য সকল দেশ থেকে সমাগত তীর্থযাত্রীরা। সম্পূর্ণ ময়দানটি এবং আশেপাশের সকল রাস্তা জনাকীর্ণ। এমনকি বাড়ির ছাদেও মানুষের ভিড়।

প্রাচীনকালে খৃস্টানদের পুড়িয়ে মারার ঘটনা দেখার জন্যে রোমানরা বিরাট মেলা-প্রাঙ্গণে ভিড় করত। এখন তাদের বংশধররা ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করছে নতুন সত্যের উদ্‌গাতাকে পুড়িয়ে মারার দৃশ্য দেখার জন্যে। সত্যদ্রষ্টার সম্মানের হানি হয় না—একমাত্র নিজের দেশ বাদে। রোমানরা এমন একজন মানুষের ওপরে গালিগালাজ বর্ষণ করছে যাঁকে নিয়ে তাদের গর্বিত হওয়া উচিত ছিল।

ওই সেই মানুষটি, নিজের ভবিতব্যের দিকে হেঁটে চলেছেন।

ব্রুনোকে ঢিলে পোশাক পরানো হয়েছে। পোশাকের ওপরে লেজ ও নরকের আগুনের জিভওলা শয়তানের ছবি আঁকা। উদ্ভট একটা টুপি তাঁর মাথার ওপরে বসানো। এসব করা হয়েছে অবিশ্বাসীর চেহারা হাস্যকর ও করুণ করে তোলার জন্যে। কিন্তু লোকের মুখের হাসি উবে গেল যখন তারা তাকিয়ে দেখল সেই ফ্যাকাশে মুখ আর তাদের মাথার ওপর দিয়ে অনন্তের দিকে তাকিয়ে থাকা সেই চোখ।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলল, "ওর তো আনন্দ হওয়া উচিত। এক্ষুনি ওকে ঠেলে তুলে দেওয়া হবে সেই জগতে যা ওরই আবিষ্কার।" কিন্তু এই ঠাট্টার কথা শুনেও বিশেষ কেউ হাসল না।

শান্তভাবে ব্রুনো মই বেয়ে কাঠের উঁচু স্তূপের ওপরে উঠলেন। জল্লাদ এসে তাঁকে খুঁটির সঙ্গে শেকল দিয়ে আলগাভাবে বেঁধে দিল। জল্লাদের মাথায় একটি ঢাকা, শুধু দেখার জন্যে তাতে দুই চোখের সামনে দুটো ফুটো। শহীদ মানুষটি অকুতোভয়ে সকলের চোখের দিকে তাকাচ্ছেন। কিন্তু জল্লাদকে মুখোশ দিয়ে মুখ ঢাকতে হয়েছে।

কাঠে আগুন লাগানো হলো। বাতাসে আগুন বাড়তে লাগল। আগুনের শিখা ব্রুনোর পা বেয়ে উঠে পোশাকের ওপর দিয়ে ছুটে চলল।

মঠের যে-সব সাধু কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল তারা উৎকর্ণ হয়ে শুনছে। হয়তো এই একেবারে শেষ মুহূর্তে ব্রুনো ভেঙে পড়বে। কিন্তু তাদের আশা বৃথা হলো। করুণা ভিক্ষা করে কোনো আকুতি শোনা গেল না, মুখ থেকে কোনো আর্ত চিৎকার পর্যন্ত নয়।

আর্ত চিৎকার তিনি দমন করেছিলেন কী উপায়ে? এই শেষ মুহূর্তে তিনি কী ভাবছিলেন আমরা জানি না। কিন্তু অনিবার্য এই শেষদিনের কথা ভেবে একসময়ে তিনি যা লিখেছিলেন তা আমরা জানি : "জয়লাভ করা সম্ভব এই বিশ্বাস নিয়ে আমি সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছি। কিন্তু আমার আত্মায় যে শক্তি নিহিত আছে তা থেকে আমার শরীর বঞ্চিত।...কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মধ্যে এমন কিছু আছে যার জন্যে ভবিষ্যৎ কাল আমাকে কৃতিত্ব দেবে।"

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষরা বলবে, "মৃত্যুর ভয় তিনি জানতেন না। তাঁর চরিত্রের জোর ছিল অন্য যে-কোনো মানুষের চেয়ে বেশি। তিনি মনে করতেন, সত্যের জন্যে সংগ্রামই জীবনের সেরা আনন্দ।"

৪. বই শেষ, কিন্তু কাহিনী শেষ নয়

বড়োমানুষকে আমরা তার যাত্রার মধ্যপথে ছেড়ে যাচ্ছি।

ব্রুনোর কাহিনী শেষ হওয়া মানে মানুষের কাহিনী শেষ হওয়া নয়। এই কারণেই ব্রুনো এমন সাহসের সঙ্গে মৃত্যুকে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

একটা রীতি আছে যে পুস্তকের শেষ পরিচ্ছেদে বলতে হয় পরবর্তী কালে নায়কের জীবনে কী ঘটল এবং কি-ভাবে তার জীবন শেষ হলো। কিন্তু আমাদের নায়কের জীবন শেষহীন, তাই তার কাহিনীও কখনো শেষ হবার নয়।

আমাদের নায়কের সঙ্গে আমরা গিয়েছি রোমে, বাইজানটিয়ামে, কিয়েভে-এ, প্যারিসে, লণ্ডনে, মস্কোয়, নতুন জগতের তীরে, এবং পুনরায় রোমে।

আমাদের নায়কের নানা বিভিন্ন নাম—ক্যাসিওডোরাস, রোজার বেকন, মার্কো পোলো, নিকিতিন, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, কলম্বাস, ইয়েরমক, কোপারনিকাস ও ব্রুনো। কিন্তু তার সকল নাম আমরা এমনকি তালিকাবদ্ধও করতে পারিনি। সংস্কৃতি লক্ষ লক্ষ মানুষের সৃষ্টি—অতীতেও এখনো।

নতুন বিজ্ঞানের প্রবেশ-পথে আমরা আমাদের নায়ককে ছেড়ে এসেছি আর কেবলমাত্র দূর থেকে গ্যালিলিওর হাতে দেখেছি জগৎকে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে নতুন যন্ত্র—অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র। এই দুটি যন্ত্রের সঙ্গেই এখন আমরা খুবই পরিচিত।

এই বইয়ের পৃষ্ঠায় ইতালীয় রেনেসাঁসকে আমরা ছুঁয়ে গিয়েছি মাত্র। মহান ইতালীয় কাম্পানেলা—যিনি অন্ধকূপের মধ্যে থেকেও "সূর্যকরোজ্জ্বল নগরীর" স্বপ্ন দেখতেন—তাঁর সম্পর্কে আমরা একটিও কথা বলিনি। বলিনি আরও অনেকের কথা—শেক্সপীয়ার, নিউটন, ভোলতেয়ার, লাভোয়েজিয়ে, লাইব্‌নিৎস, ফ্রাঙ্কলিন, গ্যেটে, মার্কস, ডারউইন।

এই বইয়ে আমেরিকা সবে আবিষ্কৃত হয়েছে। সামনে রয়েছে তার গোটা ভবিষ্যৎ।

আমরা দেখেছি রুশ মানুষরা কি-ভাবে উপস্থিত হয়েছে এবং তাদের দেশের ভয়াল প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে লড়াই করেছে ও দেশের সীমাহীন বিস্তৃতিকে দখলে এনেছে। কিন্তু আমরা একটি কথাও বলিনি লোমোনোসভ, পুশকিন, লোবাচেভস্কি, মেন্‌দেলিয়েভ, লেনিন ও পাভলভ সম্পর্কে।

এই বইয়ে রয়েছে কত নাম, কত ঘটনা, কত মানুষ, কত জাতি!

মানুষের কাহিনী হাজার সূত্র থেকে সময়ের দ্বারা গ্রথিত। প্রত্যেকটি সূত্রের আছে নিজস্ব রঙ। বিশ্ব-সংস্কৃতির সাধারণ নক্‌শায় প্রত্যেক জাতি তার নিজস্ব বিশেষ সূত্র গ্রথিত করেছে! সব মিলিয়ে হয়ে উঠেছে এক বহুবর্ণময় বস্ত্র।

আমরা আমাদের কাহিনীতে ছেদ টানতে চলেছি। বস্ত্রটি এখনো তাঁত থেকে তোলা হয়নি। বস্ত্রটি শেষ হয়নি। প্রকৃতি এখনো সৃষ্টি করে চলেছে, মানুষের কাজের শেষ নেই।

আমাদের আশা, আমাদের নায়কের কাহিনী আবার শোনাতে পারব। একথা বলার জন্যে যে শতকের পর শতক ধরে সে সত্যের দিকে এবং প্রকৃতিজগতের উপরে প্রভুত্বলাভের দিকে নির্দিষ্ট পথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হয়ে চলেছে।